ইন্দিরা দূরদর্শিনী

নিখিল সেন

'নবপত্র' সংযোজন ঃ

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ

ডি. মেহ্‌রা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট ঃ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

৯৪ সাউথ মালাকা ঃ এলাহাবাদ ২১১ ০০১

১০২ প্রসাদ চেম্বার্স ঃ অপেরা হাউস ঃ বোম্বাই ৪০০ ০০৪

৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড ঃ নতুন দিল্লী ১১০ ০০২

প্রচ্ছদশিল্পী

গণেশ বসু

মুদ্রক ঃ

সুকমল পাল

অরুণোদয় প্রেস

৩৪/১ বি. টি. রোড

কলকাতা ৭০০ ০০২

ইন্দিরা দূরদর্শিনী

প্রিয়দর্শিনি! দূরদর্শিনী হয়ে
নিমজ্জমান মহাপোত টেনে তুলে
ভাসিয়ে নিয়েছো ভবিষ্যতের কূলে;
ঝঞ্ঝা অশনি চলেছো মাথায় বয়ে।
তিমিরনিশায় কখনো বা নির্ভয়ে
ছত্রী ধরে ঝাঁপাও শূন্যে খুলে!
কখনো আঁধার নিশীথ সমুদ্র কূলে
গম্ভীর ভেঁপুরব তোলো প্রত্যয়ে।

দূরদর্শিনি! দৃষ্টি রেখেছো স্থির,
অতীতে এবং সুদূর ভবিষ্যতে!
মানবতাবাদ-রচনায় পৃথিবীর
দিতেছ পাবকে ভারত-যজ্ঞ হতে।

ইতিহাসপাতে পেয়েছো জন্মভূমি;
নিজে হয়ে গেলে জীবন্ত ইতিহাস তুমি।

রাধারানী দেবী

কথামুখ

'সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন পৃথিবীর মানচিত্রে ভারত এক শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে চিহ্নিত হবে।

'আমি জানি না সেদিন আমি জীবিত থাকব কিনা। হয়ত আপনাদের মধ্যেও কেউ কেউ থাকবেন না। কিন্তু আমি একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, আমাদের উত্তরাধিকারীরা দেখবেন তাঁদের সামনে ভারতের এক নতুন রূপ। সে ভারত বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে অভিষিক্ত। সামরিক শক্তিতে নয়, শান্তি এবং সৌহার্দ্যের নীতি নিয়েই সে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলবে।'

পনেরো ফেব্রুয়ারী উনিশশো বাহাত্তর উত্তর দিল্লীর কিংসওয়ে ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত এক বিপুল জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নতুন দিনের নতুন ভারতের রূপ তুলে ধরেন স্বগতভাবে। এ অবশ্য প্রাক-নির্বাচনী বক্তৃতা। নির্বাচনী প্রচার। তাহলেও পাক-ভারত চৌদ্দ দিনের লড়াই জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিপুল জয়ই কেবল সূচিত করেনি, প্রমাণিত করেছে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্বও। শ্রীমতী গান্ধীর সুনিপুণ 'স্টেটম্যানশিপ'-এর। পাক-ভারত যুদ্ধ ভারতকে দিয়েছে নতুন প্রত্যয়। নবীন আত্মবিশ্বাস। বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানকে যারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর একটি ভিয়েতনামে রূপায়িত করতে যাচ্ছিল, শ্রীমতী গান্ধী তাদের সে দূরভিসন্ধি দিলেন বানচাল করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তথা সমগ্র এশিয়ায় ভারত অধিষ্ঠিত হলো নতুন মর্যাদায়—বৃহৎ রাষ্ট্রের ভূমিকায়। আর ভারতের এ অগ্রযাত্রার পুরোধা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—'ভারত রত্ন'। ইন্দিরা কেবল প্রিয়দর্শিনী নন, দূরদর্শিনীও।

বর্তমান বিশ্বের তিন মহিলা প্রধানমন্ত্রী—শ্রীলংকার শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েক, ইস্রায়েলের মিসেস গোল্ডামিয়ার, ভারতের শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীই বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের কর্ণধার এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত।

কেবল বাইরে নয়, ঘরেও। আপন পার্টি কংগ্রেস সংগঠনেও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী—অনন্য। প্রধানমন্ত্রীপদে নির্বাচিত হয়ে শ্রীমতী গান্ধীর বুঝতে দেরি হলো না যে, পার্টি হিসেবে কংগ্রেসের লোকপ্রিয়তা সাধারণের মধ্যে উবে আসছে। মাটি সরে যাচ্ছে কংগ্রেসের পায়ের তল থেকে। ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে কংগ্রেস জনসাধারণের কাছ থেকে। উনিশশো সাতষট্টি সালের সাধারণ নির্বাচনেও দেখা গেল, যদিও কংগ্রেস কেন্দ্রে সংখ্য-গরিষ্ঠতা লাভ করেছে, বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পেয়েছে। কংগ্রেসবিরোধী সরকার গঠিত হয় অনেক রাজ্যে। কংগ্রেসকে পুনরায় সঞ্জীবিত করতে হলে তার নতুন দাওয়াই দরকার। ঢেলে সাজাতে হবে তাকে নতুন করে। যুবশক্তিকে কংগ্রেসের পক্ষছায়ায় আনতে হবে। অবাঞ্ছিতদের বাছাই করে বাদ দিতে হবে। সমাজতন্ত্রের পথে, প্রগতির স্রোতে হাল ধরতে হবে কংগ্রেসের দৃঢ়হস্তে।

তাই বুঝি শ্রীমতী গান্ধী সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর খসড়া প্রস্তুত করলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের সিণ্ডিকেট গোষ্ঠীর নেতারা তীব্র বিরোধিতা করলেন এর। শুরু হলো মতবিরোধ। আর তার পরিসমাপ্তি ঘটলো কংগ্রেস বিভাগের মধ্যে। ইন্দিরাজী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে সংঘবদ্ধ হলেন প্রগতিশীল কর্মপন্থার রূপায়নে। শ্রীমতী গান্ধী লোকসভাকে ভেঙে নতুন করে গড়ার কাজে অগ্রসর হলেন। সুপারিশ করলেন লোকসভা বাতিলের। রাষ্ট্রপতি শ্রীভি. ভি. গিরি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ মত লোকসভা বাতিলের নির্দেশ দেন। অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের আদেশ জারী করেন।

উনিশশো একাত্তর সালের লোকসভা উপনির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল বিপুল ভোটাধিক্যে হলো জয়ী।

উনিশশো বাহাত্তর সালে বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনেও শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেস দল জয় গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে। ইন্দিরাজী বুঝেছিলেন 'গরিবী হটাবার' যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন তা রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন রাজ্যে রাজ্যে কেন্দ্রের মতো গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী স্থায়ী এবং কেন্দ্রের সহযোগী সরকার। ইন্দিরাজী তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে এক 'খোলা চিঠি'তে আবেদন করেন :

'আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করেছি। এক কোটি শরণার্থীর সসম্মানে ও নিরাপদে স্বদেশে ফেরার ব্যবস্থা করেছি। এবার আমাদের আরও বড় যুদ্ধ লড়তে হবে। এ লড়াই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।'

প্রতিপক্ষ দলগুলি ইন্দিরা সরকারের সমালোচনা করতে দ্বিধা করল না। ইন্দিরাজীর সমাজতান্ত্রিক বুলি 'গরিবী হটাও' কেবল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার শ্লোগান বলে উল্লেখ করতে ওরা দ্বিধা করলো না। শাসক কংগ্রেস 'স্বৈরাচারের' আশ্রয় নিয়েছে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। অভিযোগ করলো স্বাধীনতা লাভের পর গত চব্বিশ বছরে কংগ্রেস একনাগাড়ে পুঁজিবাদ বিকাশের পথে দেশকে পরিচালনা করে আসছে। তাই আজ দেশব্যাপী এমন অর্থনৈতিক সঙ্কট। অভিযোগ করল : ঘরে ঘরে বেকার, মাথাপিছু ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে।

কিন্তু 'ইন্দিরা তরঙ্গের' মুখে বিরোধী দলের সব অভিযোগ আর শ্লোগানের তোড়জোড় ভেস্তে গেল। নির্বাচনে কংগ্রেস লাভ করল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। অভূতপূর্ব সাফল্য। ইন্দিরাজীর

হাত হলো জোরদার। বস্তুতঃ ভারতের তিন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে জওহরলাল নেহরু যদি হন 'ভিশনারী', লালবাহাদুর শাস্ত্রী যদি 'রিভিশনারী', তাহলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 'টেলিভিশনারী'। দূরদর্শিনী।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর জীবন আলেখ্যের রূপরেখাটি তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। আর এ কাজে যাঁদের কাছ থেকে সবচাইতে বেশি সমর্থন, সহযোগিতা ও সহায়তা পেয়েছি তাঁরা হলেন 'রূপা'র স্বত্বাধিকারী মিঃ ডি. মেহ্‌রা আর কেন্দ্রীয় রেফারেন্স লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। নানা তথ্য, উপাদান ও উপদেশ দিয়ে আমায় উৎসাহিত করেছেন 'যুগান্তরের' প্রখ্যাত বার্তাসম্পাদক ও সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসু ও বন্ধুবর শ্রীদ্বিজেন নন্দী, সাংবাদিক বন্ধু গ্রহরাজ এস. নন্দ, অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মাইতি প্রমুখ অনেকে। ভারত সরকারের ইনফরমেশন ব্যুরোর কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে মিঃ এস. রায়ের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের কয়েকটি ছবির ব্লক মেসার্স একাডেমিক পাব্‌লিশার্সের সৌজন্যে প্রাপ্ত। আর এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি করে দিয়েছে আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান নিরঞ্জন মিত্র ও কল্যাণীয়া মহুয়া। এ গ্রন্থের নির্ঘণ্টটিও শ্রীমান নিরঞ্জনের করা।

প্রখ্যাত কবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী তাঁর 'ইন্দিরা দূরদর্শিনী' কবিতাটি এ গ্রন্থে পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে আমায় বাধিত করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

নিখিল সেন

রাত তখন বারোটা।

না, বারোটা নয়। বারোটা কুড়ি।

আকাশবাণী দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল :

'আমাদের দেশ, আমাদের জাতির এক সংকট মুহূর্তে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি।'

ধীর, স্থির কণ্ঠস্বর। অবিচলিত। বিশ্বাসে অটুট। বরাভয়ে দুর্নিবার। স্থিতপ্রজ্ঞ।

'ঘণ্টাকয়েক আগে ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার কিছু পর পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে পুরোমাত্রায় যুদ্ধ শুরু করেছে। পাকিস্তানের বিমানবাহিনী অকস্মাৎ আমাদের অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, উত্তরলাই, যোধপুর, আম্বালা ও আগ্রা বিমান ঘাঁটিতে হানা দিয়েছে। পাক স্থলবাহিনী আমাদের আত্মরক্ষাঘাঁটি সুলেমানকী, খেমকরণ, পুঞ্চ ও অপরাপর এলাকায় গোলা-গুলী বর্ষণ করে চলেছে।'...

রাত্রির নিথরতা খান্ খান্ করে জাতির কর্ণধার শ্রীমতী গান্ধীর কণ্ঠ আবার ভেসে এল। প্রতিধ্বনিত হলো বেতার যন্ত্রে :

'আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার সরকারের এবং ভারতীয় জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে এক বিরাট দায়িত্ব।...

'আমাদের জনগণ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইচ্ছাপ্রণোদিত, অকারণ এ আক্রমণ চূড়ান্তভাবে প্রতিরোধ করতে যে সক্ষম হবেন তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী জানালেন :

'আমরা শান্তিবাদী মানুষ। কিন্তু আমরা জানি, এ শান্তি বজায় থাকবে না, যদি আমরা আমাদের গণতন্ত্রকে, আমাদের জীবন-আদর্শকে রক্ষা করতে না পারি। কাজেই আজ আমরা কেবল আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য লড়াই করছি না। করছি মূল আদর্শের জন্য—যা শক্তি যুগিয়েছে এই দেশে এবং যার উপর নির্ভর করে আমরা উন্নত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে পারি। আক্রমণের মোকাবিলা আমাদের নিশ্চয়ই করতে হবে। এবং ভারতের জনগণকে কষ্টসহিষ্ণুতা, দৃঢ়সংকল্প, নিয়মানুবর্তিতা ও অধিকতর একতার সঙ্গে তার মুখোমুখী হতে হবে।...জয়হিন্দ!'

ছয় ঘণ্টা আগেও প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে ছিলেন না। ছিলেন মহানগরী কলকাতায়। কলকাতা ব্রিগেড গ্রাউণ্ডে উত্তাল জনসমুদ্রে দিচ্ছিলেন ভাষণ। বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের মনোভাব ব্যক্ত করছিলেন জনতার স্বতঃস্ফুর্ত মুহুর্মুহু জয়ধ্বনির মধ্যে। দমদম বিমানঘাঁটি থেকে ব্রিগেড গ্রাউণ্ড দীর্ঘ পথ। সারা পথ লোকে লোকারণ্য। মিছিলের স্রোত। শুধু পতাকা আর পতাকা। ঝাণ্ডা আর ঝাণ্ডা। আর থেকে থেকে উত্তাল জনতার জয়ধ্বনি :

বন্দেমাতরম্ ॥

ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ ॥

কলকাতা ময়দানে এত জনসমাগম হয়নি দীর্ঘকাল। দশ লাখ তো বটে। হয়তো আরও বেশি। চাপা উত্তেজনা সকলের মুখে। উৎকণ্ঠা।

পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক এ সফর।

দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতি দেওয়া হবে কি না শুনতে চায়। তার দ্ব্যর্থহীন উত্তর।

গাড়ি থেকে নামলেন প্রধানমন্ত্রী।

দোহারা, ছিমছাম গড়ন। শ্বেতপাথরে খোদাই করা ইতালীয় মূর্তির মতো নাক, মুখাবয়ব। সুবিন্যস্ত কেশভার। ডান কপালের ঠিক উপরে কিছুটা চুল শ্বেতকরবীর মতো শুভ্র। প্রজ্ঞার প্রতীক!

স্মিত হাসিমুখে ব্রিগেড গ্রাউণ্ডের সজ্জিত মঞ্চে তিনি উঠে এলেন। এসে দাঁড়ালেন জনতার মুখোমুখী। অভিনন্দন গ্রহণ করলেন সমবেত জনসমুদ্রের।

পরনে ঘি রঙের সিল্কের শাড়ী। গায়ে ফুলহাতা গরম ব্লাউজ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

শীতের পড়ন্ত রোদ পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। একতাল কাঁচা সোনা ঢেলে দিয়েছে বুঝি কেউ ময়দানের উঁচু গাছপালাগুলোর মাথায়। পঞ্চান্ন কোটী ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক তাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী এবার মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করলেন:

ভারত তার ঐতিহ্যময় নীতি ও আদর্শের খাতিরেই অত্যাচারিত বাংলাদেশের মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। এ কোন জমির লোভে নয়। আর এর জন্য যে পরিণামই হোক না কেন, ভারত সে মোকাবিলায় প্রস্তুত।…

ভারত যুদ্ধ চায় না। চায় শান্তি। কিন্তু যদি কেউ বিনা কারণে ভারতের উপর আঘাত হানে, ভারত সে আঘাত দেবে ফিরিয়ে।

জনতা নিশ্চুপ। সম্মোহিত।

শ্রীমতী গান্ধী আরও বললেন:

পাকিস্তানী সৈন্যেরা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটী মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে করিয়েছে ভিটে-মাটি ছাড়া। ভারতে এসে ওরা আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। নির্বিচারে চলেছে গণহত্যা। আর আমাদের উপর দুর্বিষহ শরণার্থী সমস্যা। ফলে আমাদের অর্থ নৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চাপ পড়েছে বিপুল পরিমাণে। পাকবাহিনী সীমান্তের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলিতেও সৈন্য করেছে মোতায়েন। এ কেবল ভারত আক্রমণের প্রস্তুতি মাত্র। কোন দেশ যদি ভারতকে আক্রমণ করে, ভারতের উপর চাপিয়ে দেয় যুদ্ধ—প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—ভারতের পাশে

কেউ এসে দাঁড়াক আর না দাঁড়াক, ভারতের পঞ্চান্ন কোটী মানুষ তা কখনও বরদাস্ত করবে না। আপনার জান-প্রাণ দিয়ে দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা আর সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে। আক্রমণকারীর বিষ দাঁত দেবে গুঁড়িয়ে।

উত্তাল জনতা এবার ফেটে পড়লো সরবে। জয়ধ্বনি করে উঠলো প্রধানমন্ত্রীর।

ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ॥

তেরঙ্গা ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ॥

শ্রীমতী গান্ধী যখন বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের মনোভাব ব্যক্ত করে ময়দানে বক্তৃতা করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তানী বিমান ঝাঁপিয়ে পড়ল অতর্কিতে ভারতের উপর। একরূপ বিনা প্ররোচনায় আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করে বোমাবর্ষণ শুরু করে দিল পশ্চিম সীমান্তে।

ইস্রায়েলী ধাঁচের এ পাক-বিমান আক্রমণের মুল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বিমানবহরের উপর যুগপৎ আক্রমণ—হানা। আকাশপথে আঘাত হেনে তাদের সাবাড় করে দেওয়া, পঙ্গু করে দেওয়া ভারতীয় বিমান শক্তিকে। জলে, স্থলে, আকাশপথে তারপর অবাধ আধিপত্য বিস্তার।

আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধে ইস্রায়েল এ ব্লিৎস্ক্রিগ রণকৌশলই অবলম্বন করেছিল। তাই অনুসরণ করে সংযুক্ত আরবের শক্তিশালী বিমানবহরকে করে ফেলেছিল অকেজো যুদ্ধের গোড়াতেই।

কিন্তু পাকিস্তানী সামরিক চক্রের চালে এখানে হলো ভুল। তাদের গোপন অভিসন্ধির কথা ভারতীয় বাহিনীর প্রধানরা আগে থেকেই বুঝি আঁচ করে নিয়েছিলেন। তাই বিমানবহরের অধিকাংশ বিমানই বিমানঘাঁটি থেকে গোপন কংক্রিট বাংকারে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিলো আগেভাগে।

বিমান হানার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী স্থলবাহিনী ফিরোজপুর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বরাবর ভারতের কয়েকটি ঘাঁটির ওপরও

আক্রমণ চালায়। পূর্বাঞ্চলের আগরতলাতেও পাকবাহিনী একযোগে আক্রমণ করে। রাজধানী দিল্লী, বোম্বাই ও অপরাপর অনেক শহরেও বিমান আক্রমণের সংকেতধ্বনি—হুঁশিয়ারী সাইরেন বেজে ওঠে। হতচকিত হয়ে ওঠে রাজধানীর নাগরিকরা। সংশয় দানা বাঁধে—এ কি সত্যিকার আক্রমণের সংকেত—না, মহড়া বিশেষ?

শুক্লপক্ষের পরিপূর্ণ চাঁদ। ঘষা কাঁচের মতো অস্বচ্ছ আকাশে উঁকি মেরেছে তখন সবেমাত্র। এ সময়টাই বেছে নিল পাকিস্তানী সমরকর্তারা। দিনটাও ছিল পবিত্র। জুম্মাবার।

অব্যর্থ সুযোগ। কেননা, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—জেনারেল ইয়াহিয়া খানের 'ঐ মেয়েমানুষটা'—তখন রাজধানী থেকে হাজার মাইল দূরে। জনমত গড়ে তুলছেন দেশের, দশের। বাংলার মাঠ-ময়দানে বক্তৃতারত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামও অনুপস্থিত। এমনকি অর্থমন্ত্রী শ্রীযশোবন্তরাও চ্যবন তখন রাজধানী থেকে বহু দূরে সফররত।

প্রকাশ্য কোন যুদ্ধ ঘোষণা না করেই পাকিস্তানের জঙ্গী প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভারতের সঙ্গে 'দশ দিনের মধ্যে লড়াই শুরু' করার তাঁর হুমকি মতো নয় দিনের দিন বুঝি অতর্কিতেই আজ সন্ধ্যায় যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। রওনা হলেন সমরাঙ্গনে রীতিমত ঢাল-তলোয়ার নিয়ে!

প্রধানমন্ত্রী কিন্তু অতর্কিত এ আক্রমণের কথা কিছুই তখন জানতে পারেননি।

ব্রিগেড গ্রাউণ্ডের জনসমুদ্রে ভাষণ দিয়ে তিনি রাজভবনে ফিরে এলেন। রাজ্যপাল মিঃ এ. এল. ডায়াসের সঙ্গে সীমান্ত পরিস্থিতি ও সীমান্ত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সংক্রান্ত কয়েকটি জরুরী কথা সেরে নিয়ে বাংলার বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছিলেন। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন বুঝি, গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবীরা দেশের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, যে দায়িত্ব পালন

করেছিলেন তার কথা। ঠিক এ সময় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব এসে পাক আক্রমণের কথা জানালেন তাঁকে।

হাত বাড়িয়ে জরুরী বার্তাটি প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরলেন চোখের সামনে। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন তিনি। ঠোঁট দুটি একবার বুঝি কেঁপে উঠলো উত্তেজনায়। না, আর নয়। ১৯৪৭ সাল থেকে এ নিয়ে তিন তিন বার। এ আক্রমণের মোকাবিলা এবার করতে হবে পাকাপাকি। তিনি মন ঠিক করে নিলেন। সিদ্ধান্ত করে ফেললেন। পাকিস্তানী হামলা বন্ধ করতে হবে চিরতরে। সংকল্পে অটল।

প্রধানমন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন। সমবেত সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি তক্ষুনি বেরিয়ে এলেন রাজভবন থেকে। আর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে (পশ্চিম-বঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী) নিয়ে রওনা হলেন দমদম বিমানঘাঁটি অভিমুখে। হাতে অনেক কর্মসূচীই ছিল। সব দিলেন বাতিল করে।

এখনই ফিরতে হবে রাজধানীতে। অতর্কিত পাক আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে সাফল্যের সঙ্গে। পাকিস্তানের অঘোষিত যুদ্ধের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার জরুরী বৈঠকে মিলিত হতে হবে। সংসদের বিরোধী সদস্যদের সঙ্গেও। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও অর্থ মন্ত্রীর কাছে পাঠাতে হবে জরুরী বার্তা।

রাজধানীতে পৌঁছেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী মন্ত্রীসভার রাজনৈতিক কমিটির বৈঠক ডাকলেন। তারপর পুরো মন্ত্রীসভার অধিবেশন।

সে রাত্রেই রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন।

৩রা ডিসেম্বর বিকালে ভারতের অগ্রবর্তী এলাকার কয়েকটি বিমান ঘাঁটির উপর বিনা প্ররোচনায় পাকিস্তান আক্রমণ করায় রাষ্ট্রপতির এ আদেশ জারী। ভারতীয় সংবিধানের ৩৫২নং ধারা।

প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণের পূর্বেই রাত এগারোটা পঞ্চাশ

মিনিটে ভারতীয় বিমানবাহিনীও পাকিস্তান বিমানঘাঁটির উপর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ হানল। ভারতীয় বিমানবহর চাঁদদোরী, শোরকোট, সারগোদা, মুরিদ, মাসরুদ, রাওয়ালপিণ্ডির সন্নিকটে রিসালওয়ালা আর লাহোরের কাছে চানগা প্রভৃতি পাকিস্তানী বিমানঘাঁটির উপর আঘাত হানে সরাসরি। বহু বিমান ভূমিতেই ঘায়েল করে দেয়। পেট্রোল ট্যাঙ্ক দেয় জ্বালিয়ে। সারগোদা বিমানঘাঁটির ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান পাকিস্তানের 'দুষ্ট সমরযন্ত্র'কে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।

ভারতভূমির উপর শুধু নগ্ন আক্রমণ নয়, পাকিস্তানী বেতার থেকে মিথ্যে প্রচার করে বলা হল—পাকিস্তানের সমস্ত সীমান্তের অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলির উপর ভারতীয় ফৌজই প্রথম আক্রমণ চালিয়েছে।

পরদিন ৪ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সংসদে জানালেন:

আজ সকালে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধকালীন সংসদে আমরা মিলিত হয়েছি। আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যুদ্ধ। এ যুদ্ধ আমরা চাইনি। বিরুদ্ধতা করেছিলাম সর্বশক্তি দিয়ে। যা এড়িয়ে যাওয়া যেত, তাই ঘটলো। পশ্চিম পাকিস্তান চরম বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে আঘাত হেনেছে।···

সংকট মুহূর্তে নিজেদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে তিনি তাই আবেদন জানালেন। বললেন:

গত ন'মাস ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক চক্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মূল মানবিক অধিকারকে পদদলিত করে আসছে বর্বরোচিত ভাবে। দখলদার বাহিনী এমনতর ঘৃণ্য অপরাধ করেছে, প্রতিশোধমূলক হিংস্রতায় যার তুলনা নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাতে হয়েছে ছিন্নমূল। এক কোটী মানুষ চলে আসতে বাধ্য হয়েছে আমাদের দেশে।···

গোটা একটা জাতিকে এমনি করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার প্রতি

আমরা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকি বারবার। জানাই আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কথা। অর্থনৈতিক ও অপরাপর বোঝার কথা। কিন্তু তাতে কেউ কোনরূপ কর্ণপাত করেনি।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে তারপর বললেন :

পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদলের ক্রোধ আরও বেড়ে যাবার কারণ বাংলাদেশের জনগণ নৈতিক মূল্য রক্ষার্থে যে মুক্তিসংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন, সামরিক বাহিনীর নিকট তার কোনো মূল্য ছিল না। হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ। কঠোর হস্তে তাই তাকে দাবিয়ে রাখছিল, যেমন পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশকে রাখা হয়েছিল। মুক্তিবাহিনী দিন দিন যতই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদল ততই হয়ে পড়ছিলো বেপরোয়া। আমাদের ঐতিহ্য হলো অশ্রু ঝরানো নয়, অশ্রু মোছানো। উৎপীড়ন নয়, উৎপীড়িতদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। আর তাই আমাদের উপর এসে পড়েছে পাকিস্তানের সব ক্রোধ।···

পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক চক্র সন্দেহ ও গুজব ছড়াতে সকল রকমে চেষ্টা করবে যাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানের এই ফাঁদে আমাদের পা দিলে চলবে না। একতা ও মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের বজায় রাখতে হবে।

তিনি তাঁর ভাষণে দেশের শিল্পী, লেখক, শিক্ষক ও ছাত্রদের নিকটও আবেদন জানালেন। বললেন :

তাঁরা যেন দেশের আদর্শ ও নীতিকে উচ্চে তুলে ধরেন। প্রতিটি শস্যকণা, টাকাকড়ির অপচয় না করে সঞ্চয়ের জন্য তিনি বিশেষ আবেদন জানান নারী সমাজের উদ্দেশ্যে। এবং পরিশেষে বলেন :

আমরা শান্তির স্বপক্ষে। কিন্তু শান্তিকে রক্ষা করতে হয়। আমাদের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সম্মান রক্ষাকল্পে আমরা আজ যুদ্ধরত। সর্বোপরি, যে আদর্শ আমরা পোষণ করি তা বজায় রাখতে আমরা সংকল্পবদ্ধ।

সংসদে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণ শেষ হলো। সদস্যরা

সর্বসম্মতিক্রমে পাকিস্তানের আক্রমণের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় সংকল্প জানালেন। সংগঠন কংগ্রেস, সি. পি. এম., সি. পি. আই., ড্রি. এম. কে., মুসলিম লীগ, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র পার্টি প্রভৃতি সকল দলের নেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানী হামলা রুখবার সংকল্প ঘোষণা করলেন। এ হামলার জবাব দেওয়ার জন্য সরকারের সমস্ত ব্যবস্থার করলেন সমর্থন।

মুষ্টিবদ্ধ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

উনিশশো বাষট্টি সালে ভারতের উপর চীনা হামলার সময় কিংবা পঁয়ষট্টি সালে ভারত-পাকিস্তানের ছয় দিনের যুদ্ধে সর্বদল নিরপেক্ষ এ একতা দেখা দেয়নি এতখানি। সরকার-বিরোধী বহু দলের সমর্থন তখন কোথাও মেলেনি। এমনকি স্বর্গত জহরলাল ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমলে যা সম্ভব হয়নি শ্রীমতী গান্ধী তাই করলেন। বাঁধলেন দেশের 'এক সূত্রে সহস্রটি মন', সঁপে দিলেন 'এক সূত্রে সহস্র জীবন'!

গোটা জাতির নেত্রীর আসনে হলেন তিনি অভিষিক্ত। দেশের পঞ্চান্ন কোটী মানুষের এখন একটি মাত্র দল। আর সে দলের নেত্রী শ্রীমতী গান্ধী।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর হাত হলো মজবুত। পাক সামরিক চক্রের বিষধর যে কেউটেটা গত ২৪ বছর ধরে শান্তিবাদী ভারতের বুকে যখনই সুযোগ পেয়েছে ছোবল মারতে উদ্যত হয়েছে, তার বিষদাঁতটি দিতে হবে এবার চিরতরে ভেঙে। এ হলো সুযোগ পাক জঙ্গী হঠকারিতার উপযুক্ত জবাবের। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটী মুক্তিপাগল মানুষও আজ রয়েছে একসঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা।

আকাশবাণী মারফত ১০ ডিসেম্বর এক বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জওয়ানদের স্বাধীনতা ও দেশের সম্মান রক্ষার জন্যে সাহসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে দিলেন নির্দেশ।

বললেন: 'দেশ আজ তাদের তারিফে পঞ্চমুখ। জনগণ রয়েছে তাদের পাশে। ধর্ম, ভাষা ও রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে সকল

মানুষ আজ একত্রিত। ইতিপূর্বে এমন কখনো হয়নি। আগ্রাসনকে পরাজিত করতে তারা জওয়ানদের মতোই বদ্ধপরিকর। অটুট তাদের আত্মপ্রত্যয়। চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় জওয়ানদের শক্তি সম্পর্কেও রয়েছে তাদের অপরিসীম আস্থা।...

'শত্রু ধর্মযুদ্ধের মিথ্যে জিগির তুলেছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ অধিকাংশই মুসলমান। তারা ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসক-বর্গের এ জিগিরের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছে।'

জওয়ানদের উদ্দেশ্যে তিনি তারপর বললেন: 'আমরা সেই মহান আদর্শ রক্ষার লড়াইয়ে রত হয়েছি, যেখানে সকল ধর্মের জনসাধারণ সমান। ভাই ভাই। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শই আমরা রক্ষা করছি যা গণতন্ত্রের জীবন ও রুধির। ভারত বলতে কেবল দেশের মাঠ-ঘাট, পাহাড়, নদী বোঝায় না। কেবল ৫,৬০,০০০ গ্রাম, পল্লী, শহরও নয়। বোঝায় পরধর্ম সহিষ্ণুতার আদর্শ। আর উচ্চতর নীতিবোধের প্রতি সম্মান—যা ভারত তিন হাজার বছর ধরে তুলে ধরেছে সকলের সামনে।'

যুদ্ধে দেশের জওয়ানদের জয় সুনিশ্চিত বলে তিনি দিলেন অভয়বাণী।

ডিসেম্বর ৬ এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন পাক-ভারত যুদ্ধের। এ দিন প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে। জন্ম হল জাগ্রত এশিয়ার নতুন আর এক রাষ্ট্রের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন স্বাধীন সোনার বাংলার। স্বপ্ন আজ তাঁর পূর্ণ হতে চললো, যদিও শেখ মুজিবুর নিজে হাজার মাইল দূরে লায়ালপুরের নির্জন পাকিস্তানী রুদ্ধ কারাগারে ফাঁসীর দিন গুণছেন। মৃত্যু রয়েছে প্রতীক্ষায়।

এই স্বীকৃতির প্রতিবাদে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক করলেন ছিন্ন। ভারতের মতো ভুটানও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে নিলেন স্বীকার করে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে লোকসভায়

ঘোষণা করলেন: বাংলাদেশের জনসাধারণকে আপন কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করতে পাকিস্তান সম্পূর্ণ অপারগ। এখন পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। আমরা এতদিন মনে করছিলাম যে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে আমাদের তরফ থেকে কিছু করতে গেলে হস্তক্ষেপের সামিল হবে। এখন সে তাৎপর্য লোপ পেয়েছে।

বাংলাদেশের এ স্বীকৃতির প্রতিক্রিয়া বহির্বিশ্বেও প্রতিফলিত হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট চীন পাকিস্তানী সমরচক্রের সমর্থনে প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষে তৎপর হয়ে উঠলো। নিরাপত্তা পরিষদে ভারতকে আক্রমণকারীর ভূমিকায় চিত্রিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থকদের এক প্রস্তাব আনা হলো যুদ্ধ বিরতির। মার্কিন ও চীনা প্রতিনিধি দুজন ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে কসুর করলো না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি তার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। সোভিয়েত ও পোলিশ রাষ্ট্রদূত ভারতের বিরুদ্ধে মার্কিন-চীন অভিযোগ খণ্ডন করলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ভেটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করে মার্কিন অভিসন্ধি দিলেন বানচাল করে। কেননা, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের অর্থ পাক-ভারত বিরোধের নিরসন নয়। মূল সমস্যাটাকে চিরন্তন করে রাখা। সামরিক সংঘর্ষকে নতুন করে জিইয়ে রাখা। হাজার হাজার মানুষকে শরণার্থী করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। ১৯৪৭ আর ১৯৬৫-র পুনরাবৃত্তি মাত্র। নতুন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। শ্রীমতী গান্ধী সে ফাঁদে পা দিলেন না।

ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে আগেকার সীমারেখায় ফিরে যেতে মার্কিন ও চীন প্ররোচিত আরেক দফা প্রস্তাবের উপরেও সোভিয়েত ইউনিয়ন সাধারণ পরিষদে 'ভেটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন। অবশ্য এ ভোটাভুটির ব্যাপারে বৃটেন আর ফ্রান্স গ্রহণ করলেন নিরপেক্ষ ভূমিকা।

শুধু ভোটাভুটি নয়, মার্কিন সরকার ভারতের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য ভারতকে দেওয়া তার অর্থনৈতিক সাহায্য (এর মূল্য প্রায়

৬৫৭ কোটি টাকা) দিলে বন্ধ করে। সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ভারতের প্রতি এ 'নিকসন নীতি'র করলেন কড়া সমালোচনা। জোর গলায় বললেন :

গত সপ্তাহে সামরিক সীমান্ত অতিক্রম বা গত মাসে কামানের গোলাগুলী বর্ষণের প্রসারের মধ্যে এ যুদ্ধের সূত্রপাত নয়। রক্তক্ষরা গত ২৫ মার্চের রাত্রেই এই যুদ্ধের শুরু। স্বাধীন নির্বাচনের ফলাফলকে পাকিস্তানের সৈন্যদল নৃশংসভাবে গুঁড়িয়ে দেয়।

প্রেসিডেন্ট নিকসনের এ ভারতবিরোধী নীতি আর ইসলামাবাদ-প্রীতির মূল-প্রবক্তা কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা প্রফেসর হেনরী কিসিংগার। পিকিং পিং-পং কূটনীতির উদ্যোক্তা। তবে কিসিংগার কেন যে ভারতকে 'আক্রমণকারী' বলে অভিহিত করলেন তা বোঝা গেল না! বিশেষ করে যখন পাকিস্তান ভারতের বিমান ঘাঁটির উপর আক্রমণ ও বোমাবর্ষণ করে চলেছে তখনই! আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ভারত পাল্টা আক্রমণ করুক ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে এটা হয়তো নিকসন নীতির অভিপ্রেত নয়। প্রেসিডেন্ট নিকসন বুঝি চান না ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানী সমরশক্তিকে পর্যুদস্ত করে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনে তার অগ্রগতি অব্যাহত রাখুক। ভারতের এই 'সশস্ত্র আক্রমণ' রোধ করার উদ্দেশ্যে তিনি নিরাপত্তা পরিষদে আরেক দফা চাল চাললেন। মার্কিন 'হোয়াইট হাউস' মুখপাত্র জানালেন, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় দখলদার বাহিনীর উপস্থিতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক সদস্য রাষ্ট্রের উপর আক্রমণের সামিল।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কিন্তু পাল্টা অভিযোগ করলেন। বললেন : পাকিস্তানী সামরিক দুঃসাহসিপনার পিছনে মার্কিন উস্কানীদাতারা রয়েছেন। তিনি আরও জানালেন কমিউনিজম প্রতিরোধকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'সিয়াটো', 'সিন্‌টো' প্রভৃতি সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে। কিন্তু আজ তার অপব্যবহার হচ্ছে। কমিউনিজম রোধ না করে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র আজ জনগণের ন্যায় ও স্বাধীনতার করে চলেছে কণ্ঠরোধ।

বিদেশ থেকে ফিরে গত ৩০ নভেম্বর (১৯৭১) রাজ্যসভায় শ্রীমতী গান্ধী যে ভাষণ দেন, তাতে এ কথা পরিষ্কারভাবে সমঝিয়ে দেন যে, আজকের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্যের উপস্থিতি ভারত তার নিরাপত্তার পক্ষে হানিকর বলে গণ্য করবে। বাংলাদেশে গণহত্যা যদি চলতে থাকে, তাতে ভারত নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর এ ভাষণ মারফত যা এতদিন ছিল শুধু পূর্ববঙ্গের শরণার্থী সমস্যার সঙ্গে জড়িত তাকেই এই প্রথম ভারতের ঘটনাবলীর সঙ্গে গেঁথে দিলেন। এতদিন যা ছিল পরোক্ষ, এবার হলো প্রত্যক্ষ। জাতীয় সংহতি ও স্বার্থের কষ্টিপাথরে 'ইন্দিরা তত্ত্ব' বা 'ইন্দিরা ডকট্রিন'-এর হলো পত্তন। পত্তন হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'মনরো ডকট্রিন।'

নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবার প্রত্যক্ষ আঘাত হানলো। বহু বিঘোষিত তার সপ্তম নৌবহরকে এবার টংকিঙ্ উপসাগর থেকে পাঠালো ভারত মহাসাগর অভিমুখে। এ নৌবহরে আছে পরমাণু-শক্তি চালিত বিমানবাহী জাহাজ 'এন্টারপ্রাইজ'। তাতে আছে ১০০ খানি বোমারু বিমান, আছে পর্যবেক্ষণকারী বিমান। মজুত রয়েছে হেলিকপ্টার আর পারমাণবিক বোমা। মার্কিন 'গানবোট ডিপ্লোমেসী'র নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ।

সোভিয়েত ইউনিয়নও এই মার্কিন হঠকারিতায় নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন না। ৯ আগস্ট ১৯৭১ সালে স্বাক্ষরিত রুশ-ভারত 'শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি'র ধারা মতে রাশিয়া তাদের ক্ষেপণাস্ত্রবাহী যুদ্ধজাহাজ, ডেস্ট্রয়ার সহ এক শক্তিশালী নৌবহরকেও ভারত মহাসাগরের দিকে যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। উদ্দেশ্য মার্কিন নৌবহরের গতিবিধি লক্ষ্য করা। মার্কিন কর্তৃপক্ষ অবশ্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী সৈন্য অপসারণই সপ্তম নৌবহরের লক্ষ্য। তবু এই মার্কিনী "ফ্লিটে" (Flit-এ)

বাংলাদেশের কত মশা মরলো (কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের ভাষায়) এবং বাংলাদেশে অবরুদ্ধ কত পাক সেনাকে অপসারিত করা হলো তা আজও জানা যায়নি !

তবে যতই মার্কিন ফ্লিট (Fleet) আসুক না কেন ভারত তাতে মোটেই ভীত হয়নি। কুখ্যাত সপ্তম নৌবহরের নাকের উপর দিয়েই ভারতীয় নৌবাহিনী কক্সবাজার বন্দরে সৈন্য নামিয়েছেন। পলায়মান পাক সৈন্যবাহী জাহাজের উপর করেছেন গোলাবর্ষণ। এবং মার্কিন নৌবহরকে তার স্বদেশে ফিরে যেতে করেছেন বাধ্য। নৌবহর পাঠিয়ে ভীতিপ্রদর্শন বা চাপসৃষ্টি করা যে যায় না, শ্রীমতী গান্ধী জগৎসভায় তাই দেখিয়ে দিলেন। পঞ্চম দশকে ইরানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দেক স্বদেশে বিদেশী তেল কোম্পানী-গুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করেছিলেন বলে তখনকার ব্রিটিশ সরকার ক্রুদ্ধ হন তাঁর উপর। আর ব্রিটিশ নৌবহরকে পাঠিয়েছিলেন পারস্য উপসাগরে। কিন্তু ডাঃ মোসাদ্দেকও সেদিন ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজের হুমকিতে কাবু হননি। বিদেশী তৈল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্বে বিরত হননি।

প্রেসিডেণ্ট নিকসন যে ভুল পথ বেছে নিয়েছেন, তাঁর কাছে লেখা এক ঐতিহাসিক পত্রে শ্রীমতী গান্ধী তাই তুলে ধরেন। তিনি লেখেন :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রই একদা উদ্‌বুদ্ধ করেছে দেশের মুক্তি সংগ্রামকে। এগিয়ে দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে মরণের পথে।

তিনি আরও লেখেন, গত ৩ ডিসেম্বর যখন আমি কলকাতায়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন পাটনায় এবং অর্থসচিব যখন বোম্বাইয়ে তখনই পাকিস্তান ভারতের উপর আক্রমণের সময় বেছে নেয়। রাজধানী থেকে আমার অনুপস্থিতির এ সুযোগ নেওয়াই পাকিস্তানী নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক। এ পরিস্থিতিতে কেউ নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না। পাকিস্তানী শাসকবর্গের উপর কেউ কি আস্থা

রাখতে পারে? কিংবা যাঁরা তাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁদের সেই অভিলাষ কি শান্তিপূর্ণ, গঠনমূলক বা যুক্তিযুক্ত বলা যায়?…

শোচনীয় এ যুদ্ধ এড়ানো যেত। ৩ ডিসেম্বর তারিখে আমাদের উপর পাকিস্তানী আক্রমণের পূর্বে গত নয় মাসে পৃথিবীর বড় বড় নেতারা এদিকে নজর দেননি। এবং পুনর্মিলনের প্রকৃত মূলটি খুঁজে দেখেননি।…শরণার্থীদের জন্য সহানুভূতি দেখানো হলো, কিন্তু আসল রোগটাকে করে যাওয়া হয়েছে অবজ্ঞা। এটা খুবই হৃদয়-বিদারক।…রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনের প্রতি লোক-দেখানো প্রতিশ্রুতি খুবই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা পূরণের কোনো চেষ্টাই করা হয়নি।

'গানবোট ডিপ্লোমেসী' নীতির সাহায্যে হুমকি বা ভয় দেখিয়ে ভারতকে কাবু করা যায় না। শ্রীমতী গান্ধী তাই সমঝিয়ে দিলেন নিকসন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন:

'তিন কি চার হাজার মাইল দূর থেকে কোন জাতি যখন তার বর্ণাধিপত্যের ভিত্তিতে তাদের অভিরুচি মাফিক কাজ করার নির্দেশ দিতে পারত সে সময় এখন পার হয়ে গেছে। ভারত বদলে গেছে। এবং সে এখন আর 'নেটিভদের' দেশ নয়।'

প্রেসিডেণ্ট নিকসনকে লেখা শ্রীমতী গান্ধীর এই চিঠিখানি লিপিকুশলতার দিক থেকেও অনন্য। সাহিত্য সুষমামণ্ডিত। ভাষার লালিত্য, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা আর আবেগের দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক পত্রের সগোত্রীয় বলা যায়।

এদিকে পাকিস্তানের ভরাডুবি আশঙ্কা করে ইরান, তুরস্ক, জর্ডন, সৌদি আরব প্রভৃতি 'সিনটো' চুক্তিবদ্ধ তৃতীয় রাষ্ট্র মারফত পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহে সচেষ্ট হয়ে উঠলো মার্কিন সরকার।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের-সেক্রেটারি জেনারেল উ থানও মহাব্যস্তসমস্ত হয়ে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব জানালেন। প্রধানমন্ত্রী উ থানকে লিখলেন:

যুদ্ধ বিরতি এবং সৈন্য অপসারণ করতে ভারত সম্মত আছে যদি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গ বাংলাদেশ থেকে তাঁদের

ফৌজ সরিয়ে নেন আর সেখানকার নেতাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসেন।

এদিকে পাকিস্তানের ডেপুটী প্রাইম মিনিষ্টার জনাব জুলফিকর আলি ভুট্টো রাষ্ট্রসঙ্ঘে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার ছাড়তে শুরু করলেন। বলে উঠলেন: যদি দরকার হয় পাকিস্তান হাজার বছর ধরে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে!

ভুট্টো সাহেব যত রণহুঙ্কারই দিন এবং সহস্র বৎসর যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করুন এদিকে কিন্তু জঙ্গী ইয়াহিয়া খাঁর যুদ্ধস্পৃহা শীঘ্র মিটে এল। শুধু জল-স্থলে নয়, এমন কি বিমান যুদ্ধেও পাক বোমারু ও জঙ্গী বিমান ভারতের 'ন্যাট' বিমান বহরের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল। আর আপন আপন বিবরে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। স্থলপথেও দুর্ধর্ষ ভারতীয় জওয়ানদের গতি হল অব্যাহত বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অপূর্ব সহযোগিতায়।

স্বাধীন বাংলার এ মরণজয়ী বীর বাহিনী বাংলাদেশের ৫৪ হাজার বর্গকিলোমিটার অঞ্চল পাকিস্তানের অধিকার থেকে ইতিমধ্যে মুক্ত করেছেন। এর মধ্যে ২৩,২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের সরকারের অসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু পশ্চিম রণাঙ্গনে নয়, বাংলাদেশের এক একটি শক্তিশালী পাক ঘাঁটির পতন হতে লাগল ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর সম্মিলিত শক্তির কাছে। মিত্রবাহিনী অকারণ সৈন্যক্ষয় এড়াবার জন্য সরাসরি আঘাত না হেনে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন শত্রুব্যূহ ভেদ করে। যোগাযোগ পথ দিলো ছিন্ন করে। যশোর, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বহু শক্তিশালী ঘাঁটি হলো অধিকৃত। মুক্ত।

রাজধানী ঢাকার লড়াই হলো শুরু। আর এ দখলের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য ভারতীয় সৈন্য মুক্তিফৌজ গেরিলাদের যোগ-সাজসে বহু ছত্রী সেনা দিলো নামিয়ে বুড়িগঙ্গার ওপারে। নরসিংদি দখল করে ভারতীয় স্থলবাহিনী এবার ভৈরববাজার হয়ে ঢাকার কয়েক মাইলের মধ্যে এসে পৌঁছাল। পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে

আরও দুটি বাহিনী চাঁদপুর ও দাউদকান্দি থেকে অগ্রসর হতে লাগল। ঢাকা ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর কামানের আওতার মধ্যে এসে পড়ল। রাজধানীর পতন দিন গুণতে লাগল। পালাবার আর জো নেই। আকাশপথে তো নয়ই। জলপথেও নয়। কেননা, পালাবার সবকটা ঘাঁটি ভারতীয় জওয়ান ও মুক্তিফৌজের দখলে। ভারতীয় নৌবাহিনী বসে আছে ওৎ পেতে।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের প্রধান সামরিক প্রতিনিধি মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খাঁ ফন্দি এঁটে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সম্পাদক উ থান-এর কাছে ধরনা দিলেন। পরাজিত হৃতশ্রী সামরিক ও বেসামরিক লোকজনকে পশ্চিম পাকিস্তানে অপসারণের জন্য চেষ্টা করলেন। জেনারেল মানেকৃশ' ফরমান আলীর এ দুরভিসন্ধি দিলেন বানচাল করে। বেতার যোগে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন: পাক ফৌজের পালাবার চেষ্টা বৃথা।

তথাকথিত 'পূর্ব পাকিস্তানে'র সামরিক শাসনকর্তা ডাঃ এ. এম. মালিক এবং তাঁর মন্ত্রিসভাও সদলবলে পদত্যাগ করলেন (১৪ ডিসেম্বর) যখন তাঁর সরকারী বাসভবনে গোলাগুলি এসে পড়তে লাগল। ৯৩নং ঢাকা পদাতিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার কাদের খাঁন তাঁর অধীন সব সৈন্যসামন্ত নিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। দখলদার বাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী কিন্তু 'শেষ পর্যন্ত লড়াই' করার বড়াই করলেও যুদ্ধ করার মনোবল তাঁর আর রইল না।

ভারতীয় স্থলবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মানেকৃশ অকারণ রক্তপাত বন্ধ করতে দিলেন হুঁশিয়ারী। ঢাকার উপর কোন বিমান আক্রমণ যাতে না হয় তারও দিলেন আশ্বাস। সেনাপতি মানেকৃশ বিশেষ বেতার বার্তায় এ কথাও জানালেন, পাকিস্তানী সেনা যদি বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে তবে তাদের প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি 'জেনেভা কনভেনশন' নির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করা হবে। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা আহত

হয়েছে তাদেরও উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে এবং মৃতদের যথোচিত সমাধি দেওয়া হবে। তিনি আত্মসমর্পণের শেষ সময় ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টা পর্যন্ত ধার্য করে দিলেন।

লেফ্‌টেনেণ্ট জেনারেল নিয়াজী নিয়তির বিধান নিলেন মেনে। ঢাকা রমনার ময়দানে ভারতীয় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বর্ণসূর্য সবুজ পতাকার নীচে বাংলাদেশ সামরিক শাসনের প্রশাসক লেঃ জেনারেল নিয়াজী বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান ও ভারতীয় ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট অস্ত্র সমর্পণ করলেন নতজানু হয়ে বিকেল সাড়ে চারটেয়। করলেন আত্মসমর্পণ। জয়ধ্বনি উঠলো লক্ষ কণ্ঠে। রমনার ময়দান প্রকম্পিত হয়ে উঠল :

জয় বাংলাদেশ॥
জয় ভারত॥
বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ॥
ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ॥

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী অকারণ জীবন হানি আর অধিক রক্তপাত বন্ধ করার জন্য ১৭ ডিসেম্বর রাত আটটা থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনের সর্বত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীকে একতরফা অস্ত্র সংবরণেরও দিলেন নির্দেশ।

ভারতের তিন বাহিনীর প্রধানরা ১৭ ডিসেম্বর রাত্রি আটটা থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনেও সর্বপ্রকার আক্রমণাত্মক অভিযান বন্ধ রাখতে তাঁদের নিজ নিজ সৈন্যদের প্রতি হুকুম দিলেন। আর পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকচক্রও অস্ত্রসংবরণের সে হুকুম মেনে নিলে। পশ্চিম রণাঙ্গনেও যুদ্ধ থামলো। ১৭ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত্রি আটটা থেকে সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গনে দু সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটলো। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান উপমহাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে এ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। মেনে নিলেন পরাজয়। হলেন গদিচ্যুত।

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সমস্যাকে নিয়ে ছাইচাপা যে আগুন দীর্ঘ ন'মাস ধরে ধিকিধিকি করে জ্বলছিল, এবার তা নিভলো। চোদ্দ দিনের লড়াইয়ে ভারত পশ্চিম পাকিস্তানের ৩,৬০০ বর্গ-কিলোমিটার অঞ্চল অধিকার করে। আর বাংলাদেশের ১,৪২,১৯৯ বর্গকিলোমিটার মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় করে মুক্ত। অবশ্য ভারতকেও তার মূল ভূখণ্ড থেকে কিছুটা অংশ এ লড়াই-এ খোয়াতে হয়। পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের হতাহতের সংখ্যা অধিক নয়। ভারতের পক্ষে মোট হতাহতের সংখ্যা ১০,৬৩৩। তাদের মধ্যে উভয় রণাঙ্গনে মোট ২,৩০৭ জন নিহত এবং ৬,১৬৩ জন আহত হয়। এ ছাড়াও নিখোঁজের সংখ্যা প্রায় ২,১৬৩। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত লড়াই যদিও মাত্র ছয় দিন ব্যাপী ছিল এবং পশ্চিম রণাঙ্গনেই তা সীমাবদ্ধ ছিল, তাতে কিন্তু হতাহতের সংখ্যা আজকের তুলনায় কম ছিল না। তাতে ২,২২৬ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়; ৭,৮৭০ জন আহত এবং নিখোঁজ হয় ১,৫০০ জন।

স্বৈরাচারী পাক শাসনতন্ত্রের হলো অবসান। মুক্ত হোল বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন। বাংলা-দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলো। ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ লোকসভায় তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে যে তিনটি আশ্বাস দিয়েছিলেন তা পালিত হলো। কিন্তু এখনো তুটি প্রতিশ্রুতি অপূরণ রয়ে গেল। এক হলো পাক সামরিক জুন্তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতে আগত এক কোটি শরণার্থীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। আর দ্বিতীয়টি বন্দীদশা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের মুক্তি। এ তুটিও যথারীতি প্রতিপালিত হয়। ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) শ্রীমতী গান্ধীর একান্ত প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। বিশ্ববিবেকের কাছে নতিস্বীকার করলেন প্রেসিডেণ্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো। শরণার্থীরাও স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে গেল যথাসময়ে।

জল্লাদশাহীর কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লণ্ডন থেকে স্বদেশে ফেরার পথে দিল্লীতে অবতরণ করেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২। পালাম বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে শেখ মুজিবুরের সাক্ষাৎ এ প্রথম। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন:

'আমার দেশের কোটি কোটি মানুষের হাসির প্রস্রবণে অবগাহন করতে আমি ছুটে যাচ্ছি—কিন্তু অন্ধকার থেকে আলোকের পথে যাবার আগে ভারতভূমিতে দাঁড়িয়ে আমার চিরন্তন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলাম ভারতের জনগণের প্রতি, অনন্যা ও অসাধারণ তার প্রধান-মন্ত্রীর প্রতি,—তার সেনাবাহিনী ও সাধারণ মানুষ—এদের সকলের প্রতিই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। আমাদের মুক্তিসংগ্রামে এঁরা যে সাহায্য ও সমর্থন দিয়েছেন, সেটা কোনদিনই ভুলবার নয়।...ভারতের প্রধানমন্ত্রী শুধু তাঁর দেশেরই নেত্রী নন—তিনি সমগ্র মানব জাতির নেত্রী। তাঁর কাছে ব্যক্তিগত-ভাবেও আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীমতী গান্ধী—পৃথিবীর প্রতি রাষ্ট্রের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়েছেন। বলেছেন, মুজিবকে মুক্ত কর—একটা রাজনৈতিক মীমাংসায় আস।'

ঢাকায় ফিরে বঙ্গবন্ধু এরই অনুরণন তোলেন: 'শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্য, আমাকে বাঁচাবার জন্য যা করেছেন তার তুলনা নেই। ভারতীয় সৈন্যরা যে সাহায্য ও সহানুভূতি আমার দুঃখী মানুষকে দেখিয়েছেন বাংলার মানুষ তা ভুলতে পারবে না।'

তিনি আরও বলেন: 'শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দিল্লীতে আমার কথা হয়েছে। যাঁরা জানতে চান তাঁদের খুলেই বলি—শ্রীমতী গান্ধীকে আমি জানি। শ্রদ্ধা করি। তিনি জওহরলাল নেহরুর মেয়ে। মতিলাল নেহরুর ছেলের মেয়ে। তাঁরা দীর্ঘকাল দেশসেবা করেছেন। ত্যাগ স্বীকার করেছেন।'...

বঙ্গবন্ধুর চোখে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী :

'আমাকে একবার প্রশ্ন করা হয় যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আদর্শের সঙ্গে আপনার এত মিল কেন? আমি বলি, এটা আদর্শের মিল, এটা নীতির মিল, এটা বিশ্বশান্তির মিল।'...

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে জঙ্গী শাসকের হুকুম বরদার আত্মসমর্পণ করায় দুঃসহ জীবনের অবসান হয়। ঢাকায় একদল ভারতীয় সাংবাদিক ৬১৩ নম্বর ধানমণ্ডির বাড়ীতে বঙ্গবন্ধুর পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে বেগম মুজিবুর রহমানও বলেন :

'এতদিনে প্রাণ ফিরে পেলাম আর তা পেলাম শ্রীমতী গান্ধী আর ভারতের জনগণের জন্যেই। কোনদিন ভাবতেও পারিনি এত শীগগির এভাবে মুক্তি পাব। কী বলে যে শ্রীমতী গান্ধী আর ভারতীয় জনগণের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাব ভেবে পাচ্ছি না।'

তিনি আরও বলেন: 'নিজেরই বাড়ী অথচ সেখানেও ছিল না স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরার কোন স্বাধীনতা। অষ্টপ্রহর সঙ্গীন উঁচিয়ে পাহারা দিত জঙ্গীশাহীর সৈনিকরা। না পারতাম নিজের বাড়ীর বার হতে, না পারতেন বাইরে থেকে কোন আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব দেখা করতে আসতে। এমনি দুঃসহ বন্দীজীবন যাপন করতে হয়েছে —এক আধ দিন নয়, গত নয় মাস।'

পাক ভারত বিরোধের বিশেষ করে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক ও মানবিক সমাধানই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী চেয়েছিলেন। সামরিক সমাধান নয়। যুদ্ধবাজ ইয়াহিয়া খান ভারতের ঘাড়ে জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের রাজধানীতে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রধানের নিকট ধরনা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : 'দুনিয়াতে আদর্শের জন্য অনেক লড়াই হয়েছে। যে লড়াইয়ের মোকাবিলা মিত্র বাহিনী ও মুক্তি বাহিনী করেছে সেটিও ছিল আদর্শের। সে আদর্শ স্বাধীনতার গণতন্ত্রের মানবতার। কোন বৈষয়িক লাভের জন্য নয়। পররাজ্য গ্রাসের জন্যও নয় এ লড়াই। ভারতের জয় তাই অবশ্যম্ভাবী।' জয়লাভও করেছে ভারত। আর

এ বিজয়ের মূলে প্রধানতঃ হলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন দুনিয়ার নয়া সাম্রাজ্যবাদ, শ্রেণী, জাতি ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামকে দেবে দুর্বার গতিতে এগিয়ে। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীবন্ধন করবে দৃঢ়তর।

শ্রীমতী গান্ধীর এ সাফল্যের মূলে রয়েছে পরিবর্তনকে মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা যতখানি তার চাইতে বেশি তাঁর দূরদর্শিতা। ঘটনাকে যত তাড়াতাড়ি আঁচ করে নিতে পারেন তিনি, আর কেউ তেমন পারেন কিনা সন্দেহ। প্রতিটি ঘটনা ঘটবার আগে তার বাস্তব সম্ভাব্যতা সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক, অনন্য। নির্ভুল পদক্ষেপ। আপন ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন ইতিহাসের ঘূর্ণায়মান চাকাকে তিনি একা হাতে ঠেকাতে পারবেন না। ঘরে যেমন বাইরে তাকিয়েও তিনি তেমনি দেখতে পেলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতের প্রকৃত কোনো বন্ধু নেই। দু শিবিরে বিভক্ত বিশ্ব রাজনীতিতে স্বকীয়তা বজায় রেখে চলতে না পারলে তাঁকে পিছু হটতে হবে। শ্রীমতী গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন, উপমহাদেশে শক্তি সাম্য বজায় রাখতে হলে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী ছাড়া উপায় নেই। ভারতকে ঘিরে যে বিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দিতে চাইছিলো একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষেই তার প্রতিরোধ সম্ভব। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরেও শ্রীমতী গান্ধী লক্ষ্য করেছিলেন, সোভিয়েতের প্রতি নীতিগত সমর্থন রয়েছে বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলির। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত বিরোধের সময় জওহরলাল দুটি বিরোধী বৃহৎ-শক্তিরই সমর্থন চেয়েছিলেন। কিন্তু কেউ সক্রিয়ভাবে তখন এগিয়ে আসেন নি। প্রসারিত করেন নি দুর্দিনে মৈত্রীর হাত। এ বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীমতী গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন, আমেরিকা ও চীনের সামরিক সাহায্যপুষ্ট পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকগোষ্ঠীর হুমকির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর একান্ত প্রয়োজন। তাই বুঝি ৯ আগস্ট ১৯৭১ তারিখে শ্রীমতী গান্ধী সোভিয়েত রাশিয়ার

সঙ্গে ঐতিহাসিক শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তির লক্ষ্য শান্তিরক্ষা। উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান। ছ'দেশের সরকার ও জনগণের শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো সংহত করা। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করা।

বাস্তবতার প্ররিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী গান্ধীর এ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। দূরদর্শিতার প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর। তাঁর এ চুক্তি ভারত-পাক যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার। রক্ষাকবচ।

ভৌগোলিক কি সামরিক ক্ষয়ক্ষতি আর লাভলোকসানের উর্ধ্বে এ পাক-ভারত লড়াইয়ে যা শুধু জমার অঙ্কেই ফেঁপে উঠেছে হিসেবের খাতায়, তা হোল নতুন ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন। পাকিস্তান ভেঙ্গে ঘরের পাশে গড়ে উঠলো গণপ্রজাতন্ত্রী এক নতুন রাষ্ট্র: স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ইসলামী রাষ্ট্র বা ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগড়ার ভাঁওতার মুখোশ গেল খসে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে কৃত্রিম ভারসাম্য বজায় রাখার অপচেষ্টা চলছিল তার হলো অবসান। বাংলাদেশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর একটি ভিয়েতনাম, আর একটি কম্বোডিয়ায় যারা রূপায়িত করতে যাচ্ছিল, শ্রীমতী গান্ধী সে দুরভিসন্ধি দিলেন বানচাল করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন বা অপরাপর বৃহৎ শক্তির রক্তচক্ষু আর ধমকানির তোয়াক্কা যে রাখে না ভারত—তাই হলো প্রমাণিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তথা সমগ্র এশিয়ায় অধিষ্ঠিত হলো ভারত নতুন মর্যাদায়। ভারতের এ জয় ভারতকে দিয়েছে নতুন বৃহৎ রাষ্ট্রের ভূমিকা। 'ভারত এ অঞ্চলে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সামরিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। ইরান থেকে ইন্দোচীনের মধ্যে যে একটিমাত্র দেশ তার আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারত তাকে ভারত সরিয়ে দিল ('লণ্ডন ইকনমিস্ট')।'

শুধু তাই নয়, 'বাষট্টি সালের অপ্রত্যাশিত চীনা আক্রমণের মুখে জাতীয় জওয়ানরা যে হতাশার সৃষ্টি করেছিল, 'পঁয়ষট্টির পাক-ভারত লড়াইয়ে তার জের কিছুটা সামলে নেয় এবং সেদিন ভারত

আপন শৌর্যবীর্যেরও স্বাক্ষর রাখে। কিন্তু এবারকার চোদ্দদিনের পাক-ভারত যুদ্ধ ভারতকে দিল নতুন প্রত্যয়। নবীন আত্মবিশ্বাস। হীনমন্যতার হাত থেকে রেহাই। আর তার এ অগ্রযাত্রার পুরোধায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। তাঁর দূরদর্শিতা। এ লড়াই জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিপুল জয়ই কেবল সূচিত করেনি, প্রমাণিত করেছে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব। অবিসংবাদিত দলনেত্রী হিসেবে শ্রীমতী গান্ধীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। শ্রীমতী গান্ধীর সুনিপুণ 'স্টেটস্‌ম্যানশিপ'-এর। ইন্দিরা দূরদর্শিতার!

আর ভারতের এ জয়ের মূলে যিনি, বিজয়িনী প্রধানমন্ত্রীর কথা দেশবাসী কেউ ভুললো না। ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন তাঁকে 'ভারতরত্ন' উপাধিতে করলো অভিনন্দিত। রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার হলে এক সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এ সম্মানে সম্মানিত করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে।

শ্রীমতী গান্ধীই ভারতের প্রথম মহিলা 'ভারতরত্ন'। ষোল বছর আগে পিতা জহরলালও এ সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন। পিপুল পাতার উপর 'টোন' করা ব্রোঞ্জ ধাতুর পদকের আকারে গড়া 'ভারতরত্ন' পদক। উল্টোপিঠে সূর্যের অনুকৃতি খোদিত। মধ্যস্থল থেকে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। রাষ্ট্রীয় প্রতীকও এ পিঠে। আর হিন্দীতে খোদাই করা 'মটো'।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মঞ্চের উপর এগিয়ে গেলেন। রাষ্ট্রপতি ফিতে-বাঁধা পদকটি তাঁর গলায় দিলেন পরিয়ে। অভিজ্ঞান পত্রটি তুলে দিলেন তাঁর হাতে। স্মিতহাস্যে শ্রীমতী গান্ধী তা গ্রহণ করলেন। জাতির সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন:

'ভারতরত্ন'!

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সর্বসম্মত দলনেত্রী হিসেবে পাক-ভারত যুদ্ধে অসামান্য সাফল্যই কি শ্রীমতী গান্ধীর জীবনের স্বর্ণমুহূর্ত?

পরম ক্ষণ ? না, উনিশশ' সত্তর সালে সংসদ ভেঙে দিয়ে দেশে নব নির্বাচনের ঝুঁকি নিয়ে জয়লাভ করাটা তাঁর জীবনের পরম মুহূর্ত ? এক সাংবাদিক সেদিন প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করে বসেছিলেন। পাক-ভারত যুদ্ধে জয়ী হয়ে ভারতের শক্তিমত্তার যে পরিচয় দিয়েছেন—যে মর্যাদার আসনে নিজেকে তিনি অধিষ্ঠিত করেছেন, এ গৌরব মুহূর্ত কি সে পরম ক্ষণ ?

বিনয়-নম্র কণ্ঠে আয়ত চোখ দুটি নামিয়ে স্বগতভাবে বলে উঠেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী :

কার জীবনের পরম মুহূর্ত কোনটা এবং কখন সেটা আসবে তা কি এখন বলা যায় ? গুরুদেবের কথায় বলতে গেলে বলতে হয় : 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে', তখনই হয়তো জানা যাবে আমার জীবনের পরম রমণীয় মুহূর্ত কোনটি ! আবার বললেন :

জানেন, এ হলো বিরাট চ্যালেঞ্জের দিন। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে আমার উপায় ছিল না। তা ছাড়া আমি তো মনে করি মানুষ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে টিকতেই পারে না। জীবনের প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবিলা আমি করে থাকি।

২

১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতেও এসেছিলো এমনি আরেকটি চ্যালেঞ্জের দিন। মনে রাখার দিন ১৯ জানুয়ারির সেই তারিখটি। কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচনের দিন।

স্মরণীয় মুহূর্ত!

দ্বিধা উঠেছিল ঘনিয়ে। সংশয় দানা বেঁধেছিলো মনে। বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের সামিল। ওঁদের সঙ্গে সরাসরি নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া কি উচিত হবে তাঁর পক্ষে? দ্বিধা সংকোচ তাই দেখা দেয়। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুযুধান কুরুপাণ্ডবের সম্মুখে তৃতীয় পাণ্ডবের মনেও বুঝি একদিন এমনি সংশয় দানা বেঁধে উঠেছিল! তাছাড়া সংসদীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে এমনি ধারা নির্বাচন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার নজীর নেই কোন। পিতৃদেব জওহরলাল কিংবা তাঁর মৃত্যুর পর লালবাহাদুর শাস্ত্রী কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেই সংসদীয় দলনেতা এবং প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রেও বা তা হবে না কেন?

কিন্তু শ্রীযুত মোরারজী দেশাই নাম প্রত্যাহারে নারাজ। তখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শ্রীমতী গান্ধীকে বেছে নিলেন এ লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। কংগ্রেস সভাপতি কামরাজের মতে শ্রীমতী গান্ধী সবদিক থেকে উপযুক্ত প্রার্থী। সর্বগুণ-অধিকারিণী। শুধু নেহরু পরিবারের মেয়ে বলে নয়, বাইরে সবাই ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্না, বাক্‌পটু জওহরলালের এ কন্যাটিকে শ্রদ্ধাও করে থাকেন। নির্বাচনে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সারা ভারতের সমর্থন পাবেন। এটা মোরারজী, নন্দজী কিংবা চ্যবনের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। তাছাড়া আগামী 'সাতষট্টি সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীরই কোটি

কোটি ভারতবাসীর ভোটে জয়লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। মেয়েদের সব ভোট তো তিনিই লুটবেন।

নির্বাচনের দিন পাঁচেক আগে এক নম্বর সফদারজঙ্গ রোডে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখাদিয়া গিয়ে জানালেন যে কংগ্রেস সভাপতি তাঁকেই মনোনয়ন দিচ্ছেন। পরদিন মধ্যপ্রদেশ ভবনে মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ, মহীশূর, রাজস্থান, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীরা সবাই সরকারীভাবে ইন্দিরাজীর নাম প্রস্তাব করলেন। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার ও আসামের মুখ্যমন্ত্রীরাও তাঁদের সমর্থন জানালেন। বাবু জগজীবন রামও তাঁর তপশীলভুক্ত জাতির সংসদ সদস্যদের নিয়ে হাত মেলালেন তাঁদের সঙ্গে। সবাই বললেন: 'আমরা ইন্দিরাজীকে চাই।'

শ্রীমতী গান্ধী জানালেন যদি কংগ্রেস সভাপতি চান তবে তিনি নির্বাচনে নামতে রাজী আছেন। বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যদি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন হয় তবে আমাদের দেশেও বা হবে না কেন?

শ্রীমতী গান্ধী রাজী হলেন। নির্বাচনে তিনি নামবেন। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন।

নয়া দিল্লীর পার্লামেণ্ট ভবনের উঁচু গম্বুজের নীচে ইতিপূর্বে বহু নাটকীয় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্ট মাঝরাতে এ ভবনেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পঠিত হয়েছিল বৃটিশ ভারতের শেষ প্রতিভু লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের সম্মুখে। আর সেই ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেছিলেন পিতা জওহরলাল নেহরু। কেন্দ্রীয় ভবনের চারিদিক প্রকম্পিত করে ঐতিহাসিক সে ঘোষণাবাণী মুখরিত হয়ে উঠেছিল:

'বহুকাল পুর্বে আমরা আমাদের লক্ষ্যপথ অভিমুখে যাত্রা করেছিলাম, এখন সময় এসেছে সেই প্রতিজ্ঞা পুরণের।'

কেন্দ্রীয় হল প্রতিধ্বনিত করে জওহরলালের কণ্ঠ আবার শোনা গেল সেদিন:

'আজ যখন ঘড়ির কাঁটা গিয়ে পৌঁছবে মধ্যরাত্রিতে, সারাবিশ্ব

যখন ঘুমিয়ে পড়বে, ভারত তখন জেগে উঠবে জীবন ও স্বাধীনতার পথে। সেই মুহূর্ত এসেছে—ইতিহাসে তা কদাচিৎ আসে—যখন আমরা পুরাতনের নির্মোক ছেড়ে নবজীবনে পদার্পণ করবো, যখন একটি যুগের হবে অবসান—এবং যখন দীর্ঘকাল ধরে কণ্ঠরুদ্ধ জাতির আত্মা পাবে ভাষা।'

সতের বছর পরে, ২ জুন ১৯৬৪ সালে পার্লামেণ্ট ভবনের কেন্দ্রীয় হলেই আবার জনসমাগম হয় পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু-র শূন্য আসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে। নেহরুর সে শূন্য আসনে সেদিন লালবাহাদুর শাস্ত্রী কামরাজী 'মতৈক্য' প্রথায় সংসদীয় নেতা নির্বাচিত হন। বছর দেড়েক ঘুরে যেতে না যেতেই এ কেন্দ্রীয় হল আবার কংগ্রেস সংসদ সদস্যদের সমাগমে উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে। লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যরা সমবেত হন রাজধানীতে তাসখন্দে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্য। তাঁদের সামনে প্রশ্ন : কাকে এখন নির্বাচিত করা হবে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর শূন্য আসনে?

অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দই কি স্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদে বৃত হবেন? কিন্তু নন্দজী হলেন তাঁর মধ্যপন্থী রাজনীতির জন্য কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৃহৎ এক সদস্যগোষ্ঠীর বিরাগভাজন ও আস্থাহীন।

তাহলে কি রেলমন্ত্রী এস. কে. পাতিলই নির্বাচিত হবেন? মার্কিন 'লবি' মহলে পাতিলের নাম উল্লেখে অবশ্য উল্লাসের চিহ্ন দেখা দেয়। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি কামরাজের 'মতৈক্য' নীতিতে রেল হল বাতিল। মহারাষ্ট্রীয় নেতা প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীযশোবন্তরাও চ্যবনের নাম নিয়েও দিনকয়েক সদস্যদের মধ্যে কানাঘুষো চলল। ১৯৬২ সালে সামরিক বিপর্যয়ের পর ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পুনর্বিন্যাসে ও সংগঠনে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। এর ফলেই ভারতীয় জওয়ানরা ১৯৬৫ সালে আকস্মিক পাকিস্তানী আক্রমণ পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। সুতরাং দেশের কংগ্রেসী মহলে, বিশেষ করে

যুবকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এককালীন মহারাষ্ট্রের সার্থক মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীরূপে শ্রীচ্যবন ইতিপূর্বেই যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবুও তাঁকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নির্বাচিত হতে হলে তিনি বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন না, এমন নয়।

কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ তাই তাঁর প্রার্থীপদ খারিজ করে দিলেন।

কংগ্রেস সভাপতিরূপে শ্রীকামরাজ যদিও নিজেকে কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাসীন বলে বিবেচনা করেন, তাহলেও প্রধানমন্ত্রী পদে তাঁকেও বরণ করে নেওয়া যায় না। কেননা, তিনি একমাত্র তাঁর মাতৃভাষা তামিল ছাড়া হিন্দী বা ইংরেজী কোন ভাষাতেই বাক্যালাপ করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বশীল পদের চাইতে 'রাজা-গড়ার' ভূমিকা গ্রহণে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর।

কাজেই স্বর্গীয় লালবাহাদুর শাস্ত্রীর শূন্য আসনে বসবার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেবল বাকী রইলেন অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এবং তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। কামরাজী প্রথায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আশা আর রইলো না। শ্রীমোরারজী দেশাইও নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াতে রাজী হলেন না। এদিকে তখন রাজ্যমুখ্যমন্ত্রী সকলেই পরলোকগত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে দিল্লীতে উপস্থিত।

শ্রীযুত অতুল্য ঘোষের উদ্যোগে শ্রীমতী ইন্দিরাকে সমর্থন করে অধিকাংশ মুখ্যমন্ত্রী মতামত প্রকাশ করেন। তবুও কামরাজ উচ্চ পর্যায়ের কংগ্রেসী নেতৃত্বের মধ্যে ভাঙ্গন রোধ করার উদ্দেশে মোরারজী দেশাইকে বিষয়টি আবার তলিয়ে দেখতে অনুরোধ করলেন। শ্রীমোরারজীর এক কথা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিনি করবেনই। বয়স প্রায় সত্তরের উপর। ঋজু দেহ। সুন্দর স্বাস্থ্য। কিন্তু এক-গুঁয়েমিপনাই তাঁকে অনেকের বিরাগভাজন করে তুলেছিল। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অনুপযুক্ত বলে ভেবেছিলেন অনেকেই।

কিন্তু মোরারজী আপন সংকল্পে অটল। হলোই বা ইন্দিরা পণ্ডিত জওহরলালের কন্যা। তবুও তিনি নারীর নিকট নিজের পুরুষকারের দাবি ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। কাজেই দুই-তরফা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া পথ রইলো না। শ্রীমতী গান্ধী এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। অবিচলিত কণ্ঠে বললেন :

আমি নির্বাচনের সম্মুখীন হতে ভয় পাই না। চ্যালেঞ্জকে ভয় করি না।

এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল এক প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বনাম নবীনা, আধুনিক প্রগতিশীল ভাবধারার উত্তরাধিকারিণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। বলা যায় ভারতীয় জনমত দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। স্বতন্ত্র পার্টি, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি রাজনৈতিক দল কংগ্রেস সিণ্ডিকেট তথা 'বংশ পরম্পরা' শাসনের প্রবর্তন করতে কিছুতেই রাজী হলেন না। অপরদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রী এস. এ. ডাঙ্গে প্রমুখ বহু বামপন্থী দলনেতা ইন্দিরাকে সরাসরি সমর্থনের জন্য আবেদন জানালেন।

এ রাজনীতিই তাঁকে আজ নিয়ে এসেছে একেবারে সম্মুখ সারির প্রথম আসনটিতে। ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৬ সনের আগে পর্যন্ত শ্রীমতী গান্ধী নিজেও জানতেন না যে, তাঁকেই বেছে নেবেন ঝানু রাজনীতিকরা সবাই প্রধানমন্ত্রীর পদটির জন্য। অথচ একদা রাজনীতি ছিল দেশসেবা। জীবনের ব্রত। আজ তা হয়েছে অনেকটা জীবিকা আর তলায় তলায় চাবি-কাঠি নাড়া। আর এ রাজনীতি খেলার পেছনে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন ৪নং যন্তর-মন্তর রোডের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার ; ১৯নং ক্যানিং লেনের শ্রীঅতুল্য ঘোষ ; ৭নং ত্যাগরাজ রোডের শ্রীমোরারজী দেশাই ; ৭নং রায়সিনা রোডস্থ বাবু জগজ্জীবন রাম ; ১৯নং মতিলাল নেহরু মার্গের শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী আর চাণক্য-পুরীতে 'মধ্যপ্রদেশ ভবনে' মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র।

১৯ জানুয়ারি, ১৯৬৬। শীতের দিল্লীর ঘন কুয়াশা ভেদ করে

প্রভাতী সূর্য তখনো উদিত হয়নি পূর্ব দিগন্তে। খুব সকাল সকাল ওঠা ইন্দিরাজীর ছোটবেলাকার অভ্যাস। তবু আজ আরও অনেক আগে ঘুম ভেঙ্গে গেল তাঁর। এক নম্বর সফদারজঙ্গ রোডস্থ ছোট বাসভবন থেকে নিঃশব্দে তিনি বেরিয়ে পড়লেন রাজঘাটের উদ্দেশ্যে। চললেন গান্ধীজীর সমাধিঘাটে। জীবনের সংকট মুহূর্তে অনেক ভারতীয় নেতাই দেশের গৌরব, জাতির জনক গান্ধীজীর সমাধিপীঠে গিয়ে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। শান্তি খোঁজেন। কিন্তু ইন্দিরার কাছে মহাত্মার স্মৃতি কেবল অনুপ্রেরণার উৎস নয়। তাঁর জীবনের সঙ্গে, বিশেষ করে নেহরু পরিবারের আরও অনেকের মতো তিনিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিঃশব্দে গান্ধীজীর সমাধিস্থলে উঠে গিয়ে করজোড়ে দাঁড়ালেন শ্রীমতী ইন্দিরা। আজ চলচ্চিত্রের মতো বহু স্মৃতিকথা পরপর তাঁর মনের পটে উদয় হতে লাগল। জওহরলালের এ কন্যা শুধু বাপুজীর স্নেহধন্যাই নন, জেলে কিংবা জেলের বাইরে অনেক সময় জওহরলালের এ রুগ্ন কন্যাটির ব্যক্তিগত খোঁজখবর নিতেন, তদারক করতেন বাপুজী। কতবার জওহরলালকে জেলে চিঠি লিখে জানিয়েছেন। মেয়ের কথা লিখে বন্দী পিতাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন :

'ইন্দুর সঙ্গে দেখা হলো, ও বেশ হাসিখুশিতে আছে। গায়ে-গতরে একটু বড়ও হয়েছে।'

কারাগারে জওহরলাল বাপুজীর সে পত্র পেয়ে কতদিন না বুঝি হেসে উঠেছেন খুশি হয়ে। আজ গান্ধীজীর মহাসমাধিক্ষেত্রে শ্রদ্ধার্ঘ জানাতে এসে কত স্মৃতি-কথাই না ইন্দিরার মনে পড়ল।

রাজঘাট থেকে ইন্দিরাজী ধীর পায়ে চলে এলেন পার্শ্ববর্তী শান্তিবনে। পিতা জওহরলালের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে এ শান্তি-বনের প্রশান্ত পরিবেশে ২৭ মে ১৯৬৪। পিতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন শ্রীমতী ইন্দিরা। এর পর তিনি 'তিনমূর্তি ভবন'-এ এসে উপস্থিত হলেন। স্বর্গত পিতার এই সরকারী বাসভবনে দীর্ঘকাল তিনি বসবাস করে এসেছেন। পিতার দেখাশুনা সেবাশুশ্রূষা ও

অভ্যাগত অতিথিদের আপ্যায়নের মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনমূর্তি ভবনের বিরাট প্রকোষ্ঠগুলি আজ তাঁকে বুঝি হাতছানি দিয়ে আমন্ত্রণ জানাল। হল ঘরের সম্মুখে পিতা জওহরলালের প্রতিমূর্তিটির সামনে শ্রীমতী গান্ধী কিছু সময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন নতশিরে। মনে পড়লো, জওহরলাল তাঁর কাছে কেবলমাত্র পিতা বা গুরু নন; পরলোকগত মাতার ভূমিকাও তাঁকে নিতে হয়েছে অনেক দিন। তিনি আজ যা, অর্থাৎ যা কিছু তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা, অনুপ্রেরণা, তার সবটা না হলেও বেশির ভাগই তিনি লাভ করেছেন কোন স্কুল বা কলেজে নয়, স্নেহাতুর ঐ মহামহিম পিতৃদেবের নিকট। নির্জন কারাগারে বসেই জওহরলাল কন্যার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পত্রধারার অবতারণা করে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে। হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর অতীতের ফেলে-আসা দুনিয়ার সঙ্গে। কারাগার থেকে লিখে পাঠানো তাঁর জন্মদিনে বাবার একটি বাণীর কথা আজ মনে পড়ল। বাবার সে বাণীই জীবনের ধ্রুবতারারূপে তাঁকে নিয়ে চলেছে বুঝি সকল দুস্তর বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে আপন লক্ষ্য পথে। বাবার সে আশীর্বাণী এখনও কানে বাজে:

'সাহসে বুক বাঁধবে মা। তাহলেই সব কিছু এসে যাবে। যদি তুমি সাহসী হও তাহলে কোন ভয় পাবে না। এবং এমন কিছু কখনো করবে না যাতে তুমি লজ্জিত হবে।

'চল আমরা সূর্যের সঙ্গে গিয়ে মিতালী পাতাই। কাজ করি আলোকের মধ্যে। গোপনে বা চোরের মতো কিছুই যেন না করি। আর যদি তুমি তাই করো, ইন্দু, তবে দেখবে তুমি আলোর শিশুর মতো গড়ে উঠতে পারবে। পারবে অকুতোভয়ে, নির্মল, প্রশান্ত চিত্তে। যাই ঘটুক না কেন, আমি চাই তুমি যেন ভারতমাতার সেবায় বীর সৈনিক হয়ে গড়ে উঠতে পারো।

'ছোট্ট মা, আজ তবে যাই কেমন?'

বাবার কথাগুলি ইন্দিরার মনে জাগালো নতুন প্রেরণা। নতুন উৎসাহ। সাহস। স্বাধীন ভারতে প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচন এ প্রথম। সামনে তার অগ্নিপরীক্ষা। বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শ্রীমতী গান্ধী গুনগুন করে উঠলেন স্বর্গত পিতার প্রিয় কবির গুটিকয়েক লাইন: রবার্ট ফ্রস্ট-এর লেখা।

'The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.'

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গাড়ী ছোটালেন সংসদ ভবনের দিকে। লোকসভা ভবনের এক নম্বর গেটের সামনে গাড়ী এসে থামলো। ইন্দিরাজী স্মিত হেসে গাড়ী থেকে নামলেন। ইতিমধ্যেই গেটের সামনে রীতিমত ভীড় জমে উঠেছে জনতার। সবাই তাঁকে ঘিরে ধরলো। পরনে তাঁর সাদা ধবধবে খদ্দরের শাড়ী, গায়ে বাদামী রংয়ের কাশ্মীরী শাল। বুকের কাছটায় টাটকা একটি লাল গোলাপ আঁটা। বাবাও ঠিক এমনি কোটের বোতামে গোলাপ আঁটতে ভালোবাসতেন। ইন্দিরাও। ইন্দিরাও তো আজ পরলোকগত পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতের কর্ণধার হতে চলেছেন।

কেন্দ্রীয় হলে পা দিয়েই ইন্দিরা করজোড়ে সবাইকে বিনীত অভিবাদন জানালেন। পরিচিত যাঁরা তাঁদের জানালেন মৃদু সম্ভাষণ। প্রতিদ্বন্দ্বী মোরারজী দেশাই-এর দিকে ছুটে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন দুহাত তুলে। সমবেত জনতা জয়ধ্বনি দিলে।

এবার বুঝি এসে গেল দুর্লভ মুহূর্তটি। পার্লামেন্টের সদস্যরা নিজ নিজ ব্যালট পেপার সংগ্রহের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। সামনে তাঁদের পথ দুটি। একই কংগ্রেসের দুই কর্মধারা—একদিকে অনমনীয় ধনতন্ত্র-ঘেঁষা শ্রীমোরারজী দেশাই ও তাঁর রক্ষণশীল মনোভাব। আর অপর দিকে জওহর-কন্যা ইন্দিরার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ। পাঁচ শতাধিক সদস্যের এই নির্বাচনের উপর ভারতের ভাগ্য আজ

করছে নির্ভর। আজ স্বাধীন ভারত কি নেহরু প্রবর্তিত সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ ও গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার আদর্শ লক্ষ্য করে এগিয়ে যাবে, না চলবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মোরারজী দেশাইয়ের রক্ষণশীল গোঁড়া পথে? সংসদ সদস্যদের সামনে আজ মহা সঙ্কট। বেছে নিতে হবে আজ ভারতের নতুন কর্মধারা, নীতি ও আদর্শ। কাজেই সদস্যদের মধ্যে দেখা দিল বিপুল উত্তেজনা। যাঁরা অসুস্থ তাঁরাও ছুটে এসেছেন স্ট্রেচারে করে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে। তাঁদের সংখ্যাও কম নয়, ছাব্বিশ জন। রুগ্ন, অক্ষম একজনকে তো 'হুইল চেয়ারে' করে নিয়ে আসা হয়েছে ভোটের জন্য।

ভোটপর্ব চুকে গেল নির্বিঘ্নে। এবার ভোট গণনার পালা। সকলের মনে দারুণ উৎকণ্ঠা। 'লাঞ্চের' কথাও ভুলে গেলেন অনেকে। তবে কফি আর আনুষঙ্গিক খাবার কিছু কিছু আসতে লাগল সংসদের কাফেটারিয়া থেকে। মহারাষ্ট্রের দিলখোস নেতা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সময় কাটাবার জন্যই বুঝি সংসদীয় মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহকে ধরে বসলেন একটি গান কিংবা গল্প শুরু করতে। সত্যনারায়ণ বাবু সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দী ছড়া কেটে গেয়ে উঠলেন:

'ভুখে, হোয়ে না ভজন কৃপালা!'

(যখন ক্ষিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে তখন কি আর ভাই ভজন গাওয়া চলে?)

তিনটে বাজতে দু'মিনিট আগে জনৈক সদস্য কাউন্টিং বুথ থেকে ছুটে এলেন। সবাই তখন তাঁকে ঘিরে ধরলেন। সমবেত প্রশ্ন: কে জিতেছেন, ভাই? ছেলে না মেয়ে, কে জিতলেন?

সদস্যটি একগাল হেসে জবাব দিলেন:

'ভাদাই হো!'

স্বর্গত মতিলাল নেহরুও বুঝি একদিন এমনি করে খুশিতে ফেটে পড়েছিলেন। পত্নী স্বরূপরাণীর কাছে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছিলেন: 'মেয়েই হয়েছে। আমাদের জওহরের মেয়ে। মেয়ে গো মেয়ে।'

'মেয়ে গো মেয়ে!' অর্থাৎ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই হয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাযুদ্ধে বিজয়ী। ইন্দিরা পেয়েছেন ৩৫৫টি ভোট আর শ্রীমোরারজী পেয়েছেন মাত্র ১৮৯টি। প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে ১৮৬টি ভোট বেশি।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রথম মহিলা ও সর্বকনিষ্ঠা প্রধানমন্ত্রী হলেন। যদিও সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, তবুও ইন্দিরা বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রী দেশ ভারতের মহিলা প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদার অধিকারিণী।

সমবেত জনতা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো:

জয় ইন্দিরা গান্ধী কী জয়॥
ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ॥
'লাল গোলাপ' জিন্দাবাদ॥
জওহরলাল নেহরু জিন্দাবাদ॥

নেহরু নীতিরই হল জয়। শ্রীমতী গান্ধীকে ঘিরে ধরলো সাংবাদিকের দল। কেন্দ্রীয় হলে ফটোগ্রাফারের ফ্ল্যাসলাইট ঝিলিক মেরে উঠলো মুহুর্মুহু। নিউজ রীল আর টেলিভিসন ক্যামেরা ঘুরতে লাগলো এদিক ওদিক। সমবেত জনতা জয়ধ্বনি করে উঠলো ইন্দিরাজীর।

উনিশে জানুয়ারী ১৯৬৬ সালে (এমনি এক উনিশ তারিখে—উনিশে নভেম্বর, ১৯১৭ সালে জন্ম তাঁর। পিতা জওহরলালেরও একই মাসে জন্ম। মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে, ১৮৮৯ সালে।) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হলেন। পাঁচদিন পরেই তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করলেন। আর সে শপথবাক্য পাঠ করালেন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন।

প্রধানমন্ত্রীর এ আসন তিনি ইচ্ছা করলে উনিশ মাস পূর্বেই গ্রহণ করতে পারতেন। জওহরলালের মৃত্যুর পর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একদল তাঁকেই দলের নেতা নির্বাচিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু

ইন্দিরাজী তখন সে প্রস্তাবে সম্মত হননি। চাননি পিতা নেহরুর উত্তরাধিকারিণী প্রধানমন্ত্রী হতে। তাই লালবাহাদুর শাস্ত্রীই প্রধান-মন্ত্রীর ভার গ্রহণ করেন। শাস্ত্রীজী পরে তাঁর মন্ত্রিসভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাও গ্রহণ করেননি। তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভারই নিয়েছিলেন পরে। শাস্ত্রী মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান ছিল চতুর্থ।

শাস্ত্রীজীর শূন্য আসনে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন এমন কি কংগ্রেস মহলের অনেককেও বিস্মিত করেছিল বিপুলভাবে। কেননা, নির্বাচনের আগে অনেকেই ভাবতে পারেননি শ্রীমতী গান্ধীর নাম প্রস্তাবিত হবে। ইতিপূর্বে শ্রীগুলজারীলাল নন্দর নামও একবার বিবেচিত হয়। নন্দজীর স্থান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় দ্বিতীয়। তবুও তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আস্থাহীন হন। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা যদি নির্বাচিত হন, তাহলে সরকারী কর্মনীতি কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের হাতের মুঠোয় থেকে যাবে। শ্রীমতী ইন্দিরা হবেন বৃদ্ধ কংগ্রেস নেতাদের হাতের পুতুল। তাঁকে দিয়ে কংগ্রেস 'বস'দের মর্জিমাফিক কাজ করান যাবে, যা গোঁড়া শ্রীমোরারজী দেশাইকে দিয়ে কখনও সম্ভব হবে না। এ জন্যেই দেশাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইন্দিরাকে খাড়া করেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ ও তাঁর গোষ্ঠীভুক্ত 'সিণ্ডিকেট' পন্থীরা। কিন্তু তাঁর এ আশায় ছাই পড়তে দেরি হয়নি। কামরাজ তাঁর এ ভুল দুদিন পরেই টের পেয়েছিলেন। সেদিন তাই অনুশোচনা করে বলে উঠেছিলেন : কি ভুলটাই না তিনি করেছিলেন ইন্দিরাকে নির্বাচিত করে। ইন্দিরা হলো বড়লোকের বেটী, আর আমি হলাম গরীব মানুষের ছেলে, তাই চিনে উঠতে পারিনি।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র তার রাষ্ট্রপ্রধানরূপে এক নারীকে নিল বরণ করে। ভারতের মতো পৃথিবীর আর কোন বৃহৎ রাষ্ট্র দেশের ও দশের কর্ণধার পদে কোন মহিলাকে নির্বাচিত করেনি। অবশ্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশ প্রতিবেশী সিংহল ১৯৬০ সালে আততায়ার

হাতে নিহত প্রধানমন্ত্রী এস. বন্দরনায়কের শূন্য আসনে তাঁর বিধবা পত্নী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ককে সিংহলের প্রধানমন্ত্রীরূপে নির্বাচিত করে।

কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে শ্রীমতী বন্দরনায়কের সে নির্বাচন পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগেরই নামান্তর। শ্রীমতী বন্দরনায়কের ইতিপূর্বে রাজনৈতিক তেমন কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পদে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন ইতিহাসে এ প্রথম। কেননা তিনি নির্বাচিত হন নেহরু-তনয়ারূপে নন, নির্বাচিত হন ভারতীয় রাজনীতির ও কর্মসূচীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয়, অভিজ্ঞতা ও একান্নবর্তিতার জন্য। নেহরু পরিবারের কংগ্রেস রাজনীতির হাতেখড়ি তিন পুরুষের। ঠাকুরদা মতিলাল থেকে শুরু। আর পিতা জওহরলাল তো দীর্ঘ সতের বছর কাল ধরে ভারতের কর্ণধার ছিলেন প্রধানমন্ত্রীরূপে। ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গোল্ডামিয়ারও (Mrs. Goldameir) অবশ্য একজন মহিলা। এখানে উল্লেখযোগ্য, পৃথিবীর তিনজন মহিলা প্রধানমন্ত্রীই এশিয়ার। এশিয়াই এ গৌরবের একমাত্র অধিকারী। জাগ্রত এশিয়া!

তথাকথিত গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন মুলুক বা ইউরোপের কোন দেশে নারীদের এভাবে সম্মানিত করা হয়নি। যদিও শ্রীমতী গান্ধী পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার নন; তবুও তিনি শ্রীমতী বন্দরনায়কের বা শ্রীমতী গোল্ডামিয়ারের চাইতে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র দেশের মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

তাই ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার মাস দুই পর তিনি যখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ জনসনের নিমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান, তখন কৌতূহলী সাংবাদিকের দল তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাঁকে উদ্‌ব্যস্ত করে তুলেছিল। জানতে চেয়েছিল মহিলা হয়ে বিপুলায়তন ভারতীয় জনগণের কর্ণধাররূপে প্রধানমন্ত্রীর এ গুরু দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম হবেন

কি না। কেউ কেউ বুঝি এমন প্রশ্নও তুলেছিল, মেয়েদের রাজনীতি ক্ষেত্রে অতবড় ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত কি? একটু স্মিত হেসে প্রধানমন্ত্রী জবাব দিয়েছিলেন :

'আমি কিন্তু নিজেকে কেবল মেয়ে বলে মনে করি না। আমি কাজের লোক, কাজ করতে এসেছি।'

বেটি ফ্রিডান (Betty Friedan)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে (লেডিজ হোম জার্নাল, মে ১৯৬৬) তিনি আরো বলেন :

'আমার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন ভারতে কোনো বিস্ময় সৃষ্টি করেনি। কেননা ভারতে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সমাজ-জীবনে রাজনীতি বা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে পিছপা হয়নি। আমাদের দেশে মহিলা ইঞ্জিনীয়ার, মহিলা রাজ্যপাল, মহিলা রাষ্ট্রদূত, মহিলা বিচারক আর মহিলা কূটনীতিক বা প্রশাসকের অভাব নেই। আমাদের বহু গ্রাম্য সংস্থায় রয়েছে মেয়েরা। জীবনের প্রতি পদে পদে পুরুষের পাশে রয়েছে মেয়েদের আসন। কাজেই আমার নির্বাচন ভারতীয় নারীদের কাছে নারীপুরুষের সমান অধিকার। কোনরূপ পার্থক্যের প্রশ্ন ওঠে না। ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এ শিক্ষাই দেয় যে, নারী পুরুষের সম্বন্ধ হোল পারস্পরিক। ভারতীয় পৌরাণিক দেবতা 'অর্ধনারীশ্বর' (অর্ধেক দেবতা অর্ধেক নারী) নারী-পুরুষের এ সম্বন্ধেরই প্রতীক। ভারতীয় দেবদেবীর নামকরণেও দেখা যায় এ যুগল-মিলন। যেমন, রাধাকৃষ্ণ = রাধা + কৃষ্ণ ; সীতারাম = সীতা + রাম ইত্যাদি। শক্তির উপাসিকাদের মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রমুখ দেবীরাও আছেন।

খৃস্টীয় তৃতীয়-পঞ্চম শতকের অজন্তার ফ্রেস্কো গুহাতেও ভারতীয় নারীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পিত হয়েছে বলে শ্রীমতী গান্ধী জানান এবং বলেন—এক কলারসিকের মতে 'অজন্তা গুহার গায়ে অঙ্কিত চিত্রাবলীতে নারী পূজার এমন নিদর্শন আর কোথাও দেখা যায় না।' প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতেও মেয়েদের পদমর্যাদা ও কৌলিন্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

মধ্যযুগে ভারতে আফগান অভিযানের পর থেকে কিন্তু বিপরীতমুখী হাওয়া বইতে শুরু করে। জওহরলাল তাঁর 'ভারত-আবিষ্কার'-এ ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'দুর্ভাগ্যজনক যে সব ঘটনা ভারতে সংঘটিত হয়েছে তাদের মধ্যে পর্দাপ্রথা বা নারীদের অন্তঃপুরবাসিনী করে রাখার প্রথাই উল্লেখযোগ্য।'

ইতিপূর্বে ভারতে অবশ্য উচ্চবংশীয়া নারীদের পৃথক করে রাখার প্রথা চালু ছিল। যেমন প্রাচীন গ্রীস বা অপরাপর দেশেও ছিল। মুঘল আমলেই পর্দাপ্রথার প্রসার ঘটে। তখন হিন্দু ও মুসলিম অনেকেই পর্দাপ্রথাকে নারীদের পদমর্যাদার চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করে। পর্দাপ্রথা তখন বিশেষ করে দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, রাজপুতানা, বিহার ও বাংলার উচ্চ অভিজাত মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। [কৃষ্ণা হাতিসিং : 'ডিয়ার টু বিহোল্ড'—পৃঃ ১৭৬]

সতীদাহ, পর্দাপ্রথা ও বাল্যবিবাহ (মুসলিম আক্রমণকারীর দল ভারতীয় বিবাহযোগ্যা মেয়েদের দলে দলে অপহরণ করার ফলেই এ সবের শুরু) প্রথা সত্ত্বেও ভারতীয় নারী সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে হাজার হাজার মেয়ে সাড়া দিয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কারাবরণ করেছে, আত্মাহুতি দিতেও দ্বিধা করেনি। ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওলটালে দেখা যায়, নারী দার্শনিক, মনীষী, প্রশাসক বা বীর যোদ্ধার কোনদিন অভাব ঘটেনি। সুলতানা রিজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বুদ্ধি ও সাহসিকতার সঙ্গে শাসনকার্য চালিয়ে গেছেন। নূরজাহান মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে প্রধান ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃটিশ ফৌজকে রেখেছিলেন কোণঠাসা করে।

সাম্প্রতিক ইতিহাসেও মহীয়সী নারীর জ্ঞান গরিমার অভাব নেই ভারতে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কেবল কাব্যক্ষেত্রেই

যশস্বিনী নন, কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভানেত্রীর পদও তিনি অলংকৃত করেন। স্বাধীন ভারতে উত্তরপ্রদেশে রাজ্যপালের পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পশ্চিমবঙ্গের মতো ঝঞ্ঝাসঙ্কুল রাজ্যের রাজ্যপালরূপে যথেষ্ট শক্তি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মস্কো, ওয়াশিংটনে স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত পদে বৃত হন। তিনি বৃটেনে ভারতীয় হাই-কমিশনারের পদও অলংকৃত করেন। রাষ্ট্রসংঘের সভাপতিও নির্বাচিত হন (১৯৫৩-৫৪)। এ সম্মান কেবল ভারতীয়ের প্রতি নয়, বিশ্বের নারী সমাজের প্রতি। রাজকুমারী অমৃত কাউর, ডঃ সুশীলা নায়ার প্রমুখ অনেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করে গিয়েছেন। বর্তমান তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথীর শাসনকার্য পরিচালনাও প্রশংসার।

১৯৬৫ সালে মার্কিন কংগ্রেসে যেখানে বারো জন নির্বাচিত সদস্যা, সেখানে ভারতীয় সংসদে ৫৯ জন সদস্যা নির্বাচিত হন। আর বিভিন্ন রাজ্য পরিষদে বহু মহিলা সদস্যা নির্বাচিত হন। শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী ভারতের অন্যতম বৃহত্তম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরূপে কৃতিত্বের সঙ্গে কার্যভার পালন করেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রীমতী গান্ধীকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিলো, তিনি মহিলা বলে দেশের শাসনকার্য পরিচালনায় কোন বাধার সম্মুখীন হন কিনা। হেসে তিনি জবাব দিয়েছিলেন :

'আমি তো মনে করি না আমার মেয়ে হওয়াটা কোনরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। মানুষের মধ্যে প্রাচীর তুলে দেওয়া একটা প্রচেষ্টা মাত্র। আপনি যদি বলেন প্রধান মন্ত্রীর কাজ কেবল পুরুষের তাহলে সে পুরুষের এমন অনেক গুণ রয়েছে যা মেয়েদের নেই; তাহলে আমি বলি সে সব গুণ কি কি? শারীরিক শক্তি সামর্থ্য কি? না আপনি যদি কোন দুর্বল খুঁত খোঁজেন তা যে কোন পুরুষের মধ্যেই পাবেন। এবং আমি তো মনে

করি না যিনি রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন তিনি নিজেকে কোন দলে, তা পুরুষ বা নারী, ধর্ম বা শ্রেণীর প্রতিভূ, বলে মনে করবেন। যদি জনগণ আপনাকে জাতির নেতৃত্বে বরণ করে নেয় তাহলেই ত সব

৩

'ছেলে, না মেয়ে? কে জিতলেন?'

১৯ জানুয়ারী ১৯৬৬ সালে কেন্দ্রীয় সংসদ ভবনে সমবেত কংগ্রেস এম. পি-দের উৎকণ্ঠা সেদিন প্রকট হয়ে উঠেছিল দলীয় নেতা নির্বাচনের সংকট মুহূর্তে। ছেলে নয়, মেয়েকেই সেদিন তাঁরা বরণ করে নিয়েছিলেন আপন নেতৃত্বের পদে। বিজয়িনী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট গুজরাটের কট্টর কংগ্রেসী নেতা মোরারজী দেশাইকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়েছিলো।

উনপঞ্চাশ বছর আগে (১৯ নভেম্বর ১৯১৭) এমনি আর একদিনও প্রশ্ন উঠেছিলো :

'কে, ছেলে হোল না মেয়ে?'

রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বধূ কমলা গর্ভযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। তাঁর করুণ আর্তনাদ, চাপা কান্না বেরিয়ে আসছিলো ঘর থেকে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। সবাই নিঃশব্দে কিছু একটা প্রত্যাশা করছেন দারুণ উৎকণ্ঠায়।

আপাদমস্তক শুভ্রবসনে ঢাকা স্কটিশ চিকিৎসক ঘর থেকে এবার বেরিয়ে এলেন নিঃশব্দে। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : 'বনি ল্যাসি'।

স্কটিশ সার্জনের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

এলাহাবাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল মতিলাল নেহরু তাঁর বিরাট আনন্দভবনের বারান্দায় এতক্ষণ ধরে অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন। পরনে ধুতি ও গায়ে সাদা কুর্তা। গলায় সাদা শাল জড়ান। মাথায় খাদি টুপি। দেখে রোমান সেনেটর বলে ভ্রম হয়। তাঁর বুক থেকে এবার বুঝি স্বস্তির নিঃশ্বাস ঝরে পড়লো

পাশের একটি ঘরে এতক্ষণ তরুণ ব্যারিস্টার পুত্র জওহরলাল জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলেন বাইরে অনেকটা নির্লিপ্তের মতো। কিন্তু দৃষ্টি তাঁর আবদ্ধ ছিল পাশের রুদ্ধ ঘরের দিকে—যেখানে পত্নী কমলা কাতরাচ্ছিলেন গর্ভযন্ত্রণায়।

স্কটিশ সার্জনের গলা শুনে এবার তিনি বেরিয়ে এলেন। ধন্যবাদ জানালেন বিদেশী চিকিৎসককে। সমবেত নার্সদের। উদ্‌বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন প্রসূতি কেমন আছে?

'ভালই, তবে বড় দুর্বল।'

মা স্বরূপরাণী নেহরু প্রশস্ত ড্রয়িংরুমে ডিভানের উপর বসে এতক্ষণ বুঝি মনে মনে ইষ্টনাম জপছিলেন। পাশে বসেছিলেন তাঁর বাল্যবিধবা দিদি।

বিরাট নেহরু পরিবারের আত্মীয়স্বজন, বান্ধব-বান্ধবী অনেকেই তখন উপস্থিত। বনি ল্যাসি—মেয়ে হয়েছে শুনে ঠাকুমা স্বরূপরাণী খুব খুশি হতে পারেন নি। একমাত্র পুত্র জওহরলালের প্রথম সন্তান মেয়ে হবে তিনি বুঝি প্রত্যাশা করেননি। চেয়েছিলেন তাঁর নাতিই হোক। আশপাশের অপরাপর মেয়েদের মুখেও বুঝি আশাহতের ছাপ নেমে এসেছিলো।

মতিলাল তা লক্ষ্য করলেন। পত্নীর কাছে এগিয়ে এসে বললেন :

'মেয়ে হয়েছে বলে তুমি কেন মন খারাপ করছো বলতো? তুমি কি তোমার মেয়েদের তোমার ছেলের চাইতে অন্যচোখে দেখে থাক? তাদের সমান সমান খেতে পরতে দাও না কি?'

মতিলাল আপনার কুর্তার দুই পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। পুরু কার্পেটের উপর একবার পায়চারী করলেন। তারপর ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন :

'দেখবে জওহরের এ মেয়ে তোমার হাজার ছেলের বাড়া হবে। আমার কথা যাচাই করে দেখো।'

ঝানু কৌঁসুলী। সওয়াল শেষ করে এবার বুঝি থামলেন।

পত্নীর মুখের দিকে একবার তাকালেন আড়চোখে। তারপর গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

এলাহাবাদের প্রাসাদপ্রতিম 'আনন্দভবন' সেদিন আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠেছিলো। 'সিভিল লাইন' আলোকিত হয়ে উঠেছিলো দেওয়ালির রাত্রির মতো।

মতিলালই প্রিয় নাতনীর নাম রাখলেন ইন্দু। ইন্দিরা। ইন্দিরা মানে লক্ষ্মী। ইন্দিরা তাঁর আপন মায়ের নাম। তাঁর মা ছিলেন বেঁটেখাটো কাশ্মীরী মেয়ে। বেঁটেখাটো হলে কি হবে, তিনি ছিলেন জেদী, দৃঢ়চেতা মেয়ে। যেটা একবার করবেন ঠিক করেছেন সেটা করবেনই। অন্যথা হবার উপায় নেই। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার সাহস হতো না বাড়ীর কারও। এমন কি পুত্র মতিলালের তো নয়ই।

বাবা আর মা কমলা মেয়ের নাম রাখতে চাইলেন 'প্রিয়দর্শিনী'। ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী। পুতুলের মতো ফুটফুটে মেয়ে। বড় বড় দুটি কালো চোখ। মাথায় একরাশ কালো চুল। ছিমছাম গড়ন। টুকটুকে মুখ। সুঁচোলো নাক। ধবধবে কটা রঙ। দেখলেই কোলে তুলে আদর করতে ইচ্ছে করে।

জওহরের প্রথম সন্তান। তাকে একবার স্বচক্ষে দেখতে চাইলেন মুন্সী মোবারক আলী। মুন্সীজী আনন্দভবনের পুরনো লোক। প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর অধীনে আনন্দভবনের পঞ্চাশ-ষাট জন চাকর-বাকর, বাবুর্চি, খিদমতগার খাটছে সদাসর্বদা। মতিলাল পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করে চলেন। হাইকোর্ট থেকে রোজ ফেরার পথে একবার মোবারক আলীর তদারক করে যান। বৃদ্ধ মোবারক আলী কিন্তু কিছুদিন থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ভুগছিলেন দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে। জীবনের আশা ছিল না। স্বরূপরাণী, এমন কি বধূ কমলাও সময় পেলে তাঁকে এসে একবার দেখে যেতেন। শুধাতেন :

'আজ কেমন আছো, মুন্সীজী?'

'আর আছি!' মুন্সীজী জানেন, তাঁর এ অসুখ সারবার নয়। তবু বলেন :

'ভালই আছি।'

তারপর দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে ওঠেন, 'আমার নতুন ভাইকে একবার আমায় দেখালে না? ভাইকে কোলে নিয়ে একবার আল্লার দোয়া মাগতাম'।

মোবারক আলী জওহরলালকে ছোটবেলা থেকে কোলে পিঠে করে বড় করে তুলেছেন। রোজ রোজ আনন্দভবনের চাতালে বসে করেছেন কত গল্পগুজব। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্ধর্ষ কত কাহিনী বলে গেছেন মুখে মুখে। বালক জওহরলাল মোবারক আলীর কোলে বসে সে সব কাহিনী শুনত। ঝান্সীর রাণী, তাঁতিয়া টোপে, নানা সাহেবের বীরত্ব গাথা শুনতে শুনতে মুগ্ধ বালক হয়ে উঠতো উত্তেজিত, উদ্‌বেলিত।

মুন্সীজীর চোখদুটো উঠতো জ্বলে। নিষ্ঠুর গোরা সৈন্যদের অত্যাচারের কথা বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ আসতো রুদ্ধ হয়ে।

সেই জওহরলালের প্রথম সন্তান এসেছে। মুন্সীজী তাকে কোলে নিয়ে আল্লার দোয়া মাগবেন। বৃদ্ধের শেষ বাসনা। মুন্সীজী মতিলালের কাছেও কথাটা পাড়লেন।

'জরুর ভাইসাব, জরুর।'

মতিলাল মাথা নেড়ে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ মুন্সীজীর শেষ আশা পূরণ করলেন।

পুঁচকে ইন্দিরাকে তাই একদিন কাশ্মীরী শালে আপাদমস্তক ঢেকে নার্স মুন্সীজীর কুটীরে নিয়ে এলো। নার্সের সঙ্গে ঠাকুমা স্বরূপরাণী ও তাঁর দিদি, মা কমলা নেহরু সবাই পিছু পিছু এলেন। ঠাকুর্দা মতিলালও এ সময় কোর্ট থেকে এসে উপস্থিত হলেন।

কাশ্মীরী শালে মোড়া ফুটফুটে ইন্দিরাকে তিনি মোবারক আলীর কোলে তুলে দিলেন। বৃদ্ধ মোবারক নবজাতককে কোলে নিয়ে বিড় বিড় করে উঠলেন। তাঁর রুদ্ধ কণ্ঠ দিয়ে কোনো শব্দ

বেরুল না। শুষ্ক গণ্ড বেয়ে কেবল গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা অশ্রু। আনন্দাশ্রু। এরপর এক সময় বলে উঠলেন :

'মোবারক হো ভাই!'

আল্লার দোয়া যেন জওহরলালের এ পুত্র সন্তানের উপর বর্ষিত হয়।

জওহরলালের এ সন্তান পুত্র নয়। কন্যাই। মুন্সীজীর কিন্তু সে খেয়াল নেই। মতিলাল আর পত্নী স্বরূপরাণীর দিকে চেয়ে তিনি বলে উঠলেন :

'জওহরলালের এ পুত্র হাজার জওহরের মতো নেহরু বংশের নাম উজ্জ্বল করবে দেখে নিও ভাইসাব, ভাবীসাব! আমার কথা মিথ্যে হবে না।'

মুন্সীজী বুঝি এ পরম মুহূর্তটির জন্যই বেঁচে ছিলেন। তারপরই তাঁর অসুখ বেড়ে যায় আর তিনি মারা যান।

কিন্তু মুন্সীজীর সে ভবিষ্যৎবাণী—তাঁর শেষ কথা কি মিথ্যে হয়েছে?

ইন্দিরা বাড়ীর একমাত্র মেয়ে। [সাত বছর পরে ১৯২৪ সালে কমলার আর একটি সন্তান, ইন্দিরার একটি ভাই জন্মেছিল। কিন্তু তিন দিন পর তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। তারপর থেকে কমলার শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। আর তা সেরে ওঠেনি] ঠাকুরমা ও ঠাকুরদা সকলের চোখের মণি। ঠাকুমাই আদর করতেন বেশী। ইন্দিরাও সব সময় ঘুর-ঘুর করতো তাঁর আশেপাশে। আধো-আধো গলায় বলে উঠতো, 'ডোল আম্মা'! দাদী বলে ডাকতে তখনো শেখেনি। 'ডোল' মানে লোহার জাল দেওয়া খাবারের আলমারি। ঠাকুরমা স্বরূপরাণী তার মধ্যে রাজ্যের সব মিষ্টি খাবার-দাবার পুরে রাখতেন আর নাতনীকে তা থেকে মিষ্টি বার করে খেতে দিতেন। এমন কি খাবার সময়ের ঠিক আগেও তিনি নাতনীর হাতে নাড়ু তুলে দিতে ইতস্ততঃ করতেন না। এ নিয়ে পুত্র জওহরলাল মাকে বকাবকি করতেও কসুর

করতেন না। বলতেন: 'তুমি আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা খাচ্ছ, মা।'

কিন্তু ইন্দিরার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। ঠাকুরমার কণ্ঠ জড়িয়ে আধো আধো স্বরে বলে ওঠে: 'ডোল আম্মা!'

আর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তারে-ঘেরা ঐ নিষিদ্ধ ভাণ্ডারটির দিকে।

ঠাকুরমার আদর, বাবা আর মার স্নেহ, ভালবাসা খুব বেশিদিন কিন্তু তার কপালে জুটলো না। বাবা, মা, ঠাকুরদা এমনকি ঠাকুরমা, পিসীদের কাছ থেকে তাকে দূরে দূরেই থাকতে হয়েছে ছোট বেলা থেকে। কাটাতে হয়েছে অনেক সময় একক নিঃসঙ্গতার মধ্যে। খেলবার সঙ্গীও মেলেনি তেমন। কেননা ছোটবেলা থেকেই সে দেখে আসছে রাতবিরেতে পুলিশের দল তাদের প্রশস্ত আনন্দভবনে ঢুকে বাবা, মা, ঠাকুরদা আর পিসীদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে তুলেছে পুলিশের গাড়ীতে। লাঠিপেটা করতেও ছাড়েনি। তাদের আনন্দভবনের বারান্দা থেকে দেখেছে খাদি টুপি-পরা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের মিছিল করে যেতে কংগ্রেসের তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উঁচু করে। দেখেছে তাদের বাড়ীর সামনেই মা, ঠাকুরমা, পিসীদের সুন্দর সুন্দর কতো সিল্কের শাড়ী আর ঠাকুরদা ও বাবার দামী দামী বিলিতী স্যুট, টাই, সার্ট ও টুপি আগুনে পোড়াতো। গান্ধীজীর বিলিতী দ্রব্য বর্জনের দিন। বহ্নি উৎসবের দিন তখন। তাতে মেতে উঠেছিল সবাই।

ছোট্ট মেয়ে ইন্দিরা দেখতো সব তাকিয়ে তাকিয়ে। আর পুলিশের দল তার বাবা মাকে ধরে নিয়ে গেলে পর একা একা সে তার গ্যাটাপার্চার পুতুলগুলি নিয়ে 'পুলিশ পুলিশ' খেলতো। কোনটাকে সাজাতো গাঁয়ের কিষাণ। কোনটাকে মাথায় টুপি-পরা স্বেচ্ছাসেবক। আর টিনের সঙ্গীন-উঁচু সৈন্যগুলিকে পুলিশ। আপন পুতুলগুলিকে নিয়ে সে তখন তর্জন গর্জন করতো। মারধোর করতেও ছাড়তো না: শিশুমন তার এমনি করে গিয়েছিলো বিষিয়ে।

বয়স যখন মাত্র বছর চারেক তখনই (৬ ডিসেম্বর ১৯২১) ইন্দিরা তাঁর প্রথম রাজনৈতিক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হন। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য বলে ঠাকুরদাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। ইংরেজ আদালতের একতরফা রায় তিনি মানতে রাজী হলেন না। তাই বিচারের প্রহসনে তাঁকে ছ' মাস কারাদণ্ড ও পাঁচশো টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন করার ইস্তাহার বিলি করার জন্য বাবা জওহরলালেরও ছ' মাস কারাদণ্ড ও পাঁচশো টাকা অর্থদণ্ডের হুকুম হলো। কিন্তু কংগ্রেস কর্মীরা সবাই অর্থদণ্ড দিতে অনিচ্ছা জানালেন। আদালত থেকে তখন আসামীর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোক পরোয়ানা জারী করা হলো।

ঠাকুরদার কোলে বসে বসে ছোট্ট ইন্দিরা আদালতের হালচাল সব দেখছিল। দেখছিল বৃদ্ধ ঠাকুরদা আর বাবাকে কারাবরণ করে নিতে হাসি মুখে। কিন্তু পরদিন পুলিশের দল যখন তাদের আনন্দ-ভবনে এলো বকেয়া জরিমানা আদায় করতে, আর নিঃশব্দে যখন তাদের দামী দামী কার্পেটগুলি গুটিয়ে নিয়ে পুলিশ ভ্যানে তুলতে শুরু করলো, ফ্রক-পরা ইন্দিরা তখন ছুটে এসে রুখে দাঁড়ালো। হাত-পা ছুঁড়ে মারমুখী হয়ে চীৎকার করে উঠলো :

'ও কার্পেট আমাদের। তোমরা নেবে কেন?' পুলিশ ইন্সপেক্টরের দিকে সে তার ছোট্ট মুঠি দুটি ছুঁড়ে মারছিল। আরও বুঝি কেলেঙ্কারী হতো যদি মা কমলা তাকে কোলে করে ভিতরে না নিয়ে যেতেন। (অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখযোগ্য, নেহরু পরিবারের তিন চার হাজার টাকা দামের এ সব এক একটি কার্পেট পরে নীলামে বিশ পঁচিশ টাকায় বিক্রি হয়ে গেছে এবং তা কিনেছে আমাদেরই অনেকে। জাতীয় চরিত্রের আর একটি দিক এতে প্রকটিত হয়।)

বাবা নেই। ঠাকুরদাও না। ওঁরা তখন নির্জন কারাগারে নিষ্ঠুর লৌহ-কপাটের অন্তরালে। বাড়ীতে পুলিশী হামলার অন্ত নেই।

টিকটিকিদের কড়া নজর। কাজেই মহাত্মা গান্ধী গুজরাটে তাঁর সাবরমতী আশ্রমে গিয়ে কিছুদিন থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন নেহরু পরিবারের মেয়েদের। ছোট্ট মেয়ে ইন্দিরাকে নিয়ে স্বরূপরানী এবং নেহরু পরিবারের আরও অনেকে সাবরমতী আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

সাবরমতী নদীর পারে শান্ত, সমাহিত গান্ধীজীর এ আশ্রমে আনন্দ ভবনের জৌলুস, চাকচিক্য বা আড়ম্বরের কিছু নেই। খানাপিনাও সাদামাটা। লবণবিহীন অনেকটা। বিস্বাদ।

ভোর চারটের সময় থেকে আশ্রমজীবনে কর্মব্যস্ততার শুরু। ঘর-দোর, বাসন-কোসন সব নিজের হাতে পরিষ্কার, সাফসুফ করে নিতে হতো সবাইকে। তারপর শুরু প্রার্থনা। ভজন পূজন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান আর অপরাপর ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে পাঠ ও পঠন। আধ্যাত্মিক ভারতীয় সঙ্গীত অনুশীলন। গান্ধীজীও এসে উপাসনায় যোগ দিতেন। ছোট্ট ইন্দিরাও রোজ সকালে উঠে যোগ দিত উপাসনায়। এ তার এক নতুন অভিজ্ঞতা। নতুন পরিবেশ। গান্ধীজী তাকে ভালবাসতেন। কাছে টেনে নিতেন। তালে তালে ইন্দিরাও গান্ধীজীর সঙ্গে ভজন গেয়ে উঠতো।

৪

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে ভুল করেছিলেন বলে একদিন যে আফসোস করেছিলেন, সেটা কিন্তু আদপে আফসোস নয়। অনুশোচনা নয়। প্রধানমন্ত্রীকে তিনি খাটো করেই দেখেছিলেন। এ কথা ঠিক, কংগ্রেস সংগঠনে স্বর্গত জওহরলালের যে ব্যক্তিত্ব ছিল, যে নেতৃত্ব, শ্রীমতী গান্ধীর তা ছিল না তখন। সংগঠনের আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরে সংগঠনকে নেহরু কাজে লাগিয়েছিলেন পুরোপুরি। প্রতিবাদ করার সুযোগ পর্যন্ত পাননি কেউ। 'কংগ্রেসসেবী নন' এ কলঙ্কের বোঝা কেউ ঘাড়ে নিতে সাহস পাননি। তাছাড়া স্বর্গত নেহরু মন্ত্রিসভার ভিতরে তাঁর বিরোধিতাকে একদা সুকৌশলে উৎখাত করেছিলেন। সিণ্ডিকেট চক্র বা কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের উপরতলার জোটকে মাথা তুলতে তিনি দেননি।

কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষেত্রে দেখা দিল নতুন পরিস্থিতি। যাঁরা তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে একদা বসিয়েছিলেন, তাঁরাই আজ দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে শুরু করলেন যার মানে হলো সিণ্ডিকেটই সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁদেরই আজ্ঞাবহ হয়ে চলতে হবে মন্ত্রিত্ব বজায় রাখতে হলে; না হলে পদত্যাগ। তিতি-বিরক্ত হয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন।

শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী। অথচ নিজদলের উপর কোন আধিপত্য তাঁর নেই। এমন নজীর নেই কোন দেশে। তাই, দ্বিধা সংকোচ সব তিনি কাটিয়ে উঠলেন। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে গ্রহণ করলেন চ্যালেঞ্জ। প্রমাণ করলেন তিনি কারও হাতের পুতুল নন। নারী-

চরিত্রের কোমল অভিব্যক্তি তাঁকে দুর্বল করতে পারে না। অন্তর্দলীয় সাংগঠনিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে তিনিও পিছপা নন। আঘাত হানতে জানেন, এবং তা প্রত্যক্ষ।

শ্রীমতী গান্ধী প্রথম তীর হানলেন শক্তিদ্বন্দ্বে। ১৬ জুলাই প্রধানমন্ত্রী উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের হাত থেকে তাঁর অর্থমন্ত্রক নিলেন কেড়ে, এবং নিজে তা গ্রহণ করলেন। প্রতিবাদে শ্রীদেশাই পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। ১৯ জুলাই ১৯৬৯ পদত্যাগ পত্র গৃহীত হলো। আর সেদিনই অর্ডিনান্স জারী করে দেশের ১৪টি বড় বড় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব করা হলো। এ ব্যাপারে সোজাসুজি তিনি প্রধানমন্ত্রীরই ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন। হতবাক করে দিলেন বিরোধী পক্ষকে।

এ কথা ঠিক, শ্রীমোরারজী দেশাই প্রকৃত সিণ্ডিকেটপন্থী নন। সমর্থকও নন। সিণ্ডিকেটিস্ট বলে সচরাচর পরিচিত সর্বশ্রী নিজলিঙ্গাপ্পা, এস. কে. পাতিল, কামরাজ নাদার, অতুল্য ঘোষ, নীলম সঞ্জীব রেড্ডী প্রমুখ গোঁড়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি কেউ নন। তবে শ্রীযুত দেশাইয়ের উপরেই শ্রীমতী গান্ধী প্রথম আঘাত হানলেন কেন? প্রবীণ নেতা শ্রীদেশাইকে অনেকটা অপদস্থ করে তাঁর দপ্তর কেড়ে নিলেন কেন?

মোদ্দা কথায় আসা যাক। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের মধ্যে যে অংশ রক্ষণশীল তাঁরাই এতকাল কংগ্রেস পরিচালনা করে আসছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের তরুণ সমাজ—তরুণ তুর্কী (শ্রীচন্দ্রশেখর এ দলের নেতা) প্রগতিশীল কর্মনীতির জন্য শ্রীমতী গান্ধীকে ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী তাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তাব রাখলেন প্রগতিশীল কর্মপন্থা গ্রহণের। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা তা দিলেন বাতিল করে। জানিয়ে দিলেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা হলেও প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনভাবে কাজ করার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেস সভাপতির এ ফরমান মাথা পেতে নিলেন না। তিনি আপন সংকল্পে অটল

রইলেন। ব্যক্তিত্বের লড়াই আদর্শগত সংঘাতে রূপায়িত হলো। বিরোধের হলো মূল সূত্রপাত।

জুলাই ১৯৬৯-এ বাঙ্গালোরে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধী সুকৌশলে কংগ্রেসের 'ইকনমিক পলিসি'র উপর একটি প্রস্তাব রাখলেন। ব্যাঙ্ক-জাতীয়করণ প্রশ্নে কংগ্রেসের কি নীতি হবে জানতে চাইলেন। সমাজবাদের প্রবক্তা হিসেবে ব্যাঙ্ক-জাতীয়করণের একটি জনপ্রিয় 'ইস্যু'কে তিনি তুলে ধরলেন নিখুঁতভাবে বাঙ্গালোর অধিবেশনে। প্রধানমন্ত্রী জানতেন তিনি রক্ষণশীল কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের সমর্থন পাবেন না। তবে অন্যদিকে, প্রগতিশীল বামপন্থীদের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হবেন না। ব্যাঙ্ক-জাতীয়করণের পথের কাঁটা মোরারজীকে অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল বামপন্থী দলই তাঁকে স্বাগত জানান। ভারতে সমাজবাদ কায়েম করে তুলতে চলেছেন বলে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন তাঁরা। বামপন্থী কমিউনিস্টরা দীর্ঘকাল থেকে কংগ্রেস দলের মধ্যে প্রগতিশীলদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। কৃষ্ণ মেনন, কে. ডি. মালব্য, চন্দ্রশেখর, মোহন ধারিয়া, অরুণা আসফ আলি প্রমুখ প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের সঙ্গে ইন্দিরাজীকেও গোষ্ঠীভুক্ত করে নেন তাঁরা।

ইন্দিরা বনাম সিণ্ডিকেট বা কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের সংঘাত আবার চাড়া দিয়ে উঠলো। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে সিণ্ডিকেট গোষ্ঠীর অনেকেই পরাজিত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার, পশ্চিমবঙ্গের শ্রীঅতুল্য ঘোষ, বোম্বাইয়ের শ্রীএস. কে. পাতিল প্রমুখ বহু প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা। নির্বাচনে তাঁদের পরাজয়ে সিণ্ডিকেট কংগ্রেস অনেকটা অকেজো হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু লোকসভা উপনির্বাচনের পরে শ্রীকামরাজ নাদার, শ্রীএস. কে. পাতিল জয়লাভ করায় সিণ্ডিকেটের এ সংঘাত দেখা দেয় নতুন করে। শ্রীপাতিল তখন খোলাখুলিভাবে দাবি তুললেন, আদর্শবাদের ভিত্তিতে কংগ্রেসের ভাগ হওয়া উচিত। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাও শ্রীপাতিলের প্রস্তাবে সায় দিলেন।

কংগ্রেস সাংগঠনিক বিরোধের পরিবেশে বাঙ্গালোরে মিলিত হলো কংগ্রেসের দুই শিবির। আর ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দু শিবিরের ফাটল আরও প্রকট গভীর হয়ে উঠলো। ১২ জুলাই তারিখে বাঙ্গালোরে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর আপত্তি অগ্রাহ্য করে এবং স্রেফ ভোটের জোরে লোকসভার স্পীকার শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডীকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী রূপে গ্রহণ করলো। আর ১৩ জুলাই কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাও দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে শ্রীরেড্ডীর নাম ঘোষণা করেন। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের এ ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী হলেন রীতিমত বিস্মিত ; দুঃখিতও।

গান্ধী জন্ম-শতবার্ষিকীতে একজন হরিজন রাষ্ট্রপতি হোন, তিনি বুঝি তাই চেয়েছিলেন। এবং বোর্ডে শ্রীজগজীবন রামের নাম তিনি প্রস্তাব করেছিলেন। অনেকে তাঁকে সমর্থনও করেছিলেন। অথবা উপরাষ্ট্রপতি, বর্তমান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রীবরাহগিরি ভেঙ্কটগিরির পক্ষেও ঐক্যমত রয়েছে বলে তাঁর ছিল ধারণা। শ্রীগিরির স্বপক্ষে আগেকার নজীরও রয়েছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কিংবা স্বর্গত রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনও উপরাষ্ট্রপতি থেকে রাষ্ট্রপতির পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি পদে শ্রীগিরিই বা প্রার্থী হবেন না কেন?

কাজেই ১৩ জুলাই '৬৯ তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি (৭৪) নির্দলীয় প্রার্থীরূপে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন জানালেন, এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির আসন থেকে পদত্যাগের সংকল্প করলেন। এক বিবৃতিতে তিনি এ অভিযোগও তুললেন, লোকসভার স্পীকারকে মনোনয়ন দিয়ে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড 'দেশের প্রতিও সুবিচার করেননি, তাঁরা যে প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন তার প্রতিও ন্যায় বিচার করেননি'। তিনি পার্লামেণ্টারী বোর্ডের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনলেন।

বাঙ্গালোরে শ্রীমতী গান্ধীর সাংবাদিক সম্মেলন এবং শ্রীগিরির

বিবৃতি ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ইতিহাসে সৃষ্টি করলো নতুন নজীর। এর আগে কোন প্রধানমন্ত্রী নিজের দলের এমনিতর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতি দেননি। কোন রাষ্ট্রপতিও শাসক দল কংগ্রেসের মনোনয়ন না পাওয়া গেলে নির্বাচনে পদপ্রার্থী হননি, এবং রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেননি।

দুই শিবিরের বিবাদ এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আরও ঘনীভূত হয়ে উঠলো।

এবারকার নতুন রাষ্ট্রপতিকে ১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনে হয়ত গ্রহণ করতে হবে এক বৃহত্তর ভূমিকা। সুতরাং নতুন রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক চরিত্র ও যোগাযোগের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভরশীল, বিশেষ করে কংগ্রেসকে ক্ষমতার আসনে রাখতে হলে। এদিক থকে বিচার করতে গেলে শ্রীযুত রেড্ডী কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের রক্ষণশীল সিণ্ডিকেটপন্থীদের একজন ছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হবার আগে পর্যন্ত। সুতরাং তিনি যদি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন, সিণ্ডিকেটের মাতব্বরেরা যতটা নিরাপদ বোধ করবেন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী হয়তো ততটা করবেন না।

তাছাড়া ভারত সরকার ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব (বড় বড় চৌদ্দটি ভারতীয় ব্যাঙ্ক) করার যে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাও হয়তো আর কার্যকরী হয়ে উঠবে না। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী রাষ্ট্রপতি হলে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্বকরণ বিলে স্বাক্ষর দিতে হয়তো অস্বীকারই করবেন। প্রধানমন্ত্রীকে ফেলবেন বেকায়দায়। সিণ্ডিকেট গোষ্ঠী শ্রীমতী গান্ধীর উপর হয়তো একহাত নেবার চেষ্টা করবেন। আগেকার বিবাদের জের টেনে হয়তো প্রতিশোধ নেবেন। এমন কি তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবারও চেষ্টা চলবে।

তবুও কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের মনোনয়ন মেনে নিলেন প্রকাশ্যে।

এবং ২২ জুলাই ১৯৬৯ শ্রীরেড্ডীর মনোনয়ন পত্র তিনি নিজ হাতেই রিটার্নিং অফিসারের নিকট পেশ করে এলেন। কূট চাল চাললেন দাবার। এবার আর দাবা-বোড়ে নয়। খোদ মন্ত্রীকেই মেরে বসলেন। কিস্তি মাৎ! সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে নেওয়া হলো এক হাত। বিচক্ষণতার সঙ্গে সিণ্ডিকেট গোষ্ঠীকে নিরস্ত্র করলেন এই বলে যে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী হিসাবে শ্রীরেড্ডীকে তিনি সমর্থন করবেন রাষ্ট্রপতির পদে। অথচ ৬ আগস্ট ('৬৯) যখন পার্লামেণ্টারী বোর্ডের বৈঠক বসলো তখন কিন্তু তিনি শ্রীরেড্ডীর সমর্থনে ভোট দিতে কংগ্রেস সদস্যদের নিকট আবেদন করতে অক্ষমতা জানালেন। আইনগত অসুবিধার কথা জানালেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপতি পদে একজন প্রার্থীকে সমর্থন করায় গতবারের নির্বাচনে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল বলে তিনি ওজর দিলেন। শুধু তাই নয়, শ্রীরেড্ডীর পক্ষে কোনো 'হুইপ' দিতেও প্রধানমন্ত্রী রাজী হলেন না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস আইনসভা সদস্যদের নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী স্বাধীন ভাবে ভোট দানের নির্দেশ দেওয়া হলো। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকে লেখা এক পত্রে তিনি এ অভিযোগ করলেন যে কংগ্রেস সভাপতি নিজে শ্রীরেড্ডীর সমর্থনে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। কাজেই তিনিই নিয়ম ভঙ্গ করেছেন কংগ্রেসের।

২০ আগস্ট ১৮৬৯ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল লোকসভার বাষট্টি নম্বর কক্ষ থেকে ঘোষিত হলো। দেখা গেল নির্দলীয় প্রার্থী শ্রীবরাহগিরি ভেঙ্কটগিরিই বামপন্থীদল ও শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থকদের ভোটে শ্রীরেড্ডীকে পরাজিত করে ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীগিরিকে সমর্থন করেন দুটি কমিউনিস্ট পার্টি, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি, প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি, তামিলনাড়ু ডি. এম. কে. (দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম), পাঞ্জাবের আকালী দল প্রভৃতি। ভারতের ১৭টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, ওড়িশা, বিহার, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি ১১টি রাজ্যে

শ্রীগিরি বেশি ভোট পান। গুজরাট, মহীশূর, মহারাষ্ট্রে শ্রীযুত রেড্ডী বেশি সংখ্যক ভোট পান। শ্রীগিরি পান মোট ৪,২০,০৭৭টি ভোট আর শ্রীরেড্ডী পান ৪,০৫,৪২৭টি ভোট। সংসদের ৪৩২ জন সদস্যের মধ্যে ২৬৮ জন শ্রীগিরিকে সমর্থন করেন। তা থেকে এ প্রমাণিত হলো শ্রীমতী গান্ধীর স্বপক্ষে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। এবং তাঁকে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টি থেকে ভোটের জোরে সরানো সম্ভব নয়। অনাস্থা প্রস্তাব চলবে না সহজে।

নির্বাচনে শ্রীগিরির জয় শ্রীমতী গান্ধীরই জয় হলো। তাঁর নীতিরও জয় সূচিত হলো। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সিদ্ধান্তের ফলে দেশের সাধারণ মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার হলো। তারা এ জয়কে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তির জয় বলে অভিহিত করলো। কংগ্রেস ভূমিকার নতুন সম্ভাবনা দিল দেখা। কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন। দেশের মানুষ শ্রীগিরির নির্বাচনকে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে এক করে দেখলো। কমিউনিস্ট পার্টি ও অপরাপর বামপন্থীদল মিছিল করে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বাস-ভবনের সামনে সমবেত হয়ে জানালো অভিনন্দন। জনতার অভিনন্দন শ্রীমতী গান্ধী গ্রহণ করলেন। কৃতজ্ঞতা জানালেন। জোরালো ভাষার কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের আবেদন করলেন।

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার নেতৃত্বাধীন সিণ্ডিকেট শিবিরও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলেন না। পরাজয়কে সহজে গ্রহণ করলেন না। শ্রীমতী গান্ধী মন্ত্রীসভার প্রবীণ সদস্য শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহমেদ-এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা শাসালেন। কারণ শ্রীমতী গান্ধীর শিবিরের এই দুই সমর্থক কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেন যে, তিনি স্বতন্ত্র নেতা শ্রীএন. জি রঙ্গর বাড়ীতে গিয়ে শ্রীরঙ্গ, স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রীমিনু মাসানি ও শ্রীদাণ্ডেকরের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেছেন। জনসঙ্ঘ নেতা শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী ও শ্রীবলরাজ মাধোকের

সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিপন্ন হয়েছে। বলে শ্রীরাম ও শ্রীআহমেদ অভিযোগ জানান। ইন্দিরা-বিরোধী শিবির থেকেও অনুরূপ অভিযোগ শোনা গেল। শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ বোম্বাইয়ের এক প্রখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে শ্রীমতী গান্ধী কমুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের গদি রক্ষা করছেন বলে অভিযোগ করেন।

এর কিছুকাল পরে শ্রীকামরাজের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর এক অভিযোগ উঠলো। তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীসুব্রাহ্মনিয়াম অভিযোগ করেন যে, শ্রীকামরাজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবনকে নাকি এ আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি যদি সিণ্ডিকেটকে সমর্থন করেন তবে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসানো হবে। শ্রীসুব্রাহ্মনিয়াম এর প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। এ নিয়ে কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির বৈঠকে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থকগণ তলবী সভার জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে তৎপর হলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, শ্রীচ্যবন, শ্রীকামরাজ প্রভৃতি যাঁরা এতকাল শ্রীমোরারজী প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁরাই আবার ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বিষয়ে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা, শ্রীপাতিল, শ্রীদেশাইয়ের সঙ্গ ত্যাগ করে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে যান।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা শ্রীসুব্রাহ্মনিয়াম, শ্রীফকরুদ্দিনকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বিতাড়িত করলেন। এর প্রতিবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একুশ জন সদস্যের মধ্যে এগারো জন সদস্যই নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেস কমিটি বর্জন করে বেরিয়ে আসেন। আর শ্রীমতী গান্ধীর বাসভবনে মিলিত হন স্বতন্ত্রভাবে।

১২ নভেম্বর '৬৯ তারিখে দিল্লীতে জাতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক বসে তাতে পার্টির শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা

হলো প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। শ্রীমতী গান্ধীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো ; এবং কংগ্রেস সংসদীয় দলকে নতুন নেতা নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হলো। বলা বাহুল্য, এ প্রস্তাব গ্রহণের পিছনে ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার নেতৃত্বাধীন শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীএস. কে. পাতিল, শ্রীকামরাজ নাদার, শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রমুখ রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ।

সিণ্ডিকেট গোষ্ঠীর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে বহিষ্কার করার এ সিদ্ধান্তকে বেআইনী বলে ঘোষণা করলেন শ্রীজগজীবন রাম, শ্রীফকরুদ্দিন আলী আহমেদ্ প্রমুখ ওয়ার্কি কমিটির দশজন সদস্য। এবং একই দিনে তাঁরা একত্রিত হয়ে এক বিবৃতি দিলেন যে প্রধানমন্ত্রীকে বহিষ্কারের নির্দেশ সিণ্ডিকেটপন্থীদের পক্ষে বেআইনী। তাঁরা কেউ এ নির্দেশ মানেন না। শ্রীমতী গান্ধীকেই তাঁরা সকলে সমর্থন করেন, এবং করবেনও।

কাজেই কংগ্রেস সংসদীয় দলের সভা বসলো। আর এ সভায় দেখা গেল মোট ২৮২ জন কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে প্রায় ২২০ জন প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করেন। এবং নতুন করে আস্থা জ্ঞাপন করলেন তাঁর ওপর।

দলাদলিতে নিজলিঙ্গাপ্পার দল অনেকটা কোনঠাসা হয়ে পড়লো। তাঁদের সমর্থক সংখ্যা এসে দাঁড়াল মাত্র ষাট জনে। ওঁরা তখন রেলমন্ত্রী ডঃ রামসুভগ সিংকে তাঁদের দলনেতা নির্বাচন করলেন। আর সিদ্ধান্ত নিলেন বিরোধীদল হিসেবে আলাদাভাবে কাজ করবার। শ্রীযুত মোরারজী দেশাই সংগঠনপন্থী সংসদীয় দলের সভাপতি হলেন।

ফলে শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেসী সরকার সংখ্যালঘু সরকারে পরিণত হলো। লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আরও অন্ততঃ ৪০ জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়ে পড়ল। আর তা পাওয়া গেল তামিলনাডু ডি. এম. কে., সি. পি. আই., সি. পি. এম. ও অপরাপর নির্দলীয় সদস্যদের কাছ থেকে।

২২ নভেম্বর '৬৯ নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকগণ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকলেন। এ বৈঠকে তাঁরা দাবি করলেন, ৭০৫ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ৪৩২ জন সদস্য এ অধিবেশনে যোগদান করেছেন। এ বৈঠকে শ্রীসুব্রাহ্মনিয়ামকে অন্তবর্তীকালীন নতুন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সিণ্ডিকেট-পন্থীরা এ বৈঠককে অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন।

এদিকে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার সংগঠনপন্থী কংগ্রেসের অধিবেশন ও প্রতিনিধি সম্মেলন ডাকা হয় গুজরাটের আহমেদাবাদে ২০-২১ ডিসেম্বর, '৬৯। এই অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকে সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন শাসক-কংগ্রেসের প্রাথমিক সম্মেলন বসে ২৭-২৯ ডিসেম্বর '৬৯। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ৪৯০ জন নির্বাচিত সদস্য এ অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন। এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ইন্দিরাপন্থী শাসক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৮৮৫ সালে যে কংগ্রেসের পত্তন, ৮৪ বছর পর সে কংগ্রেস ভেঙে দু-খান হলো; এতদিনকার কংগ্রেস স্বাধীনতার বাইশ বছর পর। সাতচল্লিশের ১৪-১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে যে কংগ্রেসদল বিদায়ী ব্রিটিশ শাসক ও শোষকের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করেছিলো, আজ তার সামনে দেখা দিল বিভেদ ও দলীয় সংঘাত। কংগ্রেসের সৃষ্টি সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক-দল হিসেবে নয়, কংগ্রেস বরাবরই ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিলিত 'প্ল্যাটফর্ম'। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে বহু বিশিষ্ট নেতা—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য কৃপালনী থেকে শুরু করে হাল আমলের অনেকেই বিরোধিতা করে দল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। স্বতন্ত্র দল গড়েছেন নিজেদের। কোন কোন

রাজ্যে নির্বাচনে জয়লাভ করে মন্ত্রিসভাও গঠন করেছেন বিরোধীদের অনেকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব ছিল এতকাল অবিভক্ত। তার প্রাচীরে চিড় ধরেনি কোনদিন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে।

এবার কংগ্রেসে ভাঙ্গন দেখা দিল। সংশয় দানা বাঁধলো। কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে সংসদীয় দলের নেতা প্রধান, না সংগঠক সভাপতির ক্ষমতা বেশী? প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, না কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা? কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ডের রক্ষণশীল সিণ্ডিকেট গোষ্ঠী, না প্রগতিশীল শাসকগোষ্ঠী? এ ক্ষমতার লড়াইকে আদর্শগত লড়াইয়ে রূপায়িত করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সুষ্ঠু নিপুণতার সঙ্গে। শ্রীযুত মোরারজী দেশাইয়ের হাত থেকে অর্থমন্ত্রক কেড়ে নেওয়া, বা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রক্ষিপ্তভাবে এসে পড়েছিলো এ ক্ষমতার লড়াইয়ে। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর নাম প্রস্তাব করণের মধ্যেও তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এখানে শ্রীমতী গান্ধীর কৌশলী স্টেটস্ম্যানশিপের, তাঁর প্রতিপক্ষকে আঘাত হানবার রণ-কৌশলের পরিচয় মেলে। শুরু হয় বিজয়িনী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জয়যাত্রার।

এখানে উল্লেখযোগ্য, যেদিন শ্রীমতী গান্ধী উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাইয়ের হাত থেকে অর্থ দপ্তরের ভার নেন এবং ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণের পথে অগ্রসর হন সেদিন ছিল রথযাত্রার দিন। সে দিনটি আরও একটি কারণে স্মরণীয়, কেননা ওই তারিখেই এ্যাপোলো—১১-র তিন মার্কিন নভঃযাত্রী নীল অ্যালডেন আর্মস্ট্রং, এডুইন ই: অলড্রিন জুনিয়র ও মাইকেল কলিনস্ চাঁদের পথে মহাকাশ পাড়ি দিয়েছিলেন। সূচনা করেছিলেন মানব ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের। শ্রীমতী গান্ধীও কি তাঁর অর্থনৈতিক কর্মসূচী মারফত নতুন জয়যাত্রা শুরু করলেন সেদিন?

৮

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, মহাত্মাজী, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন ২১ বৎসর পর।

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল ও নাটাল শহরে ভারতীয় বাসিন্দাদের প্রতি স্থানীয় ইংরেজ শাসকবর্গের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। গান্ধীজীর এ অসহযোগ আন্দোলনের নাম 'সত্যাগ্রহ'। গান্ধীজীর প্রবর্তিত এ সত্যাগ্রহ আন্দোলন দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারেল স্মাটস্ সরকারের টনক দেয় নড়িয়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রেখে বৃটিশ শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। আহত সৈনিকদের সেবার কাজে এ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করেছিলেন। আশা করেছিলেন বৃটিশ সরকার তাঁর এ সেবা কার্যের মূল্য দেবেন; ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেবেন। দাবি তাঁর পূরণ করবেন। কিন্তু গান্ধীজী এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ হন তাতে আশাহত। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার তার জবাব দিল রাউল্যাট আইনের নাগপাশ জারী করে দেশময়।

গান্ধীজী শুরু করলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন। বেআইনী আইনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন। হাজারে হাজারে দেশবাসী কারাবরণ করতে শুরু করলেন। মতিলাল নেহরু তখন জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতা। স্বরাজে বিশ্বাসী। স্বরাজ্য পার্টির কর্ণধার। তিনি গান্ধীজীর এ গণ-আন্দোলনে তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না। ভাবতেন, কাতারে কাতারে লোক কারাবরণ করলে দেশের কী বা তেমন লাভ

হবে! এ নিয়ে পুত্র জওহরলালের সঙ্গে তাঁর তর্কবিতর্কও হলো বেশ কিছুটা।

মতিলাল গান্ধীজীকে আনন্দভবনে নিমন্ত্রণ জানান। গান্ধীজী স্বরাজ্যদলের নেতার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

মতিলাল কিংবা পুত্র জওহরলালকে যদিও গান্ধীজী তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপন্থায় তখনও বিশ্বাসী করে তুলতে পারেননি, তবুও তিনি তাঁর জীবনাদর্শে তাঁদের প্রভাবান্বিত করেননি এমন নয়।

গান্ধীজী এলাহাবাদ থেকে দিল্লীতে ফিরে এলেন। আর ৩১ মার্চ (১৯১৯) শুরু করলেন দেশব্যাপী তাঁর অহিংস হরতাল। রাউল্যাট আইনের বিরুদ্ধে। দলে দলে লোক কারাবরণ করতে লাগল।

বৃটিশ সরকারও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিলেন না। আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করলেন। অনুষ্ঠিত হলো জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। আর এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস নিলো নতুন মোড়। প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের দেওয়া তাঁর 'নাইট্‌হুড' খেতাব করলেন বর্জন। এই বর্বর গুলি-বর্ষণের ব্যাপারে যে তদন্ত কমিটি বসলো তাতে মতিলাল ও জওহরলাল—পিতা পুত্র দুজনে সদস্যভুক্ত হলেন। অনুরক্ত হয়ে পড়েন গান্ধীনীতির।

নেহরু পরিবারেও এর ঢেউ এসে লাগলো। সাজ-পোশাক, বেশভূষায় শুধু বিলাতী বর্জন নয়, এমন কি থালা-বাসনেও এ বিপ্লব দিলো দেখা। বিলাতী ডিনার টেবিলে কাঁটা চামচ হলো বর্জ্জিত। তাদের স্থান নিলো থালা, বাটি। আর তাও যতখানি সম্ভব সহজ ও অনাড়ম্বর।

আনন্দভবনের সে পুরাতন পরিবেশ আর নেই। নেই খানাপিনা, হাসি-উল্লাস। তার জায়গায় আনাগোনা করতে লাগলেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। খিলাফত আন্দোলনের নেতা আলী ভ্রাতৃদ্বয় মৌলানা মহম্মদ আলী ও শওকত আলী, গান্ধীজী, দেশবন্ধু, মৌলানা আবুল

কালাম আজাদ, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ অনেকেই এসে মিলিত হতেন। কংগ্রেস রাজনীতির শলাপরামর্শ চলতো।

১৯২০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হলো। বিলেতী দ্রব্য বর্জন, রাজ-খেতাব প্রত্যাখ্যান, সরকারী স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত বয়কট এর প্রধান কর্মসূচীরূপে গৃহীত হলো। অন্যায় আইন অমান্য করে শান্তিপূর্ণ কারাবরণের নীতি স্বীকৃত হলো। গান্ধীজীর নীতি কংগ্রেসের নীতিতে রূপান্তরিত হলো। আর কংগ্রেসের আদর্শ বরণ করে নিয়ে মতিলাল তাঁর বিপুল বিত্তের আইন ব্যবসায় বর্জন করলেন। আপন বাসভবন আনন্দভবনকে জাতীয় কংগ্রেসের সেবায় করলেন দান। বিদেশী স্যুট, টাই ছেড়ে খাদি করলেন গ্রহণ। নেহরু পরিবারের সবাইও তাই পরতে শুরু করলেন।

ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী তখন ছোটই। কীই বা বয়স—চার কি পাঁচ (৬ ডিসেম্বর ১৯২১)। ঠাকুর্দার কোলে বসেই তার রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। শৈশবে ঠাকুর্দাই তাকে বিশেষ করে প্রভাবিত করেন।

বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা এমন কি পিসীরা পর্যন্ত কেউ কাছে নেই। পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে জেলে। তার জন্য কোন গভর্নেসও রাখা হয়নি। ইন্দিরা আপন মনে গড়ে তোলে নিজেকে। অতবড় বাড়ীতে খেলা করবার সাথীও কেউ নেই। কংগ্রেসী বলে পাড়াপড়শী আত্মীয়স্বজন সবাই তাঁদের ছেলে-মেয়েদের নেহরু পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিতে পছন্দ করতেন না।

সাবরমতীতে গান্ধীজীর আশ্রমে কয়েক মাস কাটিয়ে নেহরু পরিবারের মেয়েরা আবার ফিরে এলেন। মতিলাল ও জওহরলাল তখনও কারাগারে বন্দী। কমলা ও পিসী কৃষ্ণার মতো বালিকা ইন্দিরাও খাদি কুর্তা, পাজামা আর গান্ধী টুপি পরবার জন্য বায়না

ধরতো। ইচ্ছে জানাতো কংগ্রেস ভলান্টিয়ার হিসেবে তারও নাম লিখে নিতে। এমন গোঁ ধরে বসতো কিছুতেই আর তাকে শান্ত করা যেত না। ঠাকুরমা আর তাঁর দিদি বিবি আম্মা বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাগ মানাতে পারতেন না। পরিশেষে মিষ্টির প্রলোভনেও নয়। চারদিক সব দেখে শুনে আর বাড়ীর রাজনৈতিক পরিবেশে কচি ছোট্ট মনটি তার কঠিন হয়ে উঠেছিলো বড়দের মতো।

স্বাস্থ্যটা তার ভালো ছিল না। রোগা লিকলিকে দেখতে অনেকটা। হাড্ডিসার চেহারা। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাবা যখন বাড়ী ফিরতেন, ছোট্ট মেয়ে ইন্দিরা বাবার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠতো। তর্জনী উঁচু করে অনুযোগ করতো:

'তুমি ভারী দুষ্টু হয়েছ! কোথায় গিয়েছিলে? আমায় সঙ্গে নাওনি কেন?'

পিতা জওহরলাল কি আর জবাব দেন! মেয়েকে দুহাতে কোলে তুলে নেন। স্নেহাতুর পিতার চোখদুটি সিক্ত হয়ে আসে। ধরা গলায় বলেন:

'আর কক্ষনো যাব না মা, তোমায় ছেড়ে কক্ষনো যাব না।'

কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে আবার নিয়ে যায় জেলে। বন্দী করে রাখে কারাগারে। বন্দী করার দিনগুলিকে কিছুটা লঘু, হাল্কা করার উদ্দেশ্যেই বুঝি স্নেহশীল পিতা তাঁর কন্যাকে চিঠি লিখতেন পাতার পর পাতা। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। অজস্র।

জওহরলাল কন্যা ইন্দিরাকে প্রথম চিঠি লেখেন ১৯২২ সালে লক্ষ্ণৌ জেল থেকে। ইন্দিরার বয়স তখন পাঁচ বছর। কারা-প্রাচীরের আড়াল থেকে জওহরলাল লিখে পাঠালেন:

'তিনমাস হলো তোমাকে আমি দেখিনি, ইন্দু। এ ক'দিনে তুমি নিশ্চয় খুব রোগা হয়ে গেছ। মনমরা। আমার তো মনে হয় এখন থেকে তোমার পড়াশুনার ব্যবস্থা করা উচিত। আমার বিশ্বাস আমি সহজেই তা করতে পারতাম। কিন্তু আমি যে জেলে। ৪নং ব্যারাকে বন্দী।'

আর এক চিঠিতে লিখলেন :

'পাপুর আদর নিও। তুমি শিগগীর বড়ো হয়ে ওঠো। চিঠি লেখা শেখ। জেলে এসে আমায় দেখে যেও। তোমায় দেখতে আমায় খুব ইচ্ছে করে। দাতু (ঠাকুরদা) তোমাকে যে নতুন স্থতোকাটার যন্ত্রটা কিনে দিয়েছেন, সেটা চালাতে শিখেছ তো? তোমার কাটা কিছু স্থতো আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, কেমন? মার সঙ্গে প্রতিদিন উপাসনা করো তো?'

স্নেহাতুর পিতার এমনি আর একখানি চিঠি :

'আদরের মেয়ে ইন্দিরা,

'পাপুর ভালবাসা নিও। কোলকাতা তোমার কেমন লাগছে? বোম্বাইয়ের চাইতে ভাল কি? কোলকাতার চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলে? কি কি জীবজন্তু দেখলে? প্রকাণ্ড একটা গাছ ওখানে দেখনি? এলাহাবাদে ফেরার আগে তুমি শক্ত-সমর্থ হয়ে উঠো কিন্তু।'

ছোটবেলায় ইন্দিরা লেখাপড়ার পাঠ নিয়মিত লাভ করেনি। বয়স যখন ছয় তখন ঠাকুরদা মতিলাল তাকে কমলা নেহরুর সঙ্গে পরামর্শ করে এলাহাবাদের সেণ্ট সিসিলিয়া হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন। মিস ক্যামারন ও তাঁর বোনেরা এ স্কুল পরিচালনা করতেন। ছেলেরাও একসঙ্গে এ স্কুলে পড়াশুনা করতো। পিসী কৃষ্ণা হাতি সিংও কিছুদিন এ স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন যখন তাঁর গভর্নেসের বিয়ে হয়ে যায়।

ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাভ্যাস করুক, তা যতখানি নয়, ওখানে কি শিক্ষা লাভ করছে এ নিয়ে জওহরলালের মনে সংশয়ের অভাব ছিল না। কারাগারে বসে তাই তিনি শিশুকন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। পত্রগুচ্ছের মারফত তিনি মেয়েকে প্রথম পাঠ দিলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের লুপ্তপ্রায় জন্তু জানোয়ার থেকে শুরু করে আজকের চলমান তুনিয়ার। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ। বিশ্বরাজনীতির প্রথম পাঠ।

জওহরলালের এ চিঠিগুলি 'লেটারস্ ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার' আর 'গ্লিম্প্‌সেস্ অব ওয়ার্ল্ড হিষ্ট্রী' ('বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ')-তে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ ছাড়া জওহরলাল ইন্দিরাকে দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে বহু বইও কিনে পাঠাতেন। তাতে রয়েছে দেশ-বিদেশের বহু রূপকথা, শেকস্‌পীয়র, ডিকেন্স, জর্জ বার্নাড শ' ও নানা ক্লাসিক গ্রন্থের শিশু-সংস্করণ। দিল্লীর তিনমূর্তি ভবনের পাঠাগারে ভাবী প্রধানমন্ত্রীর নাম লেখা এ গ্রন্থগুলি রক্ষিত রয়েছে আজও। বহন করছে তাঁর গভীর পাঠাভ্যাসের স্বাক্ষর।

কমলা নেহরুর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছিল না। যে কাল-ব্যাধি তাঁর প্রাণোচ্ছল হৃৎপিণ্ডটিকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, এদেশের জলবায়ুতে তা সারানো গেল না। কমলা ও জওহরলাল তাই ইউরোপ যাত্রা করলেন। ন' বছরের মেয়ে ইন্দিরাও বাবা মার সঙ্গে চললো। এতদিন কোনো স্কুল কি কনভেণ্টে শিক্ষা পায়নি নিয়মিত। তাই জওহরলাল ওকে সুইজারল্যাণ্ডের Ecole Nouvelle স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। বেকস্-এর তুষারময় পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইন্দিরা বাবায় মতো দৌড়-ঝাঁপ করতে ভালবাসতো। বেশ কিছুদিন পেঁজা তুলোর মতো বরফের উপর আছাড় খেয়ে স্কী আর স্কেটিং রপ্ত করে নিল সে।

জেনেভা শহরেই ইন্দিরা বাবার সঙ্গে মনীষী রোমঁ্যা রোলঁ্যাকে দেখতে যান। বাবার সঙ্গে ভারতদরদী এই মহামনীষীর দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা বুঝি মেয়ে শুনলো মন দিয়ে। জেনেভা শহরে কবি ও নাট্যকার আর্নস্ট টলার-এর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। আরও তার সাক্ষাৎ ঘটে বহু প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্গে। তাদের মধ্যে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, মাদাম কামা, হরদয়াল, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মৌলবী ওবেইতুল্লা ও মৌলবী বরকতউল্লার নাম করা যায়। ওঁরা সবাই আসতেন জওহরলালের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। আমেরিকার সুলেখক ধনগোপাল মুখার্জীর সঙ্গেও ইন্দিরার

পরিচয় হয় জেনেভাতে। ধনগোপালের ছোটছেলের লেখা তার খুবই ভালো লাগতো। জওহরলালের সঙ্গে ধনগোপালের বন্ধুত্ব বেশ গড়ে উঠেছিল। ইন্দিরা তখন বালিকামাত্র। তবু কিন্তু এসব মনীষী, লেখক, বিপ্লবীদের সঙ্গে বাবার আলাপ-আলোচনার সময় তার উপস্থিতি ইন্দিরার ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকখানি পাথেয় হয়ে রইল। মহামহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হতে ইন্দিরা কখনো ভয় পায়নি। ভবিষ্যতেও নয়। তার শিক্ষা ও চরিত্র গঠনেও এই মহাপুরুষদের সান্নিধ্য প্রভাবান্বিত করেছিল অনেকখানি।

ইন্দিরাকে তার স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে বাবা, মা ও পিসী কমলা হাতিসিং মস্কো পরিভ্রমণে যান। ঠাকুরদা মতিলালও ইউরোপে এসে পৌঁছেছিলেন। তিনিও সঙ্গে যান। রুশ বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উৎসবে যোগদান করতে গেলেন সবাই। মতিলালের বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়া ভালো না লাগলেও পুত্র জওহরলালকে কিন্তু বিস্মিত, মুগ্ধ করে। জওহরলাল তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখে গেছেন :

'রুশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও মার্কসীয় মতবাদ ও দর্শন আমার মনের অনেক অন্ধকার কোণ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। আমার দৃষ্টিতে ইতিহাসের এক নূতন রূপ উদ্ঘাটিত হইল। মার্কসীয় বিশ্লেষণ প্রণালী ইহার উপর এক নূতন আলোক সম্পাত করিল ; অজ্ঞাতসারে হইলেও ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি এক শৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়াই প্রকটিত হইতেছে। অতীত ও বর্তমানের দুঃখ ও অপচয় যতই ভয়াবহ হউক না কেন, বহু বিপত্তির বাধা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ আশায় সমুজ্জ্বল। অযৌক্তিক মতবাদ হইতে মুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই আমি মার্কসীয় মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। অন্যান্য স্থানে ও রুশিয়ার সরকারী কম্যুনিজম-এর মধ্যে অনেক যুক্তিনিরপেক্ষ মতবাদ আছে সত্য এবং প্রায়ই অধিবাসীদিগের প্রতি পীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহা গভীর আক্ষেপের বিষয় হইলেও, ইহা বুঝা কঠিন নহে। সোভিয়েট দেশগুলিতে যখন

অতি দ্রুত গুরুতর পরিবর্তন চলিতেছে, তখন কোন বিরুদ্ধতাকে প্রবল হইতে দিলে ব্যর্থতা অতি শোচনীয় হইতে পারিত।'

তিনি আরও লেখেন :

'এই বিশ্বাস আমার মধ্যে যতই বর্ধিত হইতে লাগিল, আমি ততই নূতন উত্তেজনায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলাম। নিরুপদ্রব প্রতিরোধের অসাফল্যজনিত অবসাদ বহুলাংশে উপশম হইল। জগৎ কি ঈপ্সিত পরিণতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে না? সম্মুখে যুদ্ধ ও খণ্ড প্রলয়ের আশঙ্কা, তথাপি আমরা অগ্রসর হইতেছি। কেহ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া নাই। আমাদের জাতীয় সংঘর্ষ এক সুদীর্ঘ যাত্রাপথের ক্ষণিক বিশ্রামস্থল; দমননীতি ও দুঃখ-ভোগের পরিণাম ভালই, ইহা আমাদের জনসাধারণকে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত করিবে। যে সকল নূতন ভাব জগতকে আলোড়িত করিতেছে, তাহারাও তাহা ভাবিতে বাধ্য হইবে। আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তিরা সরিয়া গেলে আমরা অধিকতর শক্তিশালী হইব, সময় আমাদের অনুকূল।'

['আত্মচরিত' : জওহরলাল। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক অনূদিত। প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৪১৮]

বার্লিন ও প্যারিস নেহরু পরিবারের সবাই দেখে এলেন। তারপর মার্সেল্‌জ হয়ে ইন্দিরা বাবা মার সঙ্গে স্বদেশ অভিমুখে রওনা হলো জাহাজে করে।

২৭ ডিসেম্বর সবাই কলম্বোতে এসে পৌঁছলেন। কলম্বো থেকে সোজা মাদ্রাজ। মাদ্রাজে তখন জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে ডাঃ আনসারীর সভাপতিত্বে। ইন্দিরা বাবা-মার সঙ্গে গেল অধিবেশনে। কংগ্রেসে তখন নতুন ভাবাদর্শের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। কংগ্রেসের মধ্যে সমাজবাদী যুব বুদ্ধিজীবীরা মুখর হয়ে উঠেছে জওহরলালের নেতৃত্বে। ২৮ ফেব্রুয়ারী বৃটিশ সরকার দিল্লীতে সাইমন কমিশন পাঠালেন ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য। কংগ্রেস সাইমন-কমিশনকে বয়কট করলো। ডিসেম্বরে কলকাতায়

কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। সভাপতি মতিলাল নেহরু। এ অধিবেশনে নবীন ও প্রবীণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল হলেন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস্-এর স্বপক্ষে। আর পুত্র জওহরলাল পূর্ণ স্বাধীনতার। পরবর্তী লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯) জওহরলাল কংগ্রেসের কর্ণধার নির্বাচিত হলেন। মতিলাল জওহরলালের হাতে কংগ্রেসের কার্যভার তুলে দিয়ে এই বলে পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন :

'ব্যক্তিগত জীবনে তুমি যেমন আমার উত্তরাধিকারী তেমনি রাজনৈতিক জীবনেও হও যোগ্য উত্তরসাধক।' ১৯৩০ সালের নববর্ষের দিনে রাভির তীরে জওহরলাল ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী পাঠ করলেন কংগ্রেস সমাবেশে। বালিকা ইন্দিরা কংগ্রেস-ভলান্টিয়ারের পোশাক পরে বাবার কাছে বসেছিল। বাবা যখন সারারাত ধরে স্বাধীনতার এই সংকল্পবাণীর খসড়া তৈরি করছিলেন ইন্দিরা তখন তাঁর পাশে বসে বসে দেখছিল। খসড়াটি শেষ হয়ে গেলে বাবা তাকে একবার পড়ে শোনাতে বলেছিলেন। ইন্দিরা ধীর, অবিচলিত কণ্ঠে কংগ্রেসের স্বাধীনতার সে ঘোষণাবাণী পড়ে শুনিয়েছিল বাবাকে। বাবা প্রতিটি কথা মুগ্ধ, অপলকে শুনে গেলেন। 'পূর্ণ স্বরাজে'র মূল বয়ান :

'আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগলাভের জন্য অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের ন্যায় ভারতবাসীদেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় শ্রমার্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে যদি কোন গভর্ণমেণ্ট কোন জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে নির্যাতন করে, তবে সেই গভর্ণমেণ্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করিবার অধিকারও সেই জাতির আছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াই বিরত হয় নাই, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপরই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাজনীতি,

সভ্যতা ও অধ্যাত্ম সমুন্নতির সর্বনাশ করিয়াছে, সুতরাং ভারতের পক্ষে বৃটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।'

[স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প বাক্য। 'আত্মচরিত' : জওহরলাল নেহরু। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 'অনূদিত, ৭০১ পৃঃ।]

জাতীয় কংগ্রেস জওহরলালের এ সংকল্পবাক্য গ্রহণ করেন। এবং প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প-বাক্য হিসাবে পঠিত হতে থাকে।

ছাব্বিশে জানুয়ারী, পবিত্র স্বাধীনতা দিবসে পূর্ণ স্বরাজের এ সংকল্পবাণী ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো আসমুদ্র হিমাচল। বন্দে মাতরম্! গান্ধীজী, মার্চ ১৯৩০, তাঁর স্মরণীয় ডাণ্ডি অভিযান শুরু করলেন। লবণ সত্যাগ্রহ। অভিযানে এগিয়ে চললেন গান্ধীজী। পেছনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। মুখে তাঁর গুরুদেবের গান :

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে॥
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে॥
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে॥'

গান্ধীজী ডাক দিলেন ভারতের মেয়েদেরও পুরুষের পাশে এসে

দাঁড়াতে। সংগ্রামে এগিয়ে আসতে। গান্ধীজীর ডাক শুনে মেয়েরাও দলে দলে এগিয়ে এলেন। পিকেটিং-এ যোগ দিলেন।

আইন-অমান্য আন্দোলনের দায়ে গান্ধীজী নিজে, মতিলাল ও জওহরলাল থেকে শুরু করে হাজার হাজার লোক কারাবরণ করলেন। বৃটিশ সরকার সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি-সোঁটা, গুলি-গোলা চালালে নির্বিচারে।

ঠাকুরমা স্বরূপরাণী একদিন এলাহাবাদে পিকেটিং পরিচালনা করতে গিয়ে মাথায় লাঠির আঘাত খেলেন। মা কমলাও তাঁর অসুস্থ শরীরের কথা ভুলে গিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, নিষ্ক্রিয়-হয়ে থাকতে পারলেন না। কেননা, তিনি হলেন এলাহাবাদ ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। ইন্দিরার বয়স তখন মাত্র বারো। ইন্দিরাও কংগ্রেসের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল। কিন্তু সে তখনও বালিকা। নাবালিকাদের কংগ্রেসের কাজকর্মে প্রবেশাধিকার নেই।

কিন্তু ইন্দিরা ছাড়বার পাত্রী নয়। বাপকা বেটী! পরদিন সবাই অবাক হয়ে দেখলো আনন্দ ভবনের প্রশস্ত চাতাল ভরে গেছে আশপাশের যতো ছেলেমেয়েতে। রাজ্যের যতো বালক-বালিকায় পিলপিল করছে। আর ইন্দিরা খাদি কুর্তা, পাজামা আর গান্ধী-টুপি পরে সবার সামনে এগিয়ে এসে বক্তৃতা শুরু করে দিলে। বললে :

'আমরা ছোট। তাই বলে দেশের কাজে আমরাও বা এগিয়ে আসবো না কেন? তাই আজ আমরা এখানে সবাই মিলিত হয়েছি। জানি, পুলিশ যদি টের পায় আমাদের সহজে রেহাই দেবে না। বড়দের মতো জেলে নিয়ে যাবে না ঠিক, তবে মারধোর করতে ছাড়বে না। চাবুক পেটা করবে সবাইকে। তাই বলে কি আমরা দেশের কাজ করবো না?'

বালিকা ইন্দিরা সমবেত বালক-বালিকাদের শুধালে। সবাই একবাক্যে সায় দিলে—'নিশ্চয় করবো। পুলিশকে আমরা ভয় করি না।'

কেউ কেউ বুঝি গুণ গুণ করে গান গেয়ে উঠলো :

'আমি ভয় করব না ভয় করব না।

ছ'বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥'

ইন্দিরা তখন আশপাশের এসব বালক-বালিকাদের নিয়ে তার 'বানর-সেনা' গড়ে তুললে।

'বানর-সেনা' হলো 'গান্ধী চরকা' সংঘের এলাহাবাদের বিশেষ একটি শাখা। বানর-সেনার কাজও হলো অসহযোগ আন্দোলনে সহায়তা করা। এলাহাবাদেই তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় হাজারের কাছাকাছি। বোম্বাই ও অপরাপর রাজ্যেও এর শাখা গড়ে উঠেছিলো। বানর-সেনার সভ্যরা কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের নিকট দরকারী চিরকুট, খাবার, ইত্যাদি পৌঁছে দিত। পুলিশের লাঠিতে যারা জখম হয়েছে তাদের 'ফার্স্ট এড' দিত। জাতীয় পতাকা বয়ে নিয়ে যেত।

বানর-সেনা গঠনের কথা স্মরণ করে শ্রীমতী গান্ধী পরবর্তীকালে তাঁর এক স্মৃতিচারণে বলেন :

'আমার বয়স তখন মাত্র বারো। আমি কংগ্রেস পার্টির সদস্য হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওঁরা আমার সে কথা তখন কানেই তুললেন না। বললেন : আমি ছোট। আঠারো কি একুশ বছর না হলে আমি কংগ্রেসের সদস্য হতে পারবো না। তাই শুনে আমার ভয়ানক রাগ হল। রাগের মাথায় বলে বসলাম :

'তাহলে আমি নিজেই আমার এক নতুন দল গড়ে তুলছি। সত্যি সত্যি গড়েও তুললাম আমার সংগঠন। আনুষঙ্গিক সবকিছু ব্যবস্থা করে নিলাম। বাবাও পর্যন্ত বিন্দুবিসর্গ জানতে পারলেন না।'

শ্রীমতী গান্ধী আরও লিখেছেন :

'কয়েক হাজার বালক-বালিকা যোগদান করেছিল। তখনকার দিনে ভারতে 'লাউড স্পীকার' চালু হয়নি। কাজেই অমন বড়ো জনসভায় বক্তৃতা দিতে হলে আমাকে চিৎকার করে বলতে হয়। তখন অগত্যা করি কি, আমাদের 'কণ্ঠ লাউড স্পীকার'-এর সাহায্য

নিতে হতো। বিদেশী কোন ভাষায় বক্তৃতা দেবার সময় একটি কথা বলার পর যেমন তা অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেবার প্রথা চালু আছে, তেমনি একটি কথা বলার পর তা শুনে অপর আর একজন তার পুনরাবৃত্তি করতো। দূরের আরেকজন আবার সেটার পুনরাবৃত্তি করতো। এমনি করে আমরা লাউড স্পীকারের অভাব মিটিয়ে নিতাম। ওই ছিল আমাদের লাউড-স্পীকার।'

ইন্দিরাজী তারপর বলেন :

'প্রথম প্রথম লোকে আমাদের আমলই দিত না। ভাবতো আমাদের দিয়ে কোন কাজই হবে না। কিন্তু দু'দিন পরেই ওঁরা টের পেলেন আমরা অনেক দুরূহ কাজ করতে পারি। বড়দের এমন অনেক কাজ আমরা করে দিতাম যা অপর কাউকে দিয়ে করানো যেত না। সে সব কাজের ভার আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে বড়রা আরও কঠিন কাজের প্রতি নজর দিতে পারতো। আমরা বিজ্ঞাপন মারা, খামের উপর ঠিকানা লিখে দেওয়া, পতাকা তৈরি, রান্নাবান্নার কাজ, জল দেওয়া বা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজগুলো করে দিতাম।'

'বার্তা পৌঁছে দেওয়া' কাজের ব্যাখ্যা করে ইন্দিরাজী আরও লিখেছেন :

'হয়তো পুলিশ বাহিনী এসে কোন বাড়ি ঘিরে ফেললো। এ খবর বাইরে পাঠাবেন কি, ঘর থেকে বেরুবার কারো উপায় নেই। তখনই বানর-সেনার কত কাজ। জরুরী কোন বার্তা নিয়ে বানর-সেনা কোন ছোকরা যদি পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে বাইরে সরে পড়ে, পুলিশ তাতে নজরও দেবে না। ছেলেটা তখন গোপন বার্তাটি আওড়াতে আওড়াতে নেতা বিশেষের কাছে গিয়ে সেটি পৌঁছে দেয়। পুলিশ ফৌজের আনাগোনার কথা, ধরপাকড়ের খবর, সব দেয় পৌঁছে। কি করতে হবে জেনে আসে এর পর।

'এমনি করে আমরা গোয়েন্দা বাহিনীর কাজও করতাম। ছেলে ছোকরারা পুলিশের সঙ্গে মেলামেশা করে বুদ্ধি করে জেনে নিতো

কাকে কাকে গ্রেফতার করা হবে। কোথায় কোথায় খানাতল্লাসী করা হবে। এ সব খবরই ওরা সংগ্রহ করতো। আর নেতাদের কাছে দিত পৌঁছে। আন্দোলনকে করে তুলতো জোরদার।'

বানর-সেনা গঠনের ব্যাপারে মতিলাল নেহরুরও ছিল দারুণ উৎসাহ। ১৬ জুলাই ১৯৩০ জেলে বসে লেখা ঠাকুরদার একখানি চিঠির কথা তাঁর মনে পড়লো। ঠাকুরদা লিখেছিলেন:

'ইন্দু,

বানর-সেনায় তোমার স্থান কত? আমি বলি কি, 'বানর-সেনা'র প্রতিটি সভ্যা-সভ্যর একগাছা করে লেজ পরা উচিত। আর এ লেজের বহর হবে যে সভ্য কিংবা সভ্যার স্থান যতখানি ঠিক ততখানি। অনুমানে ছবি ছাপিয়ে তোমরা যে ব্যাজ তৈরি করেছ তা ঠিকই হয়েছে। তবে দেখ কিন্তু হনুমানের হাতে সচরাচর যে ধরনের গদা দেখতে পাওয়া যায় সেটা যেন তোমাদের হাতে না থাকে। কেননা, গদা হলো হিংসার প্রতীক। আর মনে রেখো, আমরা হলাম অহিংস সৈনিক। ড্রিল আর মার্চ শেখাবার জন্য তোমরা কি কোন লোক ঠিক করেছ? ওটা করা কিন্তু দরকার। তোমাদের সবাইকে 'ফিট' থাকতে হবে। ছুটে পালানোটা প্র্যাকটিশ করো। তোমার পাপু (বাবা) রোজ সকাল বেলা দু'মাইল পথ দৌড়ে থাকে। তোমাদের কিন্তু মাইলখানেক পথ দৌড়ান অন্ততঃ উচিত কোথাও না জিরিয়ে। দৌড়ের পাল্লা তারপর একটু একটু করে বাড়িয়ে নিও। আমি আমাদের বাগানের ঢালু জমিটার একমাথা থেকে আর এক মাথা রোজ সকালে হাঁটতাম। কতখানি পথ তখন তা মেপেও নিয়েছিলাম। এখন অবশ্য মনে নেই। তুমি আবার ওটা মেপে নিও। ঠিক করে নিও এক মাথা থেকে আর এক মাথা ক'বার গেলে পর এক মাইলে দাঁড়ায়। তারপর দু'বার তিনবার করে হাঁটতে হাঁটতে দৌড়তে শুরু করে দিও। এভাবে কোরো যতক্ষণ পর্যন্ত না হাঁপিয়ে ওঠো। দেখবে দু'তিন দিনের মধ্যে

অর্ধেকটি পথ তুমি আয়ত্ত করে নিয়েছ। এমনি করে দম না হারিয়ে তুমি এক মাইল পথ দৌড়তে পারবে শীগ্‌গির।

মতিলাল নেহরু।'

বৃদ্ধ মতিলালের স্বাস্থ্য বদ্ধ কারাগারে একেবারে ভেঙে পড়লো। যদিও জওহরলাল পাশের সেলে বন্দী ছিলেন এবং পিতার দেখাশুনা করতেন নিজেই, তবুও কিন্তু মতিলাল আর তাল সামলে উঠতে পারলেন না। শরীর তাঁর দিনদিন খারাপের দিকে চললো। গতিক খারাপ দেখে বৃটিশ সরকার তাঁকে মুক্তি দিলে ১৯৩০, সেপ্টেম্বর মাসে। মুসৌরী পাহাড়ে গিয়েও মতিলালের ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হলো না। এদিকে জওহরলাল মুক্তি পাবার পর আবার গ্রেপ্তার হন এক জনসভায় বক্তৃতা দেবার জন্যে। বিচারের প্রহসনে তাঁর সাজা হয় আড়াই বছর। কমলাও জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে গ্রেপ্তার হন।

জানুয়ারীর শেষদিকে মতিলালের জীবনের সঙ্কটমুহূর্ত ঘনিয়ে এল। ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ সালে মতিলালের কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। অবসান হলো এক তেজস্বী ব্যক্তিত্বের।

'আনন্দ ভবন' আর মতিলাল নেহরুর প্রাণোজ্জ্বল হাস্য পরিহাসে মুখরিত হয়ে উঠবে না। আদরের নাতনী ইন্দিরার উপর অজস্র স্নেহধারা আর বর্ষিত হবে না। ইন্দিরা জীবনে প্রথম মৃত্যুর মুখোমুখী হলো। পরবর্ত্তী জীবনে বহু প্রিয়জন তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। মাকে তিলে তিলে মরণের পথে এগিয়ে যেতে দেখেছেন। স্বামী তাঁর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পিতার মৃত্যুও সংঘটিত হয়েছে তাঁরই চোখের সামনে। কিন্তু ঠাকুরদা মতিলালের মৃত্যু তাঁর জীবনে প্রথম শোক।

মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে জওহরলাল এক চিঠিতে (২১ এপ্রিল, ১৯৩১) তখন লেখেন :

'বাবার মৃত্যুর পূর্বে দশ দিন আমি তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলাম।

ঐ কটি দিন দিবারাত্রি আমি তাঁর ব্যাধিযন্ত্রণা লক্ষ্য করেছি। কী অসীম সাহসের সঙ্গে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে যুঝেছেন তাও দেখেছি। জীবনে তিনি বহু সংগ্রাম করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রেই জয়লাভ করেছেন। কখনও হার মানেননি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও তিনি ভয় পাননি। মৃত্যুর কাছে হার মানতে চাননি। মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর শেষ সংগ্রাম দেখছিলাম। যাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি তাঁর রোগযন্ত্রণা এতটুকু লাঘব করতে পারছিলাম না ভেবে আমার মন যখন অবসন্ন, তখন অনেকদিন আগে এডগার এলেন পো'র গল্পে পড়া কয়েকটি লাইন আমার মনে পড়ে গেল: মানুষ দেবতাদের কাছেও বশ্যতা স্বীকার করে না, এমন কি নিতান্ত দুর্বলচিত্ত না হলে মৃত্যুকেও পুরোপুরি স্বীকার করে না!...

'লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ করেছে। কিন্তু এই যে আমরা—যারা তাঁর সন্তান, তাঁর রক্ত মাংসে গড়া মানুষ—তাদের মনের অবস্থা কে বুঝবে? আর এই যে আনন্দ ভবন, তার অবস্থাই বা কী? এটিও তো আমাদের মতোই তার সন্তান। নিজের হাতে কত যত্নে কত ভালোবেসে একে গড়ে তুলেছিলেন। আজ সে গৃহ জনহীন, পরিত্যক্ত; তার প্রাণ শক্তি অন্তর্হিত। বারান্দায় মৃদু পদক্ষেপে অতি সন্তর্পণে আমরা হাঁটি, চলি, পাছে যিনি এ সুখের নীড় গড়েছিলেন তাঁর শান্তির ব্যাঘাত হয়।

'আমরা তাঁর জন্য শোকার্ত, প্রতি মুহূর্তে তাঁর অভাব বোধ করছি। তাঁর অভাব অসহ্য মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি এটা চাননি। চাননি যে শোকে আমরা ভেঙে পড়ি। তিনি যেভাবে দুঃখের সম্মুখীন হয়েছেন এবং দুঃখকে জয় করেছেন আমরাও যেন তাই করি, এই তিনি চেয়েছিলেন। তিনি যে কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাই করে গেলে তবেই তিনি তৃপ্তি পাবেন।'

ইন্দিরার নিয়মিত কোনো শিক্ষায়তনে পাঠাভ্যাসের সুযোগ ঘটেনি। আজ এক স্কুল, কাল আর এক স্কুল করতে হয়েছে। দিল্লীর এক কনভেন্টেও তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয় কিছুদিনের জন্যে। তারপর ওখান থেকে আবার এলাহাবাদের এক ডে স্কুলে।

মেয়ের পড়াশুনার জন্যে পিতা জেল থেকে চিঠিপত্রের আশ্রয় নিতেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, এ চিঠিগুলি কন্যার শিক্ষার অন্যতম সোপান। নিজেকে নিজে গড়ার হাতিয়ার।

শিক্ষাসংকট দেখা দিল শুধু ইন্দিরার নয়, বড়পিসী স্বপনকুমারীর (বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত) তিন কন্যার ক্ষেত্রেও। 'স্বরাজ ভবন' কংগ্রেস হেডকোয়ার্টারে পরিণত হয়েছিল। পুলিশ দল তাকে দখল করে নেয়। নেহরু পরিবারের বাসস্থান 'আনন্দ ভবন'ও পুলিশ ক্রোক করে নেবার কথা ভাবছিল। বড়রা সব জেলে। সুতরাং ছোটদের দেখাশুনাই বা করে কে? পড়াশুনা তো দূরের কথা।

গান্ধীজী তাই পুনার এক বোর্ডিং স্কুলে ইন্দিরা ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের তিন মেয়ের পড়াশুনার ব্যবস্থা করলেন। এ শিক্ষায়তনের নাম 'পিপল্‌স্ ওন স্কুল'। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রীযুত জাহাঙ্গীর ভকিল ও তাঁর স্ত্রী এটা পরিচালনা করতেন। শ্রীযুত ভকিল ছিলেন পার্শী।

বোর্ডিং স্কুলে ইন্দিরার এ প্রথম আগমন। বাড়ির জন্যে তার খুব মন খারাপ হতো। রাত্রে বিছানাতে শুয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতো অনেক সময়। কিন্তু ইন্দিরা চোখের জল নিজেই মুছে ফেলতো। নিজেকে শাসন করে বলে উঠতো:

'ছিঃ! সে তো আর ছোট নয়। বাড়ির জন্যে মন খারাপ করে কাঁদছে, বাবা মা শুনলে কী ভাববেন, বাবা না তাকে চিঠিতে লিখেছেন: 'ভারত মাতার সেবায় তুমি বীর সেনানী হয়ে গড়ে ওঠো।' বাড়ির জন্যে কান্নাকাটি তার কি শোভা পায়?'

ইন্দিরা নিজেকে প্রবোধ দেয়। তারপর তার চাইতে ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি সে নজর দেয়। তাদের চুল আঁচড়ে দেওয়া,

পড়া বলে দেওয়া, জামা কাপড় ঠিক করে দেওয়া প্রভৃতি কাজে নিজেকে রাখে নিযুক্ত।

ছাত্রী হিসেবে ইন্দিরা আপন প্রতিভার পরিচয় দিল। ছোটবেলা থেকে ইন্দিরা ছিল বুদ্ধিমতী, কঠোর পরিশ্রমী। যেটা করবে সংকল্প করেছে সেটা করে নিতে ভুলতো না। পড়াশুনায় ইন্দিরা ভাল ছিল। বিশেষ করে ইংরেজী ও ইতিহাসে। ফরাসীটাও বেশ রপ্ত করে নিয়েছিলো সুইজারল্যাণ্ডে থাকতে। পাঠ্য পুস্তকের বাইরের বইও বেশ পড়া ছিল তার। আর রাজনৈতিক হাতেখড়ি তো ঠাকুরদার কোলে বসেই।

নেহরু পরিবারের পরিবেশে গড়ে উঠেছিলো ইন্দিরা। দলনেত্রীর যোগ্যতা নিহিত তার রক্তে! 'বানর-সেনা' সংগঠনের মধ্যে তার স্বাক্ষর রয়েছে। পুনার বোর্ডিং স্কুলে সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া স্কুলের খেলাধুলাতেও ইন্দিরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতো। শিক্ষক ও ছাত্রীমহলেও সে ছিল খুব জনপ্রিয়। ঐ বয়সে রাজনীতি ও লেখাপড়ায় ইন্দিরা বেশ ছিল এগিয়ে। রাজনীতির অ-আ-ক-খ'তে এগিয়ে গিয়েছিলো অনেকখানি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়ও। সুতরাং স্কুলের বিতর্কসভায় তার ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। 'নকল সংসদ' বা 'মক্ পার্লামেণ্ট' বিতর্কসভায় কুমারী ইন্দিরা নেহরু প্রিয়দর্শিনী প্রতিবারই হতো দলনেত্রী। দলীয় অধিনেত্রী। বিতর্ক সভার প্রাইম মিনিস্টার। ভাবী ভারতের প্রধানমন্ত্রী!

আজকের প্রধানমন্ত্রী কি সেদিনকার 'মক্ পার্লামেণ্টে'ই প্রথম তাঁর পাঠ নিয়েছিলেন?

গান্ধীজীও তখন জেলে। সেপ্টেম্বর '৩২ বৃটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতির প্রতিবাদে পুনার যারবাদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করেছেন। ইন্দিরা ও পিসতুতো বোনরা তাঁকে দেখতে যেতো। সেবা শুশ্রূষা করতো। মা কমলা তখন কলকাতায়

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসাধীনে। জওহরলাল ১৯৩৩-এর শেষের দিকে ছাড়া পান জেল থেকে।

১৯৩৪ জানুয়ারী, জওহরলাল ও কমলা কলকাতায় আসেন কমলা নেহরুর চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে। কলকাতা থেকে তাঁরা শান্তিনিকেতনে গেলেন। গুরুদেবের সঙ্গে জওহরলাল অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করলেন। ইন্দিরার পড়াশুনার ব্যাপারেও হলো কথা-বার্তা। মেয়ে ইন্দিরা '৩৪ সালে পুনার 'পিপলস ওন স্কুল' থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তিন বছর নিয়মিত পড়াশুনা ইন্দিরার পক্ষে ভালই হলো। সরকারী বা আধা-সরকারী কলেজে ভর্তি হয়ে মেয়ে এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করুক, জওহরলালের আদৌ পছন্দ নয়। তিনি ছিলেন তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ঘোর বিরোধী। তাই গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর ইন্দিরার শান্তিনিকেতনে ভর্তি হওয়াই ঠিক হলো। গুরুদেবের সঙ্গে জওহরলালের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল নিবিড়। দেশের তারুণ্যের মূর্ত প্রতীক জওহরলালকে তিনি স্নেহ করতেন। জওহরলালও জানতেন ইন্দিরা শান্তিনিকেতনে ভর্তি হলে শিক্ষা হবে তার অনেকটা পরিপূর্ণ। জীবনকে সে শিখবে ভালোবাসতে।

শান্তিনিকেতনে ইন্দিরার কিন্তু বেশি দিন থাকা হয়নি। দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হবার আগেই বিদায় নিতে হয় তাকে। বাবার কাছে থেকে মার অসুখের জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে ইন্দিরাকে আশ্রম ছেড়ে আসতে হয়। এবং মার পরিচর্যার জন্যে তাঁর সঙ্গে আবার সুইজারল্যাণ্ডে করতে হয় যাত্রা। কিন্তু শান্তিনিকেতনে আঠারো উনিশ মাসের অবস্থিতি তাকে দিয়েছে এক শিল্পী মন। শিক্ষার উদ্দেশ্যে পিতার অজস্র চিঠি তাকে অনেকটা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে করে তুলেছিল দীক্ষিত; প্রগতিশীল ভাব-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত। আর শান্তিনিকেতনে ইন্দিরা নেহরু লাভ করলো নতুন এক শিল্পসত্তা। এ প্রসঙ্গে ইন্দিরাজী নিজেই লিখেছেন:

'শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আগে মনে হতো শিল্প কবিতা এসব বাইরের বস্তু। কিন্তু শান্তিনিকেতনে এসে জানলাম, শিখলাম—শিল্পকলা জীবনের সঙ্গে মেশানো। গুরুদেবই আমাকে শিখিয়েছেন জীবন আর শিল্প একসূত্রে গাঁথা।'

শান্তিনিকেতনের সে দিনগুলি ইন্দিরার স্মৃতিতে ভরপুর। রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরাকে পেয়ে খুশী হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে ইন্দিরা বিদায় নেবার পর জওহরলালকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে লিখেছিলেন :

শান্তিনিকেতন,
বেঙ্গল,
২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

ইন্দিরা তার চিঠিতে আমার প্রতি যে আন্তরিকতা প্রকাশ করেছে তাতে আমি সত্যই অভিভূত হয়েছি। ইন্দিরা চমৎকার মেয়ে; সে তার শিক্ষক ও সহপাঠিদের মনে একটা মধুর স্মৃতি রেখে গেছে তোমার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আদর্শ সে পেয়েছে; এবং আত্মসুখ-পরায়ণ ইংরেজ সমাজের সঙ্গে যে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি তাতে আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি। এর পরে তুমি যখন তার কাছে চিঠি লিখবে তাকে আমার আশীর্বাদ জানিও। আমাদের বাৎসরিক উৎসব চলছে। আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় লোকের ভীড় ও কর্মব্যস্থতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো তোমার অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থার তুলনা আর করলাম না।

আন্তরিক আশীর্বাদ জেনো।

তোমার একান্ত,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
কংগ্রেস শিবির, ফৈয়াজপুর।

['পত্রগুচ্ছ' : জওহরলাল নেহরু। পৃ: ১৯৬-৯৭]

জওহরলালকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এ চিঠিতে পিতার সঙ্গে মেয়ের চারিত্রিক দৃঢ়তার যে তুলনা কবি করেছেন তা বিশেষ করে উল্লেখ্যের। ইন্দিরার এ চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় তার উত্তর জীবনেও উদ্ভাসিত হয়েছে বহুক্ষেত্রে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রীজীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক এখানে। ঘটনাটি হল :

শান্তিনিকেতন আশ্রমে জুতো পরে ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল কোন একটি বিশেষ ঘরে। সবাই জুতো ছেড়ে খালি পায়ে পবিত্র সেই ঘরে যেতেন। নবাগত এক বিদেশী অধ্যাপক কিন্তু জিদ ধরলেন, তিনি জুতো খুলবেন না। এ আশ্রম নিয়মবিধির ব্যতিক্রম। নানা অনুরোধে উপরোধেও অধ্যাপক ক্ষান্ত হলেন না। তিনি জুতো পরে ক্লাশে ঢুকবেন।

এদিকে ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু বেঁকে বসল। তারা সবাই অধ্যাপকের ক্লাশ করলে বর্জন। কেউ যোগ দিলে না ক্লাশে।

সেদিনকার সে ক্লাশ বর্জন আন্দোলনের নেত্রী হলো লম্বা, ফর্সা ছিপছিপে রোগা একটি মেয়ে। নাম ইন্দিরা নেহরু। আজকের প্রধান মন্ত্রী।

['দেশ' : ১৫ মাঘ, ১৩৭২ ; ৩৩ বর্ষ ॥ ১৩শ সংখ্যা]

শান্তিনিকেতনের এক সহপাঠিনী শ্রীমতী অশোকা সিংহ সতীর্থ ইন্দিরা সম্বন্ধে ৩২ বছর পর 'দেশ' পত্রিকায় যে স্মৃতিচারণা করেন তাতে ইন্দিরার ব্যক্তিগত জীবনের বহুদিকও ফুটে উঠেছে। লেখাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল এখানে :

'১৯৩৪ সাল। এখন মনে হচ্ছে বাস্তবিক সেটা অবিস্মরণীয় একটি বছর। বর্তমান স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তখন আর কতটুকু মেয়ে। যখন সে এসেছিল শান্তিনিকেতনে পড়তে তখন তার বয়স ষোল কি সতেরো। আমি তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। সব ছাত্রীদেরই থাকার ব্যবস্থা তখন ছিল মেয়েদের হস্টেল 'শ্রীভবনে'। একদিন শুনলুম যে ইন্দিরার মা শ্রীমতী কমলা নেহরু শান্তিনিকেতনের 'উত্তরায়ণে' এসেছেন। এ

সংবাদ শোনার কিছুক্ষণ পরেই দেখলুম রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা বৌঠান ও 'কলা ভবনে'র অধ্যাপক শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর শ্রীমতী কমলা নেহরুকে সঙ্গে নিয়ে 'শ্রীভবনে' আসছেন। বোধ হয় মেয়েদের থাকার কি রকম ব্যবস্থা দেখাবার জন্য। এর কিছুদিন পরেই জানতে পারলুম যে তাঁর মেয়ে ইন্দিরা আসছে শান্তিনিকেতনে পড়তে।

'আমাদের 'শ্রীভবনে' সকলের মধ্যেই আলোড়ন পড়ে গেল। মেয়েটি না জানি কি রকম হবে! একে তো মতিলাল নেহরুর নাত্‌নী। তদুপরি দেশবরণ্যে নেতা জওহরলালের মেয়ে। নেহরু পরিবারের যে আভিজাত্যের কথা লোক পরম্পরায় শুনেছিলুম হয়তো মেয়েটিও সে গৌরবে গর্বিত হবে! কিন্তু আমাদের সে ধারণা যে কতটা অমূলক তা তখনই বুঝতে পারলাম যখন ইন্দিরার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল আমাদের 'শ্রীভবনে'।

'ফর্সা লম্বা ছিপছিপে চেহারা, পরনে অতি সাধারণ খদ্দরের শাড়ী ও খালি পা। সঙ্গে ছিল তার একটি বাক্স ও বিছানা। ঠিক যেন আমাদের মতো অতি সাধারণ ঘরের একটি মেয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

'আমরা তো দেখেই অবাক হয়ে ভাবছিলুম এ কি সেই ইন্দিরা নেহরু? খানিকক্ষণ আলাপের পর বুঝতে পারলুম মেয়েটি অত্যন্ত সরল, নম্র ও নিরহঙ্কার। আমরা তখন মাত্র ৩০।৩১ জন মেয়ে হস্টেলে থাকি। সেই সময়ে আমাদের আশ্রমের নিয়মানুযায়ী মেয়েদের (ছোটদের পর্যন্ত) সমস্ত কাজ নিজেদের করতে হত। ঝি, চাকরের কোনও বালাই ছিল না। ভোর সাড়ে চারটের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দৈনিক কাজ শুরু হয়ে যেত। প্রথমেই নিজেদের বিছানা পরিপাটি করে গুছিয়ে নিয়ে স্বস্থানে রেখে ঘর ঝাঁট দিতে হত। তারপর কনকনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করেই নিজেদের কাপড় কেচে তৈরী হতে হত ভোরবেলা বৈতালিকের জন্য। এবং ক্লাশের জন্য। এমন কি রান্নাঘরে খাবার পরিবেশনের সম্পূর্ণ ভার ছিল ছাত্রছাত্রীদের। আমাদের সকলের মনেই সন্দেহ

জেগেছিল, নেহরু পরিবারের একমাত্র মেয়ে এ ব্যবস্থায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে কি ? কিন্তু আশ্চর্য হলাম যখন দেখলুম অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইন্দিরা আমাদের 'শ্রীভবন' ও আশ্রমের জীবন কত সরলভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে নিয়েছে। প্রত্যেকের সঙ্গে মধুর ব্যবহার ও সব কাজে এগিয়ে এসে সাহায্য করার আগ্রহ তার মধ্যে দেখেছি। তখনই তার অল্প বয়সের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে তার প্রতি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়েছিলুম। তখন শান্তিনিকেতনে কোথাও বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না। চৈত্র বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড গরমেও ইন্দিরা সর্বদা মোটা খদ্দরের শাড়ী পরত। অত গরমেও কখনো তাকে অস্বস্তি বোধ করতে দেখিনি। রান্নাঘরে যে ক'দিন তার পরিবেশনের ভার থাকত সকলের আগেই তৈরী হয়ে ঠিক সময়ে সে উপস্থিত থাকত এবং প্রত্যেককে খুব যত্ন করে ও প্রফুল্ল মনে পরিবেশন করত।

'সবাইকে পরিবেশন করে শেষকালে খেতে বসত এবং সব গুছিয়ে সে যখন 'শ্রীভবনে' ফিরত তখন আমাদের রাত্তিরের শোবার ঘণ্টা পড়ে যেত। যদিও সে কলেজের ছাত্রী ছিল কিন্তু তার মধ্যে দেখেছি সবকিছু শিখবার এক প্রবল আগ্রহ। নাচ, গান, ছবি আঁকা সব তার ভাল লাগতো এবং নিয়মিতভাবে প্রত্যেক ক্লাশে আসত। ইন্দিরা স্বভাবত লাজুক ও গম্ভীর ছিল। কিন্তু বাইরে তার একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব থাকলেও সময়ে সময়ে তার বয়সোপযোগী একটু আধটু ঠাট্টা তামাসাও করতে ছাড়ত না সে।

'একবার সন্থুবেহেন নামে এক গুজরাটি মহিলার ঘর থেকে বাটিকের কাজকরা একটি চামড়ার ব্যাগ উধাও হয়। সন্থুবেহেন ছাড়া আমরা সবাই জানতুম তাঁর ব্যাগ কোথায় আছে। কারণ তাঁকে নিয়ে একটু মজা করব এই আমাদের ইচ্ছা। মহিলাটি ইন্দিরাকে খুব স্নেহ করেন। প্রায়ই তাকে ঘরে নিয়ে বসাতেন ও নিজের হাতে করা নানা বাটিকের কাজ শেখাতেন। ইন্দিরাও বৃদ্ধ মহিলাটিকে খুশী করবার জন্য তাঁর কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

করত। আমরা সবাই জানতুম চামড়ার ব্যাগ শেষ করেই তিনি সেটি মাষ্টারমশাইকে (নন্দলাল বসুকে) উপহার দেবেন বলে স্থির করেছেন। হঠাৎ ইন্দিরারই প্রথমে একটু মজা করার ইচ্ছা হল। এবং আমরা সবাই তার সঙ্গে যোগ দিলুম। সন্নুবেহেন যখন ঘরে ছিলেন না তখন আমরা ইন্দিরাকে তাঁর ঘর থেকে ব্যাগ নিয়ে আসতে পাঠালুম। সন্নুবেহেন ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলেন তাঁর সেই নক্‌সা-করা বাটিকের ব্যাগ হারিয়ে গেছে। সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন কেউ দেখেছে কিনা এবং বিশেষ করে ইন্দিরাকে বললেন—ব্যাগটার একটু খোঁজ করতে। 'শ্রীভবনে' খুব হাসাহাসি ও হই-চই চলছে। এদিকে সন্নুবেহেন ইন্দিরাকে জানালেন যে তাঁর ব্যাগ না পেলে তিনি অনশন করবেন। সবাই তখন ব্যাগ খোঁজাখুজির ভান করতে লাগলাম। সন্নুবেহেন বারে বারে বলতে লাগলেন—ব্যাগ না পাওয়া গেলে অনশনেই তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। হঠাৎ ইন্দিরা বলে উঠল—শ্রীভবনের গাছতলায় সন্নুবেহেনের ব্যাগটি পাওয়া গেছে। তাই শুনে সন্নুবেহেন ঘর থেকে ছুটে এলেন। ইন্দিরা একটি ব্যাগ তাঁর হাতে দিলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি বুঝতে পারলেন যে ব্যাগটি তাঁর নিজের হাতের তৈরি ব্যাগ নয়। অবস্থা যখন চরমে তখন ইন্দিরা আসল ব্যাগ ফেরত দিলে। সন্নুবেহেন অভিমান করে বলেছিলেন :

'ইন্দিরা, আমি ভাবতে পারিনি তোমার মতন ধীর ও শান্ত মেয়ে এ রকম দুষ্টুমিতে যোগ দেবে!'

শ্রীমতী অশোকা সিংহ আরও লিখেছেন :

'ইন্দিরা শান্তিনিকেতনের প্রতিটি উৎসবেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। সকলের সঙ্গে মেশার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। কখনও তাঁকে দেখা যায়নি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। জওহরলালের মেয়ে বলে কোন দিন জাহির করেননি নিজেকে; অত্যন্ত অমায়িক লাজুক প্রকৃতির ছিলেন ইন্দিরা।'

ইন্দিরার আত্মনির্ভরশীলতার উদাহরণ দিতে গিয়ে শ্রীমতী সিংহ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন।

'১লা বৈশাখ, নববর্ষের উৎসব। অন্যান্যের সঙ্গে ইন্দিরাও ব্যস্ত উৎসবের আয়োজনে। এমন সময় গুরুদেব তাঁকে ডেকে পাঠালেন, তখনিই এলাহাবাদ রওনা হবার জন্যে। মা অত্যন্ত অসুস্থ। বাবা জরুরী তার করেছেন। গুরুদেব ঠিক করলেন বিদ্যালয়ের তৎকালীন রেক্‌টর শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী সঙ্গে যাবেন। পৌঁছে দেবেন ইন্দিরাকে ট্রেনে। কিন্তু ইন্দিরা রাজী হলেন না। জানালেন তিনি একাই যাবেন। কারণ, বাবা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন—কখনও পরের উপর নির্ভরশীল না হতে।'

পরে আরও একটি দিনের কথা লিখেছেন শ্রীমতী অশোকা সিংহ। সে দিনটিতে ছিল বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসব।

'আচার্য জওহরলাল এসেছেন। কন্যা ইন্দিরাও। শিশু পুত্র রাজীবকে সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে আম্রকুঞ্জে উপস্থিত হতে ইন্দিরার কিছু বিলম্ব হয়। অনুষ্ঠান তখন শুরু হয়ে গেছে। মেয়েরা যেখানে ভীড় করে দাঁড়িয়ে, সেখানটায় এলেন ইন্দিরা শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে। পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'শ্রীমতী সিংহ ইন্দিরাকে দেখে সামনে এগিয়ে যাবার কথা বলেন। উত্তরে স্মিত হেসে ইন্দিরা জানালেন : চেন না তো আমার বাবাকে! একে তো দেরি করে এসেছি, তার উপর যদি সামনে বসতে যাই বাবা ভীষণ রাগ করবেন। আমি এখানেই বেশ আছি।'

এই ছোট্ট ঘটনাটিতে প্রতিফলিত হয় ইন্দিরার চরিত্র মাধুর্য। বিনয়মন্ত্র স্বভাব।—

['শান্তিনিকেতনে সতীর্থ ইন্দিরা' ঃ —শ্রীমতী অশোকা সিংহ। 'দেশ' : ৩৩ বর্ষ, ১৩৭২ ॥ ১৩শ সংখ্যা, পৃঃ ১২৬০]

কমলা নেহরুর শরীর ক্রমশঃ মন্দের দিকে যাচ্ছিল। আরোগ্যের আশা ছিল না। জওহরলাল তখন জেলে। আলিপুর জেল থেকে দেরাদুন জেলে স্থানান্তরিত হয়েছেন। কমলার রোগশয্যার পাশে উপস্থিত থাকতে তাঁকে দিন এগারোর জন্যে জেল থেকে প্যারোলে ছেড়ে দেওয়া হলো। পত্নীর রোগ পাণ্ডুর বিশীর্ণ মুখখানি দেখে জওহরলালের অন্তরাত্মা কেঁদে উঠলো। তাঁদের এতদিনকার পরিণীত জীবনের অনেকগুলি দিন কেটেছে ছাড়া ছাড়া ভাবে। অন্তরীণ আর কারা অন্তরালের গণ্ডীর মধ্যে। তুদিনের জন্যেও তিনি রুগ্না পত্নীর শিয়রে বসে সেবা-শুশ্রূষা করবার একটু সুযোগ পাননি। কমলাও স্বামীকে একান্ত কাছে পাননি। আপনার রোগতপ্ত কপোলের উপর স্বামীর করতলের স্পর্শ লাভ করেননি কতোদিন। তবু কিন্তু কমলা দেশের চাইতে নিজের স্বার্থকে বড়ো করে দেখেননি। জওহরলাল তাঁর অসুখের জন্যে বৃটিশ সরকারের নিকট মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পেতে চায় শুনে কমলা স্বামীকে মৃত্ন ভৎ‍র্সনা করতেও ছাড়েননি তখন। বলেছেন :

'ছিঃ! আমার জন্যে তুমি শেষকালে ইংরেজ সরকারের নিকট বণ্ড্ লিখে দেবে? ছিঃ! আমি ভাবতেও পারি না।'

শীর্ণ, রোগপাণ্ডু, বড়ো বড়ো তুটি চোখ তুলে স্বামীকে তিনি বিদায় দিয়েছিলেন সেদিন।

তুষারমৌলী হিমালয়ের পাদদেশে ভাওয়ালীর স্যান্যাটোরিয়ামে কিছুকাল কাটিয়ে কমলার স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি দেখা দিলো। স্বাস্থ্যের আরও উন্নতির জন্য জার্মানীর ব্ল্যাক ফরেস্ট এলাকায় এক স্যান্যাটোরিয়ামে পাঠানোর ব্যবস্থা হলো মে ১৯৩৫ সালে। নেহরু পরিবারের আত্মীয় ডাঃ মদন অটল সঙ্গে গেলেন দেখাশুনার জন্যে। ইন্দিরাও মার সঙ্গে রওনা হলো।

বেডেনউইলারের (Bedenweiler) স্যান্যাটোরিয়ামে তখন কমলাকে দেখতে যেতেন আরেকজন ভারতীয় যুবকও। তিনি হলেন ফিরোজ গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নামের সাদৃশ্য থাকলেও

বংশগত কোনো সম্পর্ক ছিল না তাঁদের মধ্যে। কেননা গান্ধীজী হলেন বর্ণ হিন্দু। আর ফিরোজ গান্ধী জাতিতে পার্শী। জোরাথুস্ট্র-পন্থী। এলাহাবাদেরই ছেলে। নেহরু পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর অনেকদিনের। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌সের ছাত্র। বিদেশে রুগ্না কমলাকে দেখতে যেতেন। সেবা-শুশ্রূষা করতেন। খোঁজ খবর নিতেন সকলের। কমলা ফিরোজকে বিশেষ স্নেহের চোখেই দেখতেন।

সেদিনকার কথা তাঁর এখনো মনে পড়ে। তিনি, কৃষ্ণা হাতিসিং ও আরো অনেক মহিলা এলাহাবাদের এক কলেজে পিকেটিং করতে গিয়েছিলেন একদিন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ্দুর। দেখতে দেখতে সূর্য কখন মাথার উপর উঠে এসেছে খেয়াল নেই। কমলা তাঁর রুগ্ন শরীর নিয়ে এ প্রচণ্ড রোদ্দুরে কলেজের সামনে সত্যাগ্রহ করছিলেন। কলেজের পাঁচিলের উপর বসে একদল ছোকরা মহিলা সত্যাগ্রহীদের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা ইয়ারকি করছিল। টিপ্পনিও কাটছিল। সত্যাগ্রহীরা কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যাগ্রহ করে চলেছিলেন। শ্লোগান দিচ্ছিলেন। হঠাৎ কমলা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চোখ তাঁর ধাঁধিয়ে এলো। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল নিদারুণ গ্রীষ্মে। মাথাটি তাঁর ঢলে পড়লো ধূলিধূসর রাজপথে।

সত্যাগ্রহীর দল আর্ত চীৎকার করে উঠলেন। যেসব ছেলে এতক্ষণ পাঁচিলে বসে ঠাট্টা তামাশা করছিল তারা অনেকেই ছুটে এল। সবাই ধরাধরি করে কমলাকে নিয়ে এল ছায়াঘন এক গাছতলায়। কেউ কেউ হাওয়া করতে শুরু করলে। একটি ছেলে ছুটে গেল জলের সন্ধানে। আপনার পরিধেয় বস্ত্রের অংশবিশেষ ছিঁড়ে নিয়ে তা ভিজিয়ে আনলো জলে। আর মূর্ছিতা কমলার কপালে দিলে বুলিয়ে।

কমলা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। চোখ মেলে তাকালেন। অনেকটা বুঝি সুস্থ বোধ করলেন। উঠে বসলেন।

পরদিন কিন্তু আশাতীত ফল পাওয়া গেল। কলেজের সামনে আর সত্যাগ্রহ করার প্রয়োজন হল না মেয়েদের। পাঁচিলের উপরে-বসা ছাত্ররাই এবার সত্যাগ্রহীদের দলে যোগ দিয়েছে। বর্জন করেছে স্কুল, কলেজ। সেদিনকার ঘটনায় যে ছেলেটি কমলাকে পাঁজাকোলা করে গাছতলায় নিয়ে গিয়েছিল, জলের সন্ধানে ছোটা-ছুটি করছিল, সেই এগিয়ে এল কংগ্রেস ভলান্টিয়ার দলে যোগ দিতে। অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কমলা যতদিন বেঁচে ছিলেন ছেলেটি সঙ্গ ছাড়েনি তাঁর। ছায়ার মতো করেছে তাঁর অনুগমন। তখন থেকে সে নেহরু পরিবারের একজন হয়ে গেছে। কমলাও তাকে মাতৃ-হৃদয়ের সব স্নেহ, ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছিলেন। ছেলেটিও কমলার রোগ শয্যার পাশে বসে মৃত্যু-পথযাত্রীর সেবা-শুশ্রুষা করতে কোনদিন ভোলেনি। সেদিনকার সে ছেলেটিই ফিরোজ গান্ধী। ফিরোজ গান্ধীর সঙ্গে ইন্দিরার প্রথম পরিচয় সুইজারল্যাণ্ড বা লণ্ডনে নয়। এলাহাবাদেই। এবং শৈশব থেকেই।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫-এ নেহরু জেল থেকে ছাড়া পেলেন পত্নীর অসুখের জন্যে। এলাহাবাদ থেকে তিনি ইউরোপ যাত্রা করলেন বিমানযোগে। বেডেনউইলারে তিনি ৯ সেপ্টেম্বর, '৩৭-এ এসে উপস্থিত হলেন।

জানুয়ারী '৩৬ সুইজারল্যাণ্ডের লসেন্-এর (Lausanne) আর এক স্যান্যাটোরিয়ামে কমলাকে ভর্তি করে দেওয়া হলো। কমলার এখানে শরীরের কিছুটা উন্নতি হলো। ইন্দিরাকেও বেক্স্-এর সে পুরোন স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। জওহরলালও দেশে ফিরে আসবেন ঠিক করলেন। আর মাত্র চারদিন বাকী কংগ্রেস অধিবেশনের। এপ্রিল মাসে কংগ্রেস অধিবেশন বসছে। আর জওহরলালের তাতে পৌরহিত্য করার কথা। তাই ভারতে ফেরার সব কিছু ঠিকঠাক। কিন্তু কমলার শরীর সহসা খারাপের দিকে গেল। ২৮ ফেব্রুয়ারী, '৩৬-এ জওহরলাল, ইন্দিরা আর ফিরোজের

শোকাতুর চোখের সামনে কমলার হৃৎপিণ্ডটি চিরতরে গেল স্তব্ধ হয়ে। থেমে গেল প্রাণস্পন্দন তুষারমৌলী দূর বিদেশের এক স্যান্যাটারিয়ামে। লসেনে কমলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হলো।

কমলা নেহরুর মৃত্যুর পর ১৯৩৬, ৮ মার্চ, তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমে অনুষ্ঠিত এক স্মরণ-সভায় রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন তা এখানে উৎকলন করা গেল :

'আজ কমলা নেহরুর মৃত্যুদিনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করবার জন্য আমরা আশ্রমবাসীরা মন্দিরে সমবেত। একদিন তাঁর স্বামী যখন কারাগারে, যখন তাঁর দেহের উপরে মরণান্তিক রোগের ছায়া ঘনায়িত, সেই সময় তিনি তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে আমাদের এই আশ্রমে এসেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, সেই দুঃসময়ে তাঁর কন্যাকে আশ্রমে গ্রহণ করে কিছুদিনের জন্যে তাঁদের নিরুদ্‌বিগ্ন করতে পেরেছিলাম। সেই দিনের কথা আজ মনে পড়ছে—সেই তাঁর প্রশান্ত, গম্ভীর অবিচলিত ধৈর্যের মূর্তি ভেসে উঠছে চোখের সামনে।...

'কমলা নেহরু যাঁর সহধর্মিণী, সেই জওহরলাল আজ সমস্ত ভারতের তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী; অপরিসীম তাঁর ধৈর্য, বীরত্ব তাঁর বিরাট—কিন্তু সকলের চেয়ে বড়ো তাঁর সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। পলিটিক্‌সের সাধনায় আত্মপ্রবঞ্চনা ও পর-প্রবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে নিজেকে কখনো হারিয়ে ফেলেননি। সত্য যেখানে বিপদজনক সেখানে সত্যকে তিনি ভয় করেননি, মিথ্যা যেখানে সুবিধাজনক সেখানে তিনি সহায় করেননি মিথ্যাকে। মিথ্যার উপচার আশু প্রয়োজনবোধে দেশপূজার যে অর্ঘ্যে অসঙ্কোচে স্বীকৃত হয়ে থাকে, সেখানে তিনি সত্যের নির্মলতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন। তাঁর অসামান্য বুদ্ধি কূটকৌশলের পথে ফললাভের চেষ্টাকে চিরদিন ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করেছে। দেশের মুক্তিসাধনায় তাঁর এই চরিত্রের দান সকলের চেয়ে বড়ো দান।

'কমলা ছিলেন জওহরলালের প্রকৃত সহধর্মিণী। তাঁর মধ্যে ছিল সেই অপ্রমত্ত শান্তি, সেই অবিচলিত স্থৈর্য, যা বীর্যের সর্বোত্তম

লক্ষণ। তাঁদের দুজনের কারো মধ্যে দেখিনি অতিভাবালুতার চঞ্চল উত্তেজনা। তাঁদের এমন পরিপূর্ণ মিলনে, কি জীবনে কি মৃত্যুতে, বিচ্ছেদের স্থান নেই নিশ্চয়ই। আজ তাঁর স্বামী মরণের মধ্য দিয়ে কমলাকে দ্বিগুণ করে লাভ করেছেন, যিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন, আজও তিনি জীবনসঙ্গিনীই রইলেন।

'দূর অতীতের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষণিকায় আমরা পুরাণ-বিখ্যাত সাধ্বী ও বীরাঙ্গনাদেরকে তাঁদের বিরাট স্বরূপে দেখতে পাই। কমলা নেহরু আজও সেই কালের পরিপ্রেক্ষণিকায় উত্তীর্ণ হননি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিকটবর্তী বর্তমানের প্রত্যক্ষ গোচর; এখানে বড়োর সঙ্গে ছোটো, মূল্যবানের সঙ্গে অকিঞ্চিৎকর জড়িত হয়ে থাকে। তৎসত্ত্বেও আমরা তাঁর মধ্যে দেখছি যেন একটি পৌরাণিক মহিলা; তিনি তাঁর আপন মহত্ত্বের পরিপ্রেক্ষণিকায় নিত্যরূপে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশমান।...

'এই নারীর জীবনে বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে প্রতিদিন যে দুঃসহ সংগ্রাম চলেছিল, যে সংগ্রামে তিনি কোনদিন পরাভব স্বীকার করেননি, সে আমাদের গৌরবের সঙ্গে স্মরণীয়। স্বামীর সঙ্গে সুদীর্ঘ কঠিন বিচ্ছেদ তিনি অচঞ্চল চিত্তে বহন করেছেন স্বামীর মহৎ ব্রতের প্রতি লক্ষ্য করে। দুর্বিষহ দুঃখের দিনেও স্বামীকে তিনি পিছনের দিকে ভাবেননি। নিজের কথা ভুলে সঙ্কটের মুখ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাঁকে বেদনা জানাননি। স্বামীর ব্রতরক্ষা তিনি আপন প্রাণরক্ষার চেয়ে বড়ো করে জেনেছিলেন। এই দুষ্কর সাধনার জোরে তিনি আজও, মৃত্যুর পরেও দুর্গম পথে স্বামীর নিত্যসঙ্গিনী হয়ে রইলেন।

'আজ এই আমাদের বলবার কথা যে, আমরা লাভ করলুম এই বীরাঙ্গনাকে আমাদের ইতিহাসের বেদীতে। আধুনিক কালের চলমান পটের উপর তিনি নিত্যকালের চিত্র রেখে গেলেন। তাঁকে হারিয়েছি এমন অশুভ কথা কোনমতেই সত্য হতে পারে না।'

['আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে উদ্ধৃত]

মা নেই। চোখের সামনে ইন্দিরা দেখেছে মায়ের মৃত্যু। তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যেতে উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর প্রাণময় জীবনটি। মায়ের শোকে ইন্দিরা ভেঙ্গে পড়লো। আরক্ত চোখে বাপের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

জওহরলাল মেয়েকে নিয়ে তাই মনত্রেঁ-র (Montreux) লেকপল্লী অঞ্চলে দিন কয়েকের জন্যে বেড়াতে এলেন। দেশ-বিদেশের নানান কথা ও কাহিনী শুনিয়ে তিনি মায়ের শোক কিছুটা লাঘব করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এদিকে সময় নেই হাতে। মেয়েকে তিনি তাই বেকস্ স্কুলে আবার পাঠিয়ে দিয়ে নিজে স্বদেশ অভিমুখে রওনা হলেন।

বেকস্-এ কিছুকাল কাটিয়ে ইন্দিরা ইংলণ্ডে এলো। আর ভর্তি হলো ব্রিস্টলের ব্যাডমিণ্টন স্কুলে। লণ্ডন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে লাগলো। কেননা জওহরলাল চান মেয়ে অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হোক। পড়াশুনা না করে দেশে ফেরারও তখন কোন মানে হয় না। ভারতীয় রাজনীতি তখন মন্দঃস্রোতে বইতে শুরু করেছে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়েছে।

ব্যাডমিণ্টন স্কুল থেকে লণ্ডন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলো ইন্দিরা। ইতিহাস, অর্থনীতি আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছিল তার বিশেষ পাঠ্য বিষয়। তারপর অকস্‌ফোর্ডের সমারভিল কলেজে ভর্তি হলো। পড়াশুনা চললো। সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিও। রাজনীতি যার রক্তে—বংশপরম্পরায় তাকে ভুলে থাকা কি যায়? লণ্ডনেও ইন্দিরা সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করলো। লণ্ডন প্রবাসী অধিকাংশ ছাত্রই তখন 'ইণ্ডিয়া লীগ'-এর সভ্য। ইন্দিরাও ইণ্ডিয়া লীগ-এ যোগদান করলো। রোজ একবার সন্ধ্যার দিকে ইণ্ডিয়া লীগ অফিসে হাজিরা দিতে ভুলত না। ইণ্ডিয়া লীগ বৃটিশ লেবার পার্টির সমর্থক। শ্রীকৃষ্ণ মেনন (ভেনগালিল কৃষ্ণান কৃষ্ণমেনন) তখন ইণ্ডিয়া লীগ-এর কর্ণধার। নেহরুর ব্যক্তিগত

বন্ধু। তাঁর গ্রন্থ-প্রকাশনার প্রধান উদ্যোক্তা। সুপরিচিত লেখক।

আজকের বহু সংসদ সদস্য এবং বামপন্থী ভারতীয় রাজনীতির অনেক বিশিষ্ট নেতা ও মন্ত্রীও একদিন এ ইণ্ডিয়া লীগ-এর সভ্য ছিলেন। ইন্দিরার সহযোগী। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য— সি. পি. আই. নেতা ভূপেশ গুপ্ত, রেণু চক্রবর্তী, নিখিল চক্রবর্তী; সি. পি. এম. নেতা জ্যোতি বসু, স্বর্গত মোহন কুমারমঙ্গলম ও তাঁর বোন পার্বতী, মিনু মাসানী প্রমুখ আজকের অনেকেই।

স্পেনে তখন গৃহযুদ্ধ চলেছে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো ফাসিস্ট্ শক্তি-মত্তায় উন্মত্ত হয়ে স্পেনের গণতন্ত্রকে পদদলিত করে চলেছে অবলীলা-ক্রমে। রাজধানী মাদ্রিদ ধূলিধূসরিত। বিধ্বস্ত। বিশ্বের প্রগতিশীল জনমত এ বর্বর ফাসিস্ট্ আক্রমণের বিরুদ্ধে ধিক্কারে তখন মুখর।

ইউরোপ ও আমেরিকার যুবসমাজ স্পেনের গণতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে ফ্যাসী-বিরোধী ইণ্টারন্যাশানাল ব্রিগেড-এ গিয়ে দলে দলে যোগদান করতে লাগলো। লণ্ডন প্রবাসী ছাত্রদের মনেও নতুন আশা-উদ্দীপনা সৃষ্টি করলো। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্নসাধনাকে নতুন করে দেখতে শুরু করলো স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের পাদপীঠে। অনেকে খবর পেয়েছেন, জওহরলালের কন্যা ইন্দিরা এখন লণ্ডনে। নেহরু পরিবারের বন্ধু, বন্ধুস্থানীয় অনেকের সঙ্গে ইন্দিরার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটলো। জার্মান ইহুদী কবি ও নাট্যকার আর্নস্ট টলার ও তাঁর পত্নী ক্রিস্টিন তখন লণ্ডনে শরণার্থী। হিটলারের নাৎসী জার্মানী থেকে হন্যে কুকুরের মতো হয়েছিলেন বিতাড়িত। সুইজারল্যাণ্ডে ১৯২৭ সালে বাবা মার সঙ্গে ইন্দিরা যখন গিয়েছিলেন, তখন টলার দম্পতির সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। আর্নস্ট টলার তাঁর ‘মানুষ ও জনতা’ নাটকে হিংসার বিরুদ্ধে মানব বিবেকের সংগ্রামকে রূপায়িত করেছেন। জওহরলালের মাতৃহারা এ কন্যাটিকে শ্রীমতী টলার বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। জওহরলালকে লেখা এক পত্রে তিনি লেখেন:

'আমি আপনাকে বলতে চাই ইন্দিরাকে দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি।...মনে হয় যেন ছোট্ট একটি ফুল। একটা দমকা হাওয়ায় বুঝি সহজে উড়ে যাবে। কিন্তু আমি মনে করি বাতাসকে ও ভয় পায় না।'—['এ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটারস']

টলার-দম্পতি ১৯৩৯ সালে লণ্ডন ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে বসবাস করেন। কিন্তু কিছুকাল পর আর্নস্ট টলার আত্মহত্যা করে নিজ জীবনের অবসান ঘটান। নাৎসী নির্যাতন আর অত্যাচারের নিষ্ঠুর বলি হলেন বিপ্লবী এ কবি ও নাট্যকার। স্বদেশ জার্মানী থেকে বিতাড়িত এমনি শত-সহস্র ইহুদী নরনারীতে শ্রীমতী ইন্দিরা কি পরবর্তীকালে প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন পাকিস্তানী বর্বরতার নিষ্ঠুর বলি ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের মধ্যে ?

শুধু টলার দম্পতি নন, ইংলণ্ডের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ইন্দিরার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। তাঁদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত শ্রমিক নেতা এলেন উইলকিনসন, এন্যুরিন বিভান ও তাঁর স্ত্রী জেনী, লী জন স্ট্র্যাচি, হাবার্ট মরিসন, রেজিন্যাল্ড সোরেনসেন, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ প্রমুখ বহু রাজনীতিজ্ঞ। ক্যাণ্টারবেরীর ডীন রেভারেণ্ড জনসন, ইংরেজ লেখক ব্রেইলসফোর্ড, ইংরেজ কবি ও সমালোচক টমসন, নিগ্রো গায়ক পল রবসন প্রমুখ অনেকের সংস্পর্শে ইন্দিরা তখন আসে। বৃটিশ সমাজবাদের অন্যতম কর্ণধার হ্যারলড ল্যাস্কির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে এ সময়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বহু ভারতীয় ছাত্রের মাথায় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার বীজ বপন করেছেন। ইন্দিরাও তাঁর কাছে সমাজবাদের পাঠ নিতে গেলো। কিন্তু একটি ঘটনা তার মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিলো। তার ব্যক্তিত্ববোধ ফুটে উঠলো নতুন করে :

১৯ জুন, ১৯৩৮ জওহরলাল বোম্বে থেকে জেনোয়া যাত্রা করেন জাহাজে করে। সেখান থেকে মার্সাই যান। তারপর স্থলপথে গিয়ে পৌঁছান বার্সিলোনায়। স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

সঞ্চয়ই উদ্দেশ্য। স্পেন থেকে নেহরু যখন লণ্ডনে ফিরে আসেন, তখন টোরী নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে তিনি বহু নিমন্ত্রণ পত্র পান। কিন্তু ইন্দিরা সে সময় টোরীমতের ছিলো ঘোরতর বিরোধী। প্রখ্যাত কন্‌জারভেটিভ নেতা লর্ড লোথিয়ান তাঁর বিরাট এলিজাবেথীয় প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করলেন নেহরু ও ইন্দিরাকে; কন্যা ইন্দিরা সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল। অজুহাত দিল তার একটি জরুরী কাজ রয়েছে। কিন্তু জওহরলাল জিদ ধরলেন—'না, তোমার যাওয়া উচিত। না হলে খুব অন্যায় হবে।'

ইন্দিরা প্রত্যুত্তরে বাবাকে বললে, 'আমি জানি আমি ওখানে গেলে আমি আমার মেজাজ হারিয়ে বসবো। তাই আমি যাচ্ছি না।'

বাবা তখন বললেন, 'না, তোমার রাগলে চলবে না। সব রকমের লোকের সঙ্গে তোমায় মিশতে হবে। তোমাকে তাই শিখতে হবে। জানতে হবে ওরা কী ভাবে আর কী ভাবে না।'

লর্ড লোথিয়ানের কাছ থেকে ইন্দিরা আবার এক পত্র পেলো। এ পত্রে তিনি ইন্দিরাকে নতুন করে নিমন্ত্রণ জানালেন। আগেকার অঙ্গীকারপত্র বাতিল করে দিতে অনুরোধ জানালেন। ইন্দিরা অগত্যা তাই করলো। অবশেষে যাওয়াই ঠিক করলো। তবে গিয়ে চোখাচোখা কথা বলতে হবে। তাই সাব্যস্ত করলো। কোন রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীর সঙ্গে মতৈক্য নয়।

ইন্দিরা তার বাবার সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে যেতে চাইলো ১৯৩৮ সালে। ফাসিস্ট যূপকাষ্ঠে চেকোশ্লোভাকিয়ার বলি সম্পূর্ণ প্রায়! সারা ইউরোপ জুড়ে তখন 'নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস'। মহাপ্রলয় আসন্ন। বাবার সঙ্গে গিয়ে সবটা প্রত্যক্ষ করতে ইন্দিরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। ইন্দিরার এ ইচ্ছা অধ্যাপক লাস্‌কির কানেও পৌঁছাল। তিনি ইন্দিরার যাওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বললেন:

'দেখ, এখন তোমার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সময়। তুমি যদি

এখন তোমার বাবার পিছু পিছু চলতে থাক তাহলে সারাজীবন তোমাকে তোমার বাবার অনুসরণ করেই চলতে হবে। তাই আমি বলি কি, বাবার সঙ্গে তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। তোমার এখন নিজের পথে চলা উচিত।'

ইন্দিরা অধ্যাপকের উপদেশ মন দিয়ে শুনলো। কিছু বললো না। কিন্তু অধ্যাপকমশাই জানতেন না যে ইন্দিরা তাঁর মাস্টার মশাইয়ের সত্নপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে আপন মতাদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে—এটা অভাবনীয়। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ইন্দিরা পূর্ব সংকল্পে অটল রইলো। বাবার সঙ্গে ইউরোপ যাত্রা করতে ভুললো না।

অধ্যাপক ল্যাস্‌কির তখন দারুণ রাগ। চটে গিয়ে বলে উঠলেন : 'তিনি এ বিষয়ে অনেক সময় নষ্ট করেছেন আর না।'

ইন্দিরা তাঁর উপদেশ কানে তুললো না। তবু ভাল অধ্যাপক-মশাই ইন্দিরাকে তাঁর 'দ্য গ্রামার অব পলিটিক্‌স' ক্লাসিক গ্রন্থখানি আবার পড়ে দেখতে বলেননি।

পরে ইন্দিরা স্মিত হেসে জানিয়েছিলো : 'উনি বলুন আর নাই বলুন, আমি কিন্তু পড়ে নিয়েছিলাম—'দ্য গ্রামার অব পলিটিক্‌স'। রাজনীতির ব্যাকরণ!

ইংলণ্ডে ইন্দিরার ছাত্রী-জীবনের বছর চারেক কাল ঘটনাবহুল নানা কার্যকলাপের মধ্যে কেটে গেল। শান্তা গান্ধী ইন্দিরার পুনার 'পিপলস্‌ ওন স্কুল'-এর সহপাঠিনী। লণ্ডনেও তাই। কিছুকাল একই ঘরে ছিল। শান্তা ও ইন্দিরা তুজনে মিলে স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের সাহায্যার্থে লণ্ডনে নাচেরও আয়োজন করেছিল। নিজে গিয়ে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করতো অনেক সময়। একবার এমনি এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইন্দিরা তো তাঁর পাঁচ পাউণ্ডের দামী ব্রেসলেট-খানা স্পেনের ত্রাণ ভাণ্ডারে দান করে বসলো।

বাদ বাকী অবসর সময়ে তুই বন্ধুতে মিলে লণ্ডনে থিয়েটার, অপেরা নানান প্রেক্ষাগৃহে ছুটতো, সাপ্তাহিক হাত খরচার উদ্‌বৃত্ত

কিছু সঞ্চয় করে। কোনো কোনো দিন বা পিকাডিলীর ভারতীয় রেস্তোঁরায়। টেবিল ম্যানার্স-এর কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে হাত দিয়ে খাবার খেতেও কসুর করতো না। মশলাদার পান কিনে তুই বন্ধুতে চিবাত। এমনি একদিন এক থিয়েটার দেখতে গিয়ে ইন্দিরা তার প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো আর একটি ভারতীয় ছাত্রের। বললো :

'ইনি হলেন ফিরোজ গান্ধী। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌সের ছাত্র। আমাদের এলাহাবাদেই বাড়ি।'

শান্ত চোখ তুলে তাকালে। চাপা মেয়ে ইন্দিরা। মুখ ফুটে কিছু কোনদিন বলে না। তবে বলুক আর নাই বলুক, তু' তরুণ তরুণীর মধ্যে গভীর প্রেম-অনুরাগের ছায়া সেদিন তার চোখতুটিতে ধরা পড়েনি এমন নয়।

ইন্দিরা মার্চ '৩৯ সালে অকস্‌ফোর্ডে ভর্তি হলো। কিন্তু বছরটা ইন্দিরার ভালোয় ভালোয় কাটলো না। সহসা সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। ইংল্যাণ্ডের পেন্ বনভূমি অঞ্চলে একদিন ইন্দিরা তার বন্ধুর সঙ্গে সাইকেলে চড়ে গিয়েছিলো প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে। মাঝপথে নামলো দারুণ ঝড়বৃষ্টি। ইংল্যাণ্ডের বৃষ্টি। ইন্দিরাও তার সঙ্গী তুজনেই ভিজে চুপসে গেলো একেবারে। বুকে ঠাণ্ডা গেল বসে। মিডলসেকস্-এ ব্রেনটফোর্ড কটেজ হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো। হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখা গেল প্লুরিসিতে সে আক্রান্ত। মা মারা গিয়েছেন টি. বি.তে। সুতরাং আত্মীয় স্বজন সবাই ইন্দিরার স্বাস্থ্যের জন্যে উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠলেন। যাই হোক নেহরুপরিবারের বন্ধু ও ইংল্যাণ্ডে স্বাস্থ্য দপ্তরের উপদেষ্টা ডঃ পি. সি. ভাণ্ডারীর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ইন্দিরা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সুইজারল্যাণ্ডের লসেন শৈলাবাসে পাঠানো হলো তাকে। নভেম্বর ১৯৪০ সাল নাগাদ ইন্দিরা তার হৃতস্বাস্থ্য পুনরায় ফিরে পায় সুইজারল্যাণ্ডের স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে। নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ড তখন ফ্যাসী-বিরোধী শিবিরে পরিণত। ইউরোপের বহু চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী



নেহরু পরিবার ঃ

স্বরূপরাণী নেহরু, মতিলাল নেহরু, কমলা নেহরু।

দ্বিতীয় সারিতে ঃ

জওহরলাল নেহরু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, কৃষ্ণা নেহরু,

বালিকা ইন্দিরা ও রঞ্জিত পণ্ডিত।



বিবাহ বাসরে

বর ও বধূ





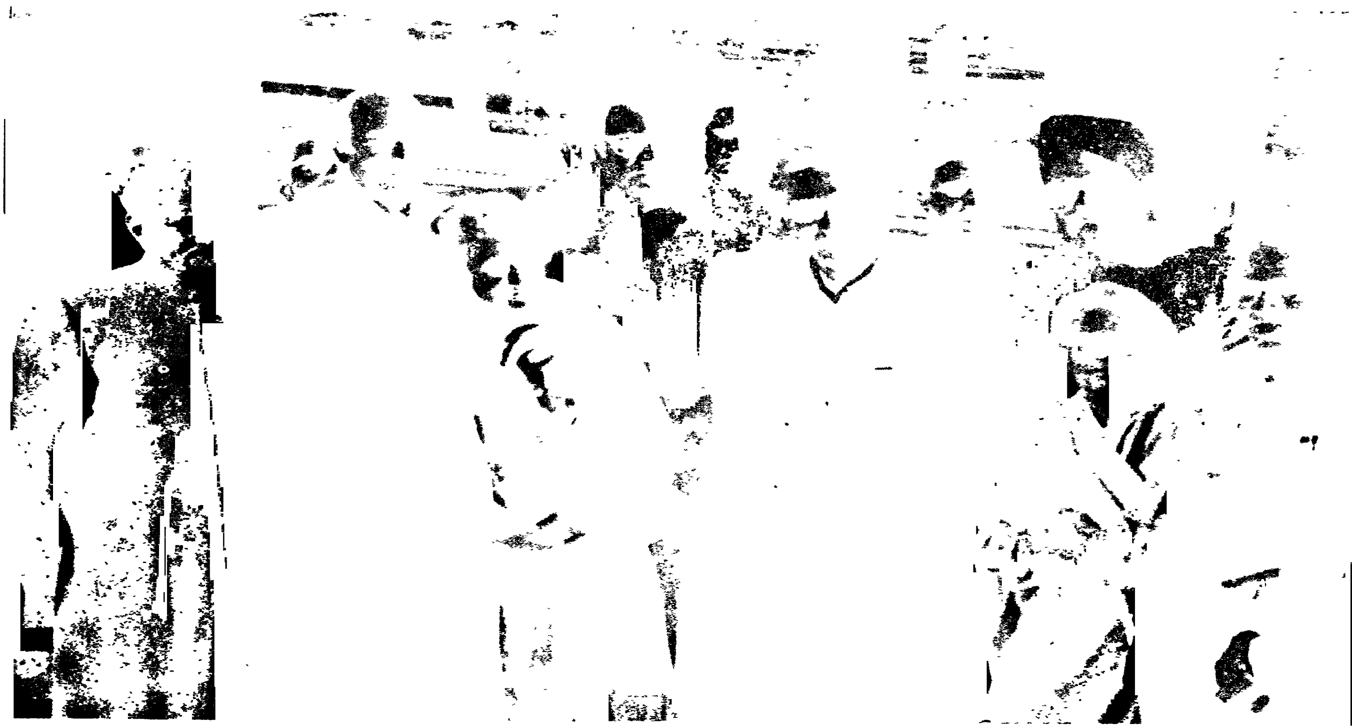
সপরিবারে শ্রীমতী গান্ধী



পৌত্রকে কোলে নিয়ে



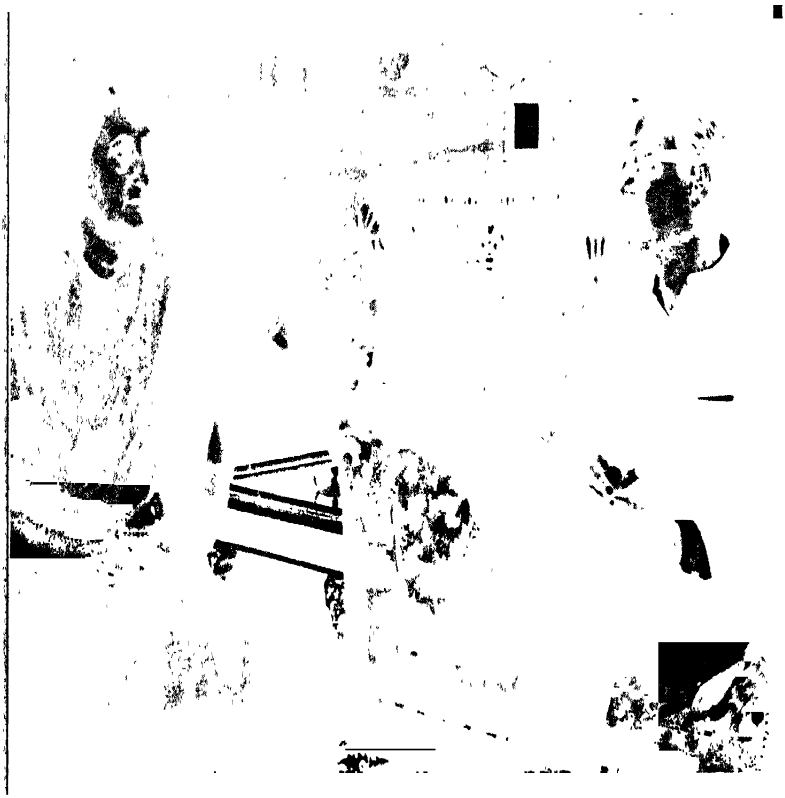
রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নিকট শপথ গ্রহণ



পালাম বিমান বন্দরে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত শেখ মুজিবুর রহমানের সংবর্ধনায়



সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে আলাপরত



বঙ্গবন্ধু মুজিবুর ও ইন্দিরা

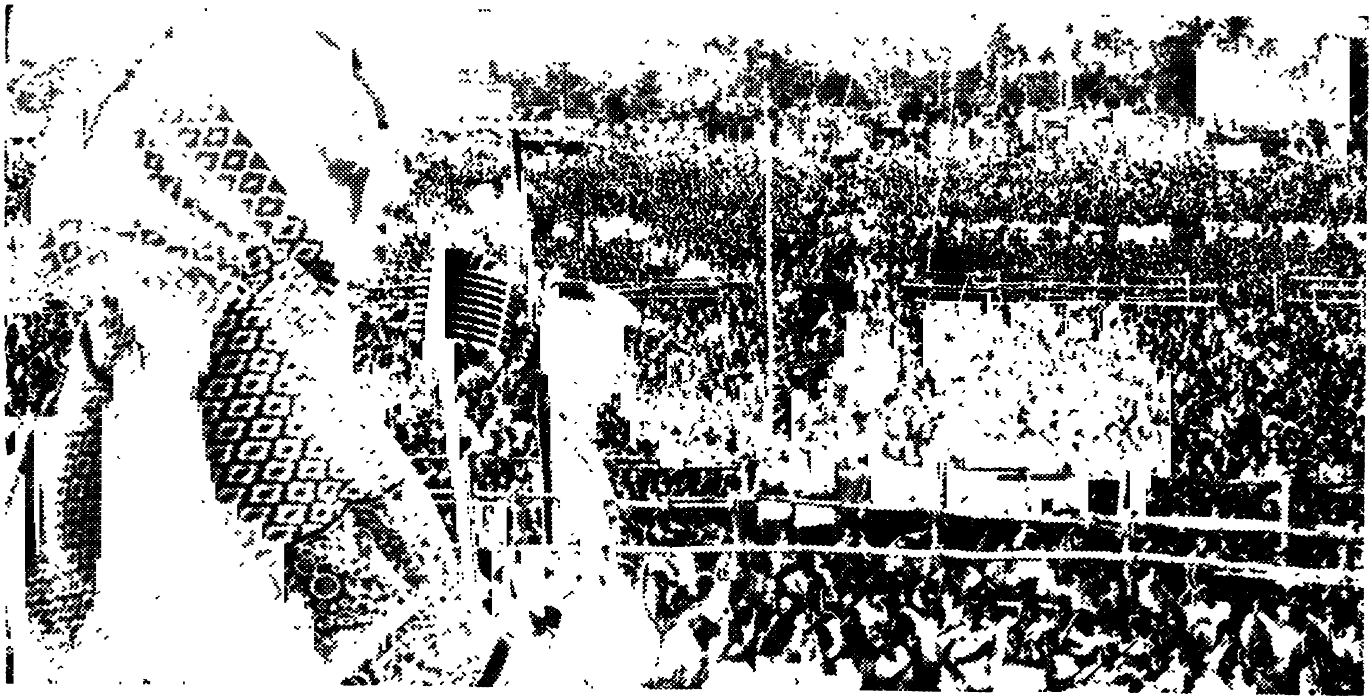


মস্কো-প্রধানদের সঙ্গে ঃ

কোসিজিন, ইন্দিরা, ব্রেজনেভ ও পদগর্নি



বাস্তহারা দর্শকদের সারা



জনসমুদ্রে ইন্দিরা



ভারতরত্ন

নাৎসী নির্যাতন ও নিপীড়নের কবল থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে আশ্রয় নিয়েছেন সুইজারল্যাণ্ডে।

ইন্দিরা জেনেভা থেকে মার্সাই-এ এসে উপস্থিত হলো। তারপর বার্সিলোনা, লিসবন হয়ে লণ্ডনে এসে পোঁছাল বিমানে করে। গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত স্পেন থেকে লণ্ডনে ফেরা সে সময় আদৌ সুখের নয়। কেননা লণ্ডনে তখন প্রতিদিন এয়ার-রেড হচ্ছে। অবিরাম বোমাবর্ষণ মারফত নাৎসী সমরনায়কেরা বৃটিশ মনোবলে ফাটল ধরাতে বদ্ধপরিকর। ইন্দিরা লণ্ডনে ফিরে রেড ক্রশ সেবাদলে নিজের নাম লেখালে। হিটলারী এয়ার-রেড মাথায় করে এ্যাম্বুলেন্স-এর গাড়ী হাঁকাতেও সে তখন ভয় পায়নি।

ইন্দিরা যখন অকস্‌ফোর্ডে, তখন বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের জন্য ১৯৩৫ সালের ইণ্ডিয়া এ্যাক্‌ট পাশ করলো। '৩৭ সালে তা চালু হলো। এ আইনে ভারতে এক নতুন শাসনতন্ত্র প্রচলিত হলো। এই শাসনতন্ত্রে ভারতে চালু হলো ফেডারেল সরকার। যে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো তাতে কংগ্রেস ভারতের আটটি প্রদেশে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করলো। নতুন প্রাদেশিক সরকারও গঠন করলো। যে কংগ্রেস নেতারা এতকাল জেলে বন্দী ছিলেন, তাঁরাই আজ দেশের মন্ত্রী।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কংগ্রেসী নেতাদের বেশিদিন মন্ত্রিত্ব করা হলো না। ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সালে বৃটেন নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দিলে বৃটিশ ভারতও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। জাতীয় কংগ্রেস অবশ্য ফ্যাসিসট্‌ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোন আপত্তি করলো না। কিন্তু বৃটিশ সরকারকে জানিয়ে দিলো যুদ্ধে যোগদানের আগে ভারতে গণতন্ত্র যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস এ কথাও উল্লেখ করলো—যুদ্ধে যোগদানের আগে ভারতীয় জনগনের সম্মতির কথা বৃটিশ সরকার একবার তলিয়েও দেখেনি। কাজেই অক্টোবর '৩৯ প্রাদেশিক

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা একসঙ্গে সবাই পদত্যাগ করলেন প্রতিবাদে। কংগ্রেস সভ্যরা পৃথক পৃথকভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন।

আবার সেই ধরপাকড়। জেল ভর্তি। বিনোবা ভাবেই প্রথম জেলে গেলেন। তারপর জওহরলাল। বৃটিশ সরকারকে নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিলেন—তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা করবেন। জনসাধারণকে জানিয়ে দেবেন, তারা যেন কেউ যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখযোগ্য, মার্চ '৩৯ ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি পুনরায় নির্বাচিত হলেন ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করে। কিন্তু গান্ধীজী এই পরাজয়কে নিজের ব্যক্তিগত পরাজয় বলে ঘোষণা করলেন। জওহরলালও সুভাষচন্দ্রের নির্বাচন মেনে নিতে পারলেন না। কাজেই মাসখানেক পরে ওয়ার্কিং কমিটির অসহযোগ মনোভাবে বীতস্পৃহ হয়ে সুভাসচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতিত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এবং এর কিছু কাল পরে আশ্চর্যজনকভাবে অন্তর্ধান হলেন স্বগৃহে অন্তরীণ থাকা কালে বৃটিশ গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে। তারপর সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের। এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুক্তি অভিযান আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর জওয়ানদের নিয়ে। নেতাজীর অমোঘ আহ্বান :

'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।'···

ইন্দিরা ভারতে ফেরার জন্যে এবার উন্মুখ হয়ে উঠলো। যুদ্ধকালীন ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া একরূপ অসম্ভব তখনকার পরিস্থিতিতে। উচ্চশিক্ষা লাভ তার আর হয়ে উঠলো না। গ্র্যাজুয়েট হওয়া অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের। (পরে অবশ্য ইন্দিরা সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত হয়েছিলেন ১৯৭১ সালে)। বাবা জওহরলালকে এক পত্রে ইন্দিরা তাঁর সংকল্পের কথা জানালেন। যদিও তখনকার দিনে সমুদ্র পথে ভারতে আসা খুব বিপদজনক, কেননা জার্মান ডুবোজাহাজ ভারতীয় জাহাজ দেখলেই ডুবিয়ে দিতে

ছাড়তো না, তবুও মেয়ের ভারতে ফেরার সংকল্পকে জওহরলাল সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

অবশ্য এ চার বছরের মধ্যে ইন্দিরা যে ভারতে ছুটির সময় একবারও ঘুরে যায়নি তা নয়। ১৯৩৮-এর শেষের দিকে ইন্দিরা ভারতে একবার এসেছিলো। আর তার একবিংশ জন্মদিনটি বিশেষ ঘটা করে প্রতিপালিত হয়েছিল। ইন্দিরা জন্মদিনের উপহার হিসেবে তার জীবনের স্মরণীয় উপহারটি লাভ করে। সেটা হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ সভ্যপদ। যখন তার বয়স ছিল বারো তখনই ইন্দিরা কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার হতে চেয়েছিল। কিন্তু ছোট ছিল বলে তাকে তখন কংগ্রেসের সভ্য করা হয়নি। ইন্দিরা রাগ করে 'বানর-সেনা' গঠন করেছিলো। আর আজ একুশ বছর বয়সে ইন্দিরা সেই দুর্লভ সম্মানের হলো অধিকারিণী। তার জন্মদিনের শ্রেষ্ঠ উপহার। তেরো বছর বয়সে জন্মদিনে বাবা জেল থেকে যে উপহারটি পাঠিয়েছিলেন, এ তার চাইতে খাটো নয়। বাবার জেলে বসে লেখা জন্মদিনের সেই চিঠি।···

মাতৃহারা মেয়ে ইন্দিরাকে পেয়ে পরিবারের সবাই খুশী হয়েছিলেন খুব। ঠাকুরমা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। নানান শোকতাপে এবং পুলিশী অত্যাচারে ঠাকুরমা রীতিমত ভেঙে পড়েছিলেন। এমনি রোগা, বেঁটে খাটো কাশ্মীরী পুতুলের মতো ছিলেন মানুষটি। এখন যেন আরো শীর্ণ, খাটো হয়ে গেছেন। ছোট্ট একটি মেয়ের মতো। নাতনীকে বুকে জড়িয়ে তিনি এবার ফুঁপিয়ে উঠলেন। বিদেশ বিভুঁয়ে চিরতরে ঘুমিয়ে থাকা পরলোকগত পুত্রবধুর শোক তাঁর উথলে উঠল। যেন নতুন করে তাঁকে পেয়ে বসলো।

ইন্দিরা তার প্রিয় 'ডোল আম্মার' চোখ দুটি মুছে দিলে। এ তার শেষ দেখা। ঠাকুরমাকে আর সে দেখেনি! স্বরূপরাণী যখন মারা যান ইন্দিরা তখন ইংল্যাণ্ডে। ঠাকুরমার মৃত্যুর পরদিন তাঁর বিধবা দিদি বিবি আম্মাও মারা যান। তাঁকেও না।

জওহরলালের শরীরও ভেঙে পড়েছিলো। তিনিও কিছুকাল পরে (জুন '৩৮) ইউরোপ যাত্রা করেন। স্পেনে গৃহযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে এলেন। হিটলারী যূপকাষ্ঠে সুদেতেনল্যাণ্ডের ৩০ লক্ষ জার্মানসহ চেকোশ্লোভাকিয়ার বলিদান অবলোকন করেন অসহায় নীরব সাক্ষী হিসেবে। মাস তিন চার পরে ইউরোপ থেকে ফেরার পথে জাহাজে আরব সাগরের বুকে কন্যাকে তাঁর পত্রগুচ্ছের শেষ চিঠিটি লেখেন। জওহরলাল লিখেছিলেন :

'অতীত ইতিহাসের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে তার শুষ্ক কঙ্কাল আবার রক্তমাংসে ভরে উঠেছে। প্রতিটি যুগের অগণিত নর-নারীর বিপুল শোভাযাত্রা। আমাদের মতো মানবোচিত গুণ, ভুল-ভ্রান্তি তাদের মধ্যেও। ইতিহাস যাদুর খেলা নয়। কিন্তু যাদের দেখার চোখ আছে তারা এর মধ্যে যাদুর খেলাও দেখতে পায় অনেকখানিই।···

'···সক্রেটিসের যুগের মতো আমরাও বাস করছি একটা জিজ্ঞাসার যুগে। কিন্তু সে জিজ্ঞাসার ক্ষেত্র এখন সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত।'

পৃথিবীর অন্যায়, নৃশংসতায় জওহরলাল বিষণ্ণ। সংশয়ে দিশাহারা। ম্যাথু আর্নল্ডের মতো তখন তাঁরও মনে হয়—এই পৃথিবীতে আশা বলে কিছুই বুঝি অবশিষ্ট নেই!

জওহরলাল আরও লেখেন : 'বিশ্বসংসারের সুন্দর বস্তুগুলোকে দেখে মুগ্ধ হয়ে, চিন্তা আর কল্পনার রাজ্যে মগ্ন হয়ে আমরা যদি অন্যদের দুঃখকে ভুলে থাকি সেটা স্বজাতি প্রীতির পরিচয় হবে না। চিন্তা সার্থক সেইখানেই যেখানে সে কর্মে প্রবৃত্তি দিচ্ছে। তিনি উদ্ধৃত করেন মহামনীষী রোমাঁ রোলাঁর বাণী :

'কর্মই হচ্ছে চিন্তার উদ্দেশ্য। যে চিন্তা কোনো কর্মের দিকে প্রেরণা দেয় না সে পণ্ডশ্রম। প্রবঞ্চনা মাত্র। অতএব চিন্তার সেবক যদি আমরা হয়ে থাকি, তবে কর্মেরও সেবক আমাদের হতেই হবে।'

পরিশেষে তিনি মেয়েকে স্মরণ করিয়ে দেন একটি কবিতা—একটি মধুর কাব্যোক্তি। রবীন্দ্রনাথের:

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি'—
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত॥'

['বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ' : জওহরলাল নেহরু। পৃঃ ৯১৫ ; সং ৩য়।]

এবার ঘরে ফেরার পালা।

যুদ্ধের হিড়িকে জনজীবন বিপর্যস্ত। পর্যুদস্ত। তবু কিন্তু হিটলারী নৈশ বিমান-হানার বিরাম নেই। লণ্ডন ও তার উপকণ্ঠে সমানে বোমাবর্ষণ চলেছে। প্রতিদিন। প্রতিরাত্রি।

বহু ঘোরাঘুরি করার পর ইন্দিরা একখানি জাহাজে ভারতে ফেরার টিকিট সংগ্রহ করলে। জার্মান ডুবোজাহাজের ভয়ে জাহাজখানির দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারত অভিমুখে রওনা হবার কথা। জাহাজে তার আরও দুজন সহযাত্রী জুটলো। একজন হলেন লণ্ডনে তার ছাত্রীজীবনের ছায়াসঙ্গী—লণ্ডন স্কুল অব

ইকনমিক্সের ছাত্র বন্ধুটি। দ্বিতীয় জন তার উত্তর রাজনৈতিক জীবনের প্রতিপক্ষ শ্রীভূপেশ গুপ্ত।

মার্চ '৪১ ওদের জাহাজ বোম্বেতে এসে ভিড়লো। পিসী কৃষ্ণা হাতিসিং ও পিসেমশায় রাজা হাতিসিং জাহাজ ঘাটে নিজে এসে ইন্দিরাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ইন্দিরা খুব রোগা ও বিশীর্ণ হয়ে পড়েছিল।

বোম্বাইয়ে পৌঁছেই ইন্দিরা বাবাকে দেখতে গেল জেলে। জওহরলাল মেয়েকে দেখে ওর স্বাস্থ্যের জন্যে রীতিমত উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠলেন। মুসৌরীর এক স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠাবার সব ব্যবস্থা করলেন।

বাবাকে জেলে দেখতে এসে ইন্দিরা কিন্তু কথাটি পাড়লে। চোখ দুটি নত করে বলল:

সে বিয়ে করতে চায়। বাবার যদি আপত্তি না থাকে।

জওহরলাল চোখ তুলে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন:

'আপত্তি কেন? ভালোই তো। তবে ছেলেটি কে?'

'ফিরোজ।'—ইন্দিরা একটু থেমে জবাব দিলে: 'আমাদের ফিরোজ।'

'ফিরোজ গান্ধী!'

জওহরলাল সাধারণতঃ একটুতেই চটে যান। নেহরু পরিবারের ধাত হলো তাই। মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবেও তাই রেগে গেলেন:

'না। তা হয় না।'

চেয়ার ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কারাকক্ষে বার কয়েক পায়চারি করলেন। তারপর স্বগত কণ্ঠে বলে উঠলেন:

'এ বিয়ে আমি সমর্থন করতে পারছি না। অসবর্ণ বিবাহে আমার কোনো আপত্তি আছে বলে নয়। তুমি তোমার পিসীদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে দেখতে পারো। আমার মনে হয় তুমি আপাততঃ এ প্রস্তাবে আর অগ্রসর হয়ো না।'

ইন্দিরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। যেটা একবার করবে বলে ঠিক করেছে সেটা সে করবেই। পিসী বিজয়লক্ষ্মীর সঙ্গে প্রথমে কথা বলে দেখলে। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও আপত্তি জানালেন দাদার মতো। যদিও তাঁকেও অসবর্ণ বিবাহ করতে হয়েছিলো। ইন্দিরা তখন বোম্বাইয়ে এসে ছোট পিসী কৃষ্ণা হাতিসিং-এর নিকট ধরনা দিলে। বললে :

'তুমি আর রাজাভাই বিয়ের দশদিন আগেও কেউ কাউকে তেমন করে জানতে না। রাজাভাই তোমার সম্পর্কে হয়তো আগে থেকে কিছু জানতেন। কিন্তু চিট্টি (ফুফির তামিল ভাষান্তর), আমি তো ফিরোজকে জানি সেই ছোটবেলা থেকে। তবে ওর সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি কিসের? আর কোন ভারতীয় যুবকের সঙ্গে আমার নতুন করে আলাপ করারও বা কি প্রয়োজন?'

ইন্দিরা একটু থামলো। বললো :

'ফিরোজকে আমি বিয়ে করবো।'

অবশ্য, নেহরু পরিবারে অসবর্ণ বিবাহ তেমন নতুন কিছু নয়। বড়পিসী বিজয়লক্ষ্মী কিংবা ছোটপিসী কৃষ্ণা হাতিসিং দুজনেই অসবর্ণ বিবাহ করেছেন। বড় পিসেমশায় রঞ্জিত পণ্ডিত যদিও তাঁর ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম তবুও তিনি কাশ্মীরী নন। আর রাজা হাতিসিং জৈন ধর্ম অবলম্বী। নেহরুর দুই আত্মীয় মুসলমান পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছেন। অপর একজন তো এক হাঙ্গেরীয়ান ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করেছেন।

জওহরলালের আপত্তি কিন্তু অসবর্ণ বিবাহে নয়। অন্য কারণে। ফিরোজ গান্ধীর শিক্ষা-দীক্ষা ও বংশগত পরিবেশের সঙ্গে নেহরু ভাবধারার অনেকখানি পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্য রীতি-নীতি চাল-চলনে ওঁরা অভ্যস্ত। মানও উচ্চ স্তরের। দুই তরফের পারিবারিক পরিবেশ যদি সমান সমান হয় তবে অসবর্ণ বিবাহে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।

ফিরোজ গান্ধীর জন্ম সেপ্টেম্বর ১৯১২। বাবা জাহাঙ্গীর

ফারহুনজী ছিলেন নৌ-ইঞ্জিনীয়ার। পার্শীদের মধ্যে তিনি সকলের আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কিংস কমিসণ্ড ইঞ্জিনীয়ার পদে বৃত হন।

পিতাকে যুদ্ধ জাহাজে ঘুরে ঘুরে কাটাতে হতো বলে শিশু ফিরোজ গান্ধী ও তার অপর চার ভাই-বোনকে নিয়ে মা রত্তিমাঈ গান্ধী তাঁদের আত্মীয়া ডাঃ এস. কমিসারিয়েটের নিকট থাকতেন। ডাঃ কমিসারিয়েট রয়েল কলেজ অব সার্জন-এর প্রথম মহিলা সভ্য। তিনি এলাহাবাদের লেডী ডাফরিন হাসপাতালে তাঁর প্রকাণ্ড কোয়ার্টারে বসবাস করতেন।

ফিরোজ গান্ধী, তাঁর দিদি তাহ্‌মিনা এবং দাদা ফারেহুন এলাহাবাদেই ছোটবেলা থেকে বড়ো হয়ে উঠেছে। কাজেই ফিরোজ গান্ধীরা এলাহাবাদেরই ছেলে। নেহরু পরিবারের সঙ্গে জানাশুনো অনেকদিনের। বত্রিশের অসহযোগ আন্দোলনের পর ফিরোজকে বহুবার পুলিশের হাতে নিগ্রহ ও কারাবরণ করতে হয়েছে। জেল থেকে বেরিয়ে 'আনন্দ ভবনে'ই সে তার ঘরবাড়ি করে নিয়েছিল।

ইন্দিরা ও ফিরোজ, দুই কিশোর-কিশোরীর নিবিড় পরিচয় বুঝি তখন থেকেই!

৪ ডিসেম্বর, ১৯৪১ জওহরলাল জেল থেকে ছাড়া পেলেন।

আর ২৬ মার্চ '৪২ বিয়ের দিন সাব্যস্ত হলো। তখন ইন্দিরার বয়স ছাব্বিশ বছর পাঁচ মাস।

সেদিন ছিল রাম-নবমীর দিন—রামের জন্মদিন। আর জওহরলাল ও কমলার বিয়ের দিন ছিল বসন্ত পঞ্চমী।

বিরাট শামিয়ানার নীচে বৈদিক রীতিতে এ উদ্‌বাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। গয়না গাঁটির পরিবর্তে কনের হাতে, গলায় ফুলের আভরণ। ফুলের অলঙ্কার পরা কাশ্মীরী রীতি। পরনে রূপোলী ফুলের কাজ করা খদ্দরের শাড়ী। কনের বাবা জেলে বসে আপন চরকায় যে সুতো কেটেছেন তাই দিয়ে কনের শাড়ী বোনা। জওহরলাল নিজেই কন্যাকে বিবাহ-বাসরে নিয়ে এলেন।

বরের পরনেও খদ্দরের পোশাক। খাদি সারোয়ানী আর

চুড়িদার। অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বর-কনে দুজনে পাশাপাশি বসলো। কনের পাশে বসলেন তার বাবা। তাঁর পাশে আর একখানি আসন খালি রাখা হলো পরলোকগতা কমলার স্মরণে। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে অগ্নি সাক্ষী করে জওহরলাল তাঁর একমাত্র দুহিতাকে জামাতা ফিরোজের হস্তে করলেন সমর্পণ। যজ্ঞকুণ্ডের চতুর্দিকে বর কনে সাতবার প্রদক্ষিণ করে এলো। বৈদিক রীতিতে ক্রিয়া হলো সম্পন্ন। শেষ হতে ঘণ্টা দেড়েক প্রায় লাগলো।

নিজের বিয়ের ব্যাপারে এক সাক্ষাৎকারীর কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে ইন্দিরাজী পরে বলেছেন :

'না, আমার বিয়ের ব্যাপারে বাবার তেমন মত ছিল না। শুধু বাবা কেন, দেশশুদ্ধ সবাই ছিল এ বিয়ের বিরুদ্ধে।'

এর কারণ ব্যাখ্যা করে ইন্দিরাজী বলেন :

'কারণ আর কিছু না। ওর সংস্কৃতিই বাদ সেধেছিল। ওরা হল পার্শী। আমাদের সঙ্গে গোড়াতেই গরমিল। কাজেই বাবা প্রথম দিকে খুব একটা খুশী ছিলেন না। শেষে অবশ্য হ্যাঁ-না কিছুই আর বলেননি। কিন্তু বাদ বাকী সবাই ছিল বিরোধী। দেশশুদ্ধ সবাইয়ের ছিল আপত্তি।'

'সংবাদপত্রেরও ?'

'না, ঠিক সংবাদপত্রের আপত্তি ছিল না। ছিল সাধারণ লোকের। আমি তো প্রতিদিন শত শত চিঠি পেতাম। আমাকে ভয় দেখিয়ে, আমাকে সব রকমের গালাগালি করে লেখা। অবশ্য কেউ কেউ আমাকে উৎসাহ দিতেন। লিখতেন :

'তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।'

'কিন্তু তাতে কি আপনার জিদ আরও চেপে যায়নি ?' সাক্ষাৎ-কারীর প্রশ্ন।

'আমি তা মনে করি নি। দেখুন, আমি এ ব্যাপারে বেসামাল হইনি। আমি যদি জানতে পারি যে আমি কি চাই তাহলে অপরে

কি বললো না বললো—কেউ বিরোধিতা করলো আর না করলো তাকে আমি বড়ো একটা তোয়াক্কা করি না। আমি যদি একবার আমার মন ঠিক করে ফেলি তবে আমি তা করবই করবো। কেউ আমাকে রুখতে পারবে না।

'এ কারণেই বুঝি আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানটা বড় আকারে হয়েছিলো। এই একটি বিষয়ে আমি হার মেনেছিলাম। নিরিবিলি বিয়েটা চুকিয়ে নিতেই আমরা চেয়েছিলাম। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী আপত্তি তুললেন। বললেন :

'লোকজন কাউকে নিমন্ত্রণ না করে তোমরা যদি এ বিয়ে চুপিসারে সেরে নাও, লোকে ঠিক ভাববে তোমাদের এ বিয়েতে বাবার মত নেই বলে তিনি তাঁর জামাতা আর কন্যাকে কোন রকমে নমো-নমো করে পার করে দিয়েছেন।

'লোকে তাই ভাবতো। আর তা আমার, কি আমার স্বামীর প্রতি অবিচার করাই হতো। কাজেই আমাদের বিয়ে খুব ধূমধাম জাঁকজমক করে না হলেও একেবারে অনাড়ম্বর, সাদাসিধে ভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। ভারতের নানা জায়গা থেকে অনেকেই যোগদান করেছিলেন।'

'বিয়ের পর সাধারণের মধ্যে এর কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল?' সাক্ষাৎকারীর আরেক প্রশ্ন।

উত্তরে ইন্দিরাজী বলেন :

'আমি তো আগেই বলেছি, প্রগতিশীল যাঁরা তাঁরা এ বিয়েকে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ ইচ্ছেও প্রকাশ করেছিলেন যে এমন ধরনের মিশ্র বিয়ে আরও হওয়া দরকার। আর যাঁরা গোঁড়া-পন্থী তাঁরা অবশ্য এর বিরোধিতা করতে ছাড়েন নি।'

ইন্দিরা আর ফিরোজ দুজনে তারপর চললো কাশ্মীর—মধু-যামিনী যাপন করতে। আর কাশ্মীর থেকে বাবার কথা মনে করে তাঁর কাছে কন্যা তার করলো : 'এখানকার কিছুটা সুশীতল হাওয়া তোমার কাছে পাঠালাম। গ্রহণ করো।'

পিতাও প্রত্যুত্তরে তার করলেন: 'ধন্যবাদ! ওখানে তোমরা হাওয়া খাচ্ছো, কিন্তু আম পাচ্ছ কোথায়?'

ইন্দিরা আম খেতে খুব ভালবাসতো। এলাহাবাদের সেরা আম। একবার ইন্দিরা যখন জেলে ছিল, নেহরু ইন্দিরার জন্যে এক ঝুড়ি আম পাঠিয়েছিলেন। সে ঝুড়িশুদ্ধ আম কিন্তু ইন্দিরার কাছে পৌঁছায়নি। জেল কর্তৃপক্ষরাই লোপাট করে দিয়েছিলো। তবে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব খুশী হয়ে খবরটা বন্দী ইন্দিরার নিকট পৌঁছে দিতে ভোলেননি। বলেছিলেন—আসামীর বাবা সাহেবের জন্যে যে আমগুলি পাঠিয়েছিলেন তা চমৎকার।

ইন্দিরা তো অবাক। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের জন্যে বাবা কেন আম পাঠাতে যাবেন! আর তার জন্যে যদি পাঠিয়ে থাকেন, তবে একটিও কি তার কাছে পৌঁছাল না?

৪ ডিসেম্বর ১৯৪১-এ জওহরলাল ছাড়া পান। আর ৭ ডিসেম্বর ফ্যাশিসত্ জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় মার্কিন নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার সহসা আক্রমণ করে বসলো। পরদিনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এশিয়ার রণাঙ্গনেও বিস্তৃত হয়ে পড়লো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধের বিস্তৃতি ভারত ভূখণ্ডকেও যুদ্ধের কাছাকাছি নিয়ে এল। জাপানী ঝটিকা বাহিনী ডাচ, ফরাসী ও বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে পরাজিত করে ভারতের মণিপুর সীমান্তে এসে উপস্থিত হলো। জাতীয় কংগ্রেস বৃটেনের এ দুর্দিনে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে কিছু স্বীকৃতি চেয়েছিলো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সদম্ভে ঘোষণা করলেন: তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে লাটে তুলতে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসেননি। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর স্বাধীনতা চতুষ্টয় এবং আটলান্টিক সনদের (১৪ আগস্ট ১৯৪১) অঙ্গীকারকে করা হোল উপেক্ষা। অবশ্য বৃটিশ জনমনের চাপে বৃটেনের যুদ্ধকালীন সরকার ভারতে বৃটেনের শ্রমিক সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে দিল্লীতে

আর খদ্দর ছেড়ে ধরলেন খাকী। দেখতে উনি ভালই ছিলেন। গায়ের রঙ সাহেবদের মতো কটা। কাজেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সৈন্য হিসেবে নিজেকে উনি চালিয়ে নিলেন নির্বিচারে।

বোম্বে থেকে একবার উনি আসছিলেন এলাহাবাদে। এলাহাবাদ তাঁর পরিচিত। সবাই তাঁকে চেনে। আত্মগোপন করেও যদি স্টেশনে কেউ তাঁকে দেখে ফেলেন এজন্য তিনি পথের ধারে ছোট্ট এক স্টেশনে নেমে পড়লেন। কিন্তু নেমে দেখেন গাড়ী ঘোড়া কোথাও কিছু নেই। তিনি তখন করলেন কি, বৃটিশ আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সৈন্যদের সঙ্গে মিশে গিয়ে ওদের ট্রাকে চেপে বসলেন। তারপর নিজ গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু পেঁৗছে পড়লেন মহা ফাঁপরে। গোরা সৈন্যরা কিছুতেই তাঁকে নামতে দেবে না। বললে:

'একা একা নিরস্ত্র পেলে তাঁকে 'নেটিভ'রা কেটে দু'টুকরো করে ফেলবে।'···

'স্বরাজ ভবন' মিলিটারী দখল করে নিয়েছিল। 'আনন্দ ভবনে'র পাশের দরজা থেকে আমরা দেখতাম একসার বন্দুকের বাঁট বাগানের দেওয়ালের আড়াআড়ি আমাদের দিকে তাক করে আছে যেন। চাকরবাকর অধিকাংশই গেঁয়ো মানুষ। ওদের ভয় পাবারই কথা। তার উপর আচমকা যখন শুনতে পেত:

'হল্ট। কৌন যাতা হ্যায়?'

তখন ওরা ঘাবড়িয়ে যেত। কি জবাব দেবে বুঝতে পারতো না।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রীজীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছিল। 'আনন্দ ভবনে' তিনি থাকবেন এটা কেউ সন্দেহ করবে না। এ ভেবেই তিনি গোপনে 'আনন্দ ভবনে' গিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে। সন্ধ্যে না হলে তিনি কক্ষনো তাঁর ঘর থেকে বেরুতেন না। লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে খাবার দাবার দেওয়া হতো। আমরা দেখাতাম আমাদের কোন আত্মীয় অসুস্থ হয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন 'আনন্দ

ভবনে।' এভাবে কিছুদিন যাবার পর শাস্ত্রীজীর খবর আর চাপা রইলো না। জানাজানি হয়ে গেল। তাছাড়া যে কোন সময় তল্লাসীর আশঙ্কাও রয়েছে। তাই শাস্ত্রীজী 'আনন্দ ভবন' ছেড়ে যান। আর কিছুদিন পরেই গ্রেফতার হন।'

চারিদিক থেকে আমাদের উপর কড়া পুলিশী নজর ছিল। কাজেই রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল একরূপ অসম্ভব। আমার স্বামীই ছিলেন একমাত্র যোগসূত্র যাঁর হাত দিয়ে আমি টাকা আর রাজনৈতিক বইপত্র অপরাপর আত্মগোপনকারী কর্মীদের নিকট পাচার করতাম। গোপনে অল্পক্ষণের জন্য মেলামেশারও ব্যবস্থা করতাম রাত্রিতে। যাঁরা রাজনীতি করেন না এমন বন্ধুদের বাড়ীতে গভীর রাত্রিতে আমাদের এ সাক্ষাৎকার হোত।

ইতিমধ্যে খবর পেলাম আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে। এতদিন পর্যন্ত আমি যতদূর সম্ভব নির্লিপ্ত থাকবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু জেলে যখন যেতে হবে তখন অমন ভীরুর মতোই বা যাই কেন? তাই আমি করলাম কি, তাড়াতাড়ি কিছু কাপড় চোপড় আর বই বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে কোথাও থাকবো বলে। বেলা পাঁচটায় এক জনসভা হবে বলে খবর পাওয়া গেল। পুলিশ তার আগেই সারা শহর ছেয়ে ফেলল। কেননা ওরা কোথায় মিটিং হবে তা খুঁজে ঠিক করতে পারলো না। নির্দিষ্ট সময়ে আমি ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলাম। আর দেখতে দেখতে সিনেমা হল, দোকান-পাতি এবং আশেপাশের বাড়ীঘর থেকে লোকজন বেরিয়ে এসে সবাই আমার চারপাশে জড়ো হলো।

মিনিট দশেক কাল আমি বক্তৃতা দিয়েছি, ঠিক এমন সময় ট্রাকভর্তি সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্যদল এসে আমাদের চারদিক ঘিরে ফেলল। আমার স্বামী সভায় যোগদান করবেন না বলে ঠিক ছিল। তবু কিন্তু তিনি পাশের এক বাড়ীর দোতলার জানালা থেকে শার্সি ফাঁক করে সব কিছু দেখছিলেন। যেই দেখলেন গোরা সৈন্যের দল আমার মাথা বরাবর সঙ্গীন খাড়া করে এগিয়ে আসছে তিনি তখন

সমূহ বিপদ আশঙ্কা করে ওখান থেকে চীৎকার করে উঠলেন। সার্জেণ্টের উদ্দেশে বললেন :

'বন্দুক নামাও! গুলি কর তো আমায় কর।'

তবু কিন্তু সার্জেণ্ট আমায় রেহাই দিলে না। আমার হাত ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে চললো পুলিশ ভ্যানের দিকে। ক্ষিপ্ত জনতাও প্রস্তুত ছিল। ওরা এগিয়ে এল। কংগ্রেসের মহিলা ভলান্টিয়াররা আমার আর এক হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিলে আমায় ছাড়াবার জন্যে। এদিকে, দু'দিকের টানা হেঁচড়ায় আমার তো প্রাণান্ত। যাই হোক পুলিশকে আর গুলি চালাতে হয়নি। তবে বন্দুকের কুঁদোর আঘাত অনেককে খেতে হলো। আমাদের অনেকেই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলো। তাঁদের মধ্যে ছেলে-মেয়ে অনেকেই ছিলেন। আমার স্বামীও। জেলের কথা আমার বিশেষ করে স্মরণ আছে। কেননা ভ্যানের মধ্যে পুলিশেরা আমার কথায় এমনই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো যে ওরা নিজেদের কাজের জন্যে আমাদের কাছে ক্ষমা চাইলো। মাথার পাগড়ী খুলে আমার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিলো। বললে :

'কি করবো বেটি, পেটের দায়ে এই নোকরি করতে হচ্ছে!'

খুব ছোটবেলা থেকে আমি জেল পরিদর্শন করে আসছি। জেলে গিয়েছি আমাদের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ইণ্টারভিউ করতে। সে ইণ্টারভিউ বিশ মিনিটের মধ্যে আচমকা শেষ হয়ে যেত। মুখের কথা হয়ত শেষই হতো না। লোকে জানে আমার মা-বাবা দীর্ঘকাল কারাগারে বন্দীদশা যাপন করছেন। কিন্তু ওঁরা কি জানেন আমার বাবা-মার আপন আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই দীর্ঘকাল কারাগারে দিনাতিপাত করেছেন।

বাইরে থেকে শোনা, দেখা আর প্রকৃত অভিজ্ঞতার মধ্যে কতখানি না ফারাক! যে কোন ব্যক্তি, যিনি কোনদিন কিছুক্ষণের জন্য হলেও কারাবাস করেছেন তিনি কারাগারের একান্ত নিঃসঙ্গতার

সম্মুখীন না হয়ে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে আমার অস্কার ওয়াইল্ডের কথা মনে পড়ে। তিনি লিখেছেন:

'প্রতিটি দিন যেন প্রতিটি বছর—এমন বছর যার দিনগুলি সব দীর্ঘ।'

একই ধাঁচে গড়া কারাগারের দিনগুলি। ঘৃণা আর ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞায় ভরা।

পেথিক লরেন্স তো বলেন:

বন্দী জীবনের প্রধান কথা হলো তাকে হীনমন্যতার মধ্যে দিন যাপন করতে হয়।

'জন্তু জানোয়ারের মতো গাদাগাদিভাবে পোরা হয় তাদের সেলের মধ্যে। মান মর্যাদার বা সংগোপনতার বালাই নেই কোথাও। বাইরের কারও সঙ্গ থেকে বর্জ্জিত। কোন খবরাখবর পাওয়া দূরে থাক—কোন প্রকার সৌন্দর্য, রঙ, কোমলতা বা নমনীয়তা থেকেও তারা হয় বঞ্চিত। মেঝে, চারদিকের দেয়াল, আশ-পাশের সবকিছুই মাটি রঙের। জেলে-কাচা কাপড়চোপড়ও তাই। এমন কি আমাদের যে খাবার দেওয়া হতো তাও বিস্বাদ, বিশুষ্ক।'

খোলা গরাদ দিয়ে ধূলি ঝড় আর 'লু' বইত। বর্ষায় জলের ঝাপটা আর শীতকালে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমাদের কষ্ট ছিল অবর্ণনীয়। সবাই মাসে একবার করে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি পেত। একবার কি দু'বার চিঠিও লিখতে পারতো। কিন্তু আমার ভাগ্যে তাও জোটেনি। কেন না আমার স্বামীও আমাদের সঙ্গে একই জেলে বন্দী ছিলেন। বিস্তর চেষ্টাচরিত্র করে অল্পক্ষণের জন্যে একবার সাক্ষাৎকারের ছাড়পত্র মিলল বটে কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই তাঁকে আর এক জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

আমি অবশ্য পড়াশুনার মধ্যে ব্যস্ত আর হাসিখুশি থাকতাম। আমি তো ছোট এক শিশুর দেখাশুনোর সব ভার নিজেই নিয়েছিলাম। ওর মাকে শিক্ষাও দিতাম যাতে ও জেল থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে।

বাইরের জগতের প্রতি আমার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। কেননা বাইরে আর আমার তেমন কেই বা আছে! তাছাড়া সাত বছর আমাদের জেলে থাকতে হবে বলা হয়েছিল। আমরা সব অপমান আর অবজ্ঞা হাসিমুখে বহন করার সংকল্প করলাম। অনেক ছবিই আজ মনে পড়ছে।

স্বাস্থ্যটা ভাল যাচ্ছিল না। জনসাধারণের উৎকণ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রেখে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল তাই সিভিল সার্জনকে পাঠিয়ে ছিলেন আমায় দেখবার জন্যে। তিনি আমায় পরীক্ষা করে টনিক ও বিশেষ পথ্যের ব্যবস্থাপত্র দেন। এর মধ্যে ওভালটিনও ছিল। সিভিল সার্জন যেতে না যেতেই জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ব্যবস্থা পত্রটি ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দিলেন মেঝের উপর।

বললেন :

'হুঁ, এসব তোমার মিলবে বলে যদি তুমি আশা করে থাকো তবে তুমি ভুল করেছো।'

আমি তো অবাক। বিশেষ পথ্য কিছুই আমি চাইনি। এমন কি সিভিল সার্জন দেখতে আসবেন তাও জানতাম না।

আর একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। রাত তখন অনেক। প্রাণান্তকর এক হিমেল আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল। এ আর্তনাদ জোহরার। আর্তনাদের কারণ হলো প্রকাণ্ড একটা কেউটে সাপ আমাদের গরাদের হাত কয়েক দূরে জড়িয়ে রয়েছে একটা তালাকে। এ তালাটাকেই খুলতে হবে জোহরাকে রাউণ্ডে এসে। জেনানা ওয়ার্ডারদের মধ্যে জোহরা ছিল সবচেয়ে পাজী। কেউ তাকে পছন্দ করতো না। কিন্তু তার এ চরম বিপদে আমরা সহানুভূতি না দেখিয়ে পারলাম না। কেউটের ছোবল খেয়ে প্রাণ হারানোর চাইতে তার প্রধান ভয় নোকরি হারানো। আমরা রয়েছি ব্যারাকের মধ্যে বন্দী। আর সে রয়েছে দেয়ালের বাইরে। হাতের কাছে কোন লাঠি বা অপর কোন অস্ত্রও নেই যে আত্মরক্ষা করবে।

জোহরার চীৎকার—কোন বার ভয়জড়িত আর্তনাদ, কোন বার বা

গলাফাটা কান্না, কোন বার সরোষে তর্জন-গর্জন এবং কোন বার বা কাতর কাকুতি-মিনতি—কোনটাই বাইরের সান্ত্রীমহলে সাড়া জাগালো না। ওরা ওখান থেকে শুধু জানতে চাইলে সাপটা এখন সঠিক কোথায় রয়েছে। কেমন দেখতে। লম্বায় ক'হাতই বা হবে। প্রস্থেও বা কতখানি। এমনি সবিশেষ বিবরণ।

তা শুনে জোহরার পিত্তি উঠলো জ্বলে। রেগে চীৎকার করে বলে উঠল :

'আরে আহাম্মকের দল! আমি কি সাপের মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত মাপবার জন্যে দর্জির গজ নিয়ে এসেছি নাকি এখানে ?'

গায়ের আড়ামোড়া ভেঙে উঠে মেট্রনকে খবর দিতে ওদের কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। মেট্রনের বাসা আবার বাইরে। অনেক দূরে। মেট্রনকে আবার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে গিয়ে জাগাতে হলো। এরপর লাঠিসোঁটা নিয়ে কারারক্ষীর দল যখন সাপ মারতে এল, তখন আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছি এবং ইত্যবসরে সাপটিও কখন সরে পড়েছে।

আর এক দিনের কথা বলি। সেবার কিন্তু সবাই পুড়ে মরার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম একটুর জন্যে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এলাহাবাদ ক্যাণ্টনমেণ্টে তখন কেবল বৃটিশ সৈন্য নয়, আমেরিকান আর ক্যানাডিয়ান সৈন্যও গিজগিজ করছে সেখানে। এক যুবক ক্যানাডিয়ান পাইলট আমাদের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সুন্দরী কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যুবক পাইলট রোজই একবার করে ওর বাড়ির উপর নিজের বিমান নিয়ে উড়ে যেত।

সেদিনও যাচ্ছিল। কিন্তু নিচু দিয়ে উড়ে যাবার সময় এক টেলিগ্রাফ পোস্টের সঙ্গে বিমানের পাখার সংঘর্ষ ঘটে। আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো আগুন। দেখলাম জ্বলন্ত বিমানটি তীব্রবেগে আমাদের দিকে নেমে আসছে। তারপর সেটা জেল প্রাচীরের বাইরে আধা-তৈরি একটা বাংলোর উপর ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়লো।

কত ঘটনাই তো গড়িয়ে গেছে। এটাও গেছে তেমনি। আমার

অপ্রত্যাশিত মুক্তিও এমনি এসে পড়ল সহসা। উত্তাল প্রাণবন্যায় আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। কত রঙ্, কত বর্ণচ্ছটা, শব্দতরঙ্গ, নব নব চিন্তারাজি। কেবল এতটুকু ছোঁয়া। কান পেতে একটু শোনা। বুঝি কোন নতুন অভিজ্ঞতা। চলমান জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতেই এতকাল কেটে গেল।…

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের 'রুদ্ধ কারার দিনগুলি'তেও ইন্দিরার কারাজীবনের নিবিড় আর এক চিত্র ফুটে উঠেছে।

ইন্দিরা নৈনী কারাগৃহে যখন এল, তার আগেই সে জেলে বড়পিসী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও বন্দী হয়ে এসেছিলেন। আগস্ট আন্দোলনের সময় তিনি 'আনন্দ ভবন' থেকে গ্রেপ্তার হন। তার কিছুদিন পরে তাঁর বড় মেয়ে লেখাও গ্রেপ্তার হয়। এবং আসে নৈনী জেলে। বিজয়লক্ষ্মী তাঁর স্মৃতিকথা 'রুদ্ধ কারার দিনগুলি'তে ('প্রিজন্ ডেজ') লিখেছেন :

১৩ সেপ্টেম্বর : ইন্দু লেখাকে তার ফরাসী পাঠে সাহায্য করছে।

২৩ সেপ্টেম্বর : ইন্দু গতকাল রাত্রে বাইরে ঘুমাবার অনুমতি পেল। কিন্তু তাহলেও রাতটা তার ভালোয় ভালোয় কাটেনি।

২৬ সেপ্টেম্বর : ইন্দুকে স্বাস্থ্যের অজুহাতে মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে বলে আমাদের জানানো হলো। তার জ্বর এখনও সারেনি।

২২ অক্টোবর : আজ সিভিল সার্জন ইন্দিরাকে দেখতে এসেছিলেন। তাকে পরীক্ষা করে তার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট সরকারের নিকট জানাবার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০ নভেম্বর : গতকাল ইন্দিরার ২৫-তম জন্মদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। ফিরোজের সঙ্গে তার পাক্ষিক সাক্ষাৎকারও ঘটেছে। জেল অফিস থেকে আসার পর তাকে খুব হাসিখুশি দেখা গেল।

২৭ নভেম্বর : ইন্দু আর লেখা দুজনের কল্পনাশক্তির তারিফ

করতে হয়। বিকালবেলাগুলি ওরা বেশ মজা করে কাটিয়ে দেয়। একঘেঁয়ে মনে হয় না। জেলের বেড়ালটির চারটি বাচ্চা হয়েছে। ইন্দু বেড়ালটির নাম রেখেছিল মেহিতাবেন। ওকে নিয়ে ইন্দু আর লেখা বেশ উত্তেজিত। লক-আপের পরে ইন্দু আর লেখা নাটক পড়ে থাকে। দুজনে তাতে অংশও নেয়। আমি ওদের শ্রোতা। ভারী মজা লাগে।

ইন্দিরার স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছিল সমানে। ১৩ মে '৪৩ সালে সে জেল থেকে ছাড়া পেল। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও সেদিন মুক্তিলাভ করেন। কোন সভাসমিতিতে যোগদান বা বক্তৃতা করা নিষিদ্ধ করে তাঁদের উপর এক আদেশ জারী করা হয়। কেউ তা মানলেন না। সপ্তাহখানেক পরে বিজয়লক্ষ্মী পুনরায় গ্রেপ্তার হলেন। জওহরলাল আহ্‌মেদনগর দুর্গে বন্দী। অসুস্থ ইন্দিরা এলাহাবাদে দারুণ গ্রীষ্মে আরো অসুস্থ হয়ে পড়বে আশঙ্কা করে তিনি ইন্দিরাকে কোন শৈলাবাসে গিয়ে বিশ্রাম নিতে লিখলেন। ইন্দিরা তাই বোম্বের কাছে পঞ্চগিনী শৈলাবাসে যাত্রা করল। স্বাস্থ্যও তার সেরে ওঠে অনেকটা। আগস্ট মাসের দিকে ফিরোজ গান্ধীও জেল থেকে ছাড়া পেল।

ইন্দিরা তখন এলাহাবাদে চলে আসে স্বামীর কাছে।

২০ আগস্ট ১৯৪৪ তাঁদের প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নবজাতকের নাম রাখা হয় রাজীব।

আর দ্বিতীয় সন্তান সঞ্জয়ের জন্ম ডিসেম্বর ১৯৪৬।

৮

এদিকে ইউরোপে যুদ্ধের গতি নিলো নতুন দিক। দুর্বার সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণের মুখে জার্মান বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। আবার মিত্রশক্তিও দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলে বসলো। পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে জার্মান নাৎসী বাহিনীর অবস্থা হয়ে উঠলো শোচনীয়। ৭ মে ১৯৪৫ নাৎসী জার্মানী পরাজয় স্বীকার করে নিলে।

বৃটিশ সরকার বন্দী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির আদেশ দিলে। জওহরলাল থেকে আরম্ভ করে সবাই ছাড়া পেলেন।

শুধু মুক্তি নয়। তখনকার বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সিমলায় এক বৈঠক ডাকলেন (জুন '৪৫)। আমন্ত্রণ জানালেন গান্ধীজী, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য আর মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের। এ বৈঠকে লর্ড ওয়াভেল সংখ্যায় বেশি ভারতীয় সদস্যদের নিয়ে এক একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব রাখলেন। এই কাউন্সিলের সব সদস্যই হবেন ভারতীয়। কেবল ভাইসরয় এবং প্রধান সেনাপতি থাকবেন বৃটিশ।

কোথায় ভারতের আরাধ্য স্বাধীনতা! পূর্ণ স্বরাজ? গণতন্ত্র? কিন্তু তা নয়। মুসলিম লীগ গোড়াতেই বেসুরো গাইতে শুরু করলে। মহম্মদ আলী জিন্না দাবি তুললেন ভাইসরয়ের নতুন কাউন্সিলের সকল মুসলিম সদস্যের নাম তিনি পেশ করবেন।

গান্ধীজী ও জওহরলাল এতে আপত্তি জানালেন। বললেন—তাতে আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ কংগ্রেসের সদস্য, অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা তালিকা থেকে বাদ পড়বেন। মৌলানা আজাদ তখন কংগ্রেসের সভাপতি।

একজিকিউটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের সমান সমান সদস্য থাকবে। কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের মধ্যে মুসলমান সদস্যসংখ্যাও অনেক। কংগ্রেস তাই দুজন কংগ্রেসী মুসলমান প্রতিনিধি পাঠাবার প্রস্তাব করলে। কিন্তু জিন্না আবদার করলেন—কাউন্সিলে মুসলিম প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার কংগ্রেসের নেই। রয়েছে একমাত্র মুসলিম লীগের। মুসলিম লীগই সকল মুসলমানদের নির্বাচিত করার একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

গান্ধীজী ও বড়লাট ওয়াভেল মিঃ জিন্নাকে মিটমাটের পথে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জিন্না সাহেবের ধনুকভাঙা পণ! তিনি কিছুতেই নিজের গোঁ ছাড়লেন না। সিমলা কনফারেন্সের ভরাডুবি ঘটলো।

[কৃষ্ণা হাতিসিং : 'উই নেহরুজ।' পৃঃ ১৭৬]

জিন্না ও তাঁর মুসলিম লীগ ধর্মভিত্তিক ভারতবিভাগের দাবি তুললেন। ভারতের মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে স্বতন্ত্র এক রাষ্ট্র গঠনের। পাকিস্তান রাষ্ট্রের। (পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ধুরন্ধর বৃটিশ আই. সি. এস. আমলাদের উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত। ধর্মের প্রতি জিন্না সাহেবের তেমন কোন মোহ ছিল না। মোহ শুধু ধর্মভিত্তিক নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি। তা হলে তিনি তার সর্বময় কর্তা হতে পারবেন। জিন্না তাই চাইলেন।)

বৃটিশ স্বার্থ নতুন করে জীইয়ে রাখবার জন্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' নীতির আশ্রয় নিলে। জিন্নাকে শিখণ্ডী খাড়া করলে। দেশের হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদকে চাঙ্গা করে তুললে নতুন করে। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন খড়কুটো আশ্রয় করে বাঁচবার বৃথা চেষ্টা করে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তেমনি হিন্দু-মুসলমান বিভেদ, সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের মধ্যে নতুন করে বাঁচতে চাইলে। টিকিয়ে রাখতে চাইলে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে।

এই বৃটিশ নীতির ফলে দেশে দেখা দিলো সাম্প্রদায়িক

অরাজকতা। হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্য। পরিণামে দাঙ্গা, খুন, অগ্নিসংযোগ আর নারী-নির্যাতন, অপহরণ।

দাঙ্গা-রাজনীতি অনুসরণের আর এক কারণ এ অনৈক্যের অজুহাতে বৃটিশরাজ নিজেদের শাসন আরও কিছুকাল বুঝি কায়েম রাখতে পারবে। এদিকে ইংলণ্ডে দ্রুত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন দেখা দিল। রক্ষণশীল চার্চিল সরকারের পতন ঘটলো। ২৬ জুলাই ১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি জয়লাভ করলো। ক্লেমেণ্ট অ্যাটলি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। অ্যাটলি সরকার ভারতে সংবিধান গঠনের জন্যে নির্বাচনের নির্দেশ দিলেন। এই সংবিধান গঠনের মারফত ভারত স্বায়ত্বশাসন লাভ করবে বলে জানালেন।

তাছাড়া এ ক্ষমতা হস্তান্তরের অন্যতম প্রধান কারণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন বিপুলায়তন আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন ও বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র মোকাবিলা। ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬-এর বোম্বাইয়ে নৌ-সেনাদের বিদ্রোহ ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত দিলে আরো নাড়িয়ে। জলের মতো একথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো— বৃটেনকে যদি ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন কায়েম রাখতে হয় তাহলে সামরিক শক্তির উপরে একান্তভাবে নির্ভর করতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে (আগষ্ট '৪৫) বৃটিশ সরকারের সে সমরশক্তি আর ছিল না। রণ-ক্লান্ত অতিকায় কোনো সরীসৃপের মতো নিজের ক্ষত নিজে তখন লেহন করছিল। বৃটেনের লেবার সরকার তাই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে সম্মত হলেন। মার্চ '৪৬ বৃটিশ সরকার দিল্লীতে পাঠালেন এক 'ক্যাবিনেট মিশন'। এই ক্যাবিনেট মিশন ভারতীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে স্বাধীনতার প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা করতে চাইলে।

কিন্তু এবারও কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের পরস্পর-বিরোধী দাবি তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। জাতীয় কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত বিভাগের আপত্তি জানালো।

তখন ক্যাবিনেট মিশন আপন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলো। প্রস্তাব করলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের। এবং সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতের জন্য কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী ডাকার। এ প্রস্তাব মারফত ফেডারেল ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হলো। আর এ ফেডারেল ইউনিয়নে যে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে তাতে থাকবে সমান সমান হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নিয়ে বৈঠকে মিলিত হলো। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করলে পর ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব তখন মেনে নিলো। বোম্বাইয়ে ৭ জুলাই এ পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসলো। কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট তখন জওহরলাল। ১২ আগস্ট তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানো হলো।

মুসলিম লীগ জুন মাসে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তা কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নিলে মহম্মদ আলী জিন্না বেসুরো গাইতে শুরু করলেন। তিনি আগেকার যে প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন তা এবার প্রত্যাহার করলেন। ২৭ জুলাই মুসলিম লীগের আহূত সভায় তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করলেন। জিন্না জ্বালাময় বক্তৃতা মারফত হিন্দু মুসলীম সম্পর্ক আরও তিক্ত, বিষময় করে তুললেন। লীগ 'ডিরেক্ট অ্যাকশন' কার্যক্রম গ্রহণ করলো। আর ১৬ আগষ্ট '৪৬-এ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন ঠিক হলো। 'ডিরেক্ট অ্যাকশন':

'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান!'

বাংলাদেশে তখন শহীদ সুরাবর্দী মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা কায়েম। আর এ বাংলাদেশেই প্রথম মুসলীম লীগ ডিরেক্ট অ্যাকশন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করলো ১৬ আগস্ট ১৯৪৬। জিন্না সাহেবের কথায়:

'আমরা পিস্তল বাগিয়ে ধরেছি। পাকিস্তান লাভ করতে এটাকে কাজে লাগাতে পারি।'

১৬ আগস্ট তারিখে মহানগরী কলকাতায় শুরু হলো ঘোরতর অরাজকতা। খুন, হত্যালীলা। অগ্নিসংযোগ ও নারী-নির্যাতন চললো অবলীলাক্রমে। কলকাতার রাজপথ আবাল-বৃদ্ধবনিতার তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠলো। কাতারে কাতারে মারা গেল নিরীহ হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশী। হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমান আর মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে লেলিয়ে দেওয়া হলো অন্ধ আক্রোশে। শাসক ইংরেজ সাক্ষীগোপালের মতো এ তাজা খুন দেখতে লাগলো। গোপনে ইন্ধন যোগালে। উস্কানিও।

কলকাতার প্রতিক্রিয়া নোয়াখালিতে। নোয়াখালির আগুন ছড়িয়ে পড়ল অন্যত্র। বিহার, পাঞ্জাব, দিল্লী আরোও অনেক জায়গায়।

সত্য ও অহিংসার অগ্রদূত গান্ধীজী স্থির থাকতে পারলেন না এ আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে। তিনি নোয়াখালি যাত্রা করলেন। পদব্রজে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দাঙ্গাবিধ্বস্ত মানবাত্মার সাহায্যকল্পে। জিন্না আর বড়লাট ওয়াভেল সম্রাট নীরোর মতো নির্বিকার নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন। গান্ধীজী কিন্তু এ খুন বন্ধের জন্য শুরু করলেন অনশন। জওহরলালও নিজের জীবন বিপন্ন করে দিল্লীর উপদ্রুত এলাকায় টহল দিতে লাগলেন। ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে খুনীর হাত থেকে রুধিরাক্ত ছোরা ছিনিয়ে নিতেও তিনি ইতস্ততঃ করেননি।

ইন্দিরার শরীর ভাল যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় সন্তান সঞ্জয় ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে শরীর তাঁর খুবই ভেঙে পড়েছিলো। তবু গান্ধীজীর নির্দেশে ইন্দিরা দিল্লীর দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় গিয়ে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ফিরিয়ে আনার জন্যে সচেষ্ট হন। বিপন্ন মুসলিম পরিবারকে গাড়ি করে নিয়ে এসে আশ্রয় দিতেও ভোলেন না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সমানে পাল্লা দিয়ে চললো। শুধু

খুনখারাপি নয়, নিরীহ মানুষের হত্যাকাণ্ড। দেখা দিল হিন্দু-মুসলমান শরণার্থী সমস্যাও।

১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে লর্ড ওয়াভেলের জায়গায় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের শেষ বড়লাট ও ভাইসরয় নিযুক্ত হন। অ্যাটলি সরকার ১৯৪৮ সাল নাগাদ ভারত থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিদায় নেবার কথা ঘোষণা করলেন

৩ জুন '৪৭ লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারত বিভাগের পরিকল্পনার কথা জানালেন। ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের মধ্যে অখণ্ড ভারত ভেঙে দুখান হবে এবার। ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হবে বিশেষ করে হিন্দুপ্রধান অঞ্চল নিয়ে। আর পাকিস্তান প্রধানতঃ মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চল নিয়ে।

মুসলিম লীগ এতদিন ধরে ভারত বিভাগের হয়ে আন্দোলন করছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। কাজেই মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান ওরা মেনে নিলে সঙ্গে সঙ্গে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিকট তখন উভয় সংকট।

জওহরলাল ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেখলেন ভারত বিভাগ একরূপ 'নির্ধারিত সত্য'। কাজেই শান্তি ও দেশের স্বাধীনতার জন্য তাকে মেনে নেওয়াই ভাল। গান্ধীজীর আপত্তি সত্ত্বেও ভারত বিভাগ কংগ্রেস গ্রহণ করলো। র‍্যাটক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী বাংলা ও পাঞ্জাব ভেঙে দুখান হলো। গড়ে উঠলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান।

১৮ জুলাই তারিখে বৃটিশ শাসন অবসানে পার্লামেণ্টের বিশেষ আইনটি পাশ হলো। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ ক্ষমতা সম্পূর্ণ হস্তান্তরিত হবে ঘোষিত হলো।

বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই ১৫ আগস্ট এবার এসে গেলো। দিল্লীর সংসদ ভবনে, লালকেল্লায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড্ডীন হলো। জন্ম নিলো ভারতীয় ইউনিয়ন।

'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা' ব্যর্থ হল না!

ভারত বিভাগ হলো বটে কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসংবাদের

অবসান হলো না। নিরীহ হিন্দু-মুসলমানের, তাজা খুনের শরণার্থী আগমনের। গান্ধীজী তাই অনশনের সংকল্প নিলেন। বললেন:

'আমার কথায় যদি কেউ কান না দেয়, আমার অনশনে কাজ দেবে।'

হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক খুন বন্ধের জন্য তিনি আমরণ অনশনের কথা ঘোষণা করলেন।

গান্ধীজীর এ সংকল্পে কাজ দিলো। উভয় সম্প্রদায় ও নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক শান্তি ও ঐক্য ফিরিয়ে আনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

কিন্তু চরম মূল্য দিতে হলো এর জন্য গান্ধীজীকে।

গান্ধীজী তখন দিল্লীর বিড়লা ভবনে।

৩০ জানুয়ারী বিকেলবেলা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ডেকে কংগ্রেস নেতাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে বলে তিনি প্রার্থনা সভায় যাচ্ছিলেন। সঙ্গে আভা গান্ধী ও মানু। তাঁর নিত্য সহচর। এ সময় ভিড় ঠেলে খাকি পোশাক-পরা একটা লোক এগিয়ে এল। লোকটা যেন একটু নত হয়ে গান্ধীজীকে অভিবাদন করলো। তারপর পিস্তল বের করে গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। পর পর তিনটি। গান্ধীজী পড়ে গেলেন। অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন: 'হা রাম'!

সেদিন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জাতির জনক গান্ধীজীর স্মৃতি তর্পণ করলেন এক বেতার ভাষণে। বললেন:

'আমাদের জীবন থেকে আলো নির্বাপিত এবং সর্বত্র অন্ধকার।··· আমাদের প্রিয় নেতা, যাঁকে আমরা বাপুজী বলে ডাকতাম, আমাদের জাতির জনক আমাদের মধ্যে আর নেই।···

'আলো নির্বাপিত আমি বলেছি। কিন্তু আমি ভুল বলেছি। কারণ যে আলো এ দেশে জ্বলেছিল তা সাধারণ আলো নয়। এতদিন সে আলো এ দেশকে আলোকিত করেছে, সে আলো এ দেশকে আরো অনেক বছর ধরে আলোকিত করবে।

সহস্র বৎসর পরেও সে আলো এদেশে দেখা যাবে এবং সারা পৃথিবী তা দেখতে পাবে। অসংখ্য মানবহৃদয়কে সে আলো শান্তি দেবে।…'

গান্ধীজীর মৃত্যুর ঠিক আগের দিনকার একটি করুণ ঘটনা। কৃষ্ণা হাতিসিং তাঁর 'ডিয়ার টু বিহোল্ড্' গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

২৯ জানুয়ারী দুপুরে তিনি সরোজিনী নাইডুর কন্যা পদ্মজা নাইডু (ইনি পরে অনেক কাল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন), ইন্দিরা ও তাঁর শিশুপুত্র রাজীবকে নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যান। গান্ধীজী তখন নোয়াখালির এক চাষীর দেওয়া টোকা মাথায় দিয়ে বাগানে বসে তাঁর দুপুরবেলার খাবার শাকসবজি সেদ্ধ খাচ্ছিলেন। ইন্দিরাদের দেখে গান্ধীজী বলে উঠলেন:

'কি, টুপি মাথায় আমায় ভালো দেখাচ্ছে না?'

সবাই হেসে উঠলো। গান্ধীজীর পায়ের কাছে সবাই তখন বসে পড়লো। সাম্প্রতিক অনশনের পর নগ্নদেহ গান্ধীজীকে সুস্থই দেখাচ্ছিল। তিনি সকলের খবরাখবর কুশলবার্তা জেনে নিচ্ছিলেন।

রাজীব তখন মাত্র চার বছরের। কোত্থেকে সে একটা ফুলের মালা কুড়িয়ে এনে গান্ধীজীর পায়ের উপর রাখলে। গান্ধীজী তা লক্ষ্য করলেন। রাজীবের কানটা সস্নেহে একটু টেনে দিয়ে বলে উঠলেন:

'জানিস না ভাই, জ্যান্ত মানুষের পায়ে ফুলের মালা পরাতে নেই?'

ছোট শিশু অত শত জানে না। অত সব নীতিজ্ঞান, সংস্কারবোধ তখন হয়নি তার।

কৃষ্ণা হাতিসিং ফুলগুলি গান্ধীজীর পা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিলেন। আর তার পরের দিনই তো সেই ৩০ জানুয়ারী! শোকাবহ দিন! খুনী নাথুরাম গডসের হাতে গান্ধীজীর মৃত্যু।

৯

২৬ জানুয়ারী ১৯৫০।

স্বাধীন সার্বভৌম ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো।

প্রজাতন্ত্রী ভারত কিন্তু বৃটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস্ থেকে বেরিয়ে এল না। বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর সভ্য থেকে গেল। গাঁটছড়ার মায়া কাটাতে পারল না।

অকটোবর '৪৯ সালে জওহরলাল আর ইন্দিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাত্রা করলেন। এ তাঁদের প্রথম যাত্রা আমেরিকায়। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সম্মানিত অতিথি হিসাবে বিশেষ নিমন্ত্রণ। লণ্ডন থেকে প্রেসিডেণ্টের বিমানে যাত্রা।

ছোটপিসী কৃষ্ণা হাতিসিংও তাঁর ছেলেদের নিয়ে আমেরিকায়। নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। এদিকে জওহরলাল সরকারী আলাপ-আলোচনায়, অনুষ্ঠানে সারাদিন ব্যস্ত। ইন্দিরা ফাঁক পেলেই ওয়াশিংটন বা নিউ ইয়র্কে বেরিয়ে পড়তেন পিসীর সঙ্গে। ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স-এ ঘুরে ঘুরে কিছু কেনাকাটা। বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে দিতেন আর্ট গ্যালারী আর মিউজিয়ামে। দু'একবার নাইট ক্লাবেও। নাচ ভালোবাসলেও ওঁরা নাইট ক্লাবের নাচে যোগ দেননি। খানাপিনা করেই শুধু ফিরতেন। থিয়েটার দেখেও বেড়িয়েছেন। বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেছেন। পরিচিত হতে চেয়েছেন আমেরিকার জনজীবনের সঙ্গে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্দিরার এ প্রথম পরিদর্শন। তারপর অবশ্য তাঁকে বহুবার আমেরিকা সফরে যেতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবেও। সে কথা পরে। এখন নয়।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের সরকারী বাসভবন ছিল প্রথমে সতেরো

নম্বর ইয়র্ক রোড। সরকারী এ বাসভবনটি আয়তনে ছিল ক্ষুদ্র। প্রধানমন্ত্রীর কাজকর্ম চালাবার স্থান সঙ্কুলান হতো না। তাছাড়া 'বিড়লা ভবনে'র হত্যাকাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্নও দেখা দিল। কাজেই মাউণ্টব্যাটেনের তদ্‌বিরে বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের প্রাসাদোপম বাসভবনটি প্রধানমন্ত্রীর আবাসে পরিণত হলো। এটাই পরে 'তিন মূর্তি' ভবনে রূপান্তরিত হয়।

১৯৫০ সালে ইন্দিরা বাবার এ বিরাট বাস ভবনে পদার্পণ করেছিলেন প্রথম ওটাকে গুছিয়ে-গাছিয়ে ফিটফাট করার উদ্দেশে। কিন্তু কালক্রমে পিতৃগৃহ এ 'তিন মূর্তি' ভবনই তাঁর পরবর্তীকালের বাস ভবনে পরিণত হবে শ্রীমতী ইন্দিরা কি তা সেদিন জানতেন? প্রধানমন্ত্রীর অফিসিয়াল হোস্টেজ হতে হবে তাঁকে?

ফিরোজ গান্ধী তখন লক্ষ্ণৌয়ে। 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর। ওখানে সংসার পেতেছেন স্ত্রী, দুই শিশুপুত্র নিয়ে। ছোট্ট ছিমছাম বাড়ি। খানিকটা বাগান, গৃহকর্ত্রীর শোভন রুচির ছাপ। বস্তুত বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে স্বামী স্ত্রী দুজনে কারাবরণ করলেও ১৯৪৪-৪৬ সাল, এ দু-বছর ছিল ওদের জীবনের মধু মাস। মধু বছর। কিন্তু তাতে ছেদ পড়ল।

'তিন মূর্তি' ভবনের টান উপেক্ষা করা ইন্দিরার সম্ভব হলো না। মা নেই। পিতার ব্যক্তিগত খাওয়া-পরা, সুখ-সুবিধার তদারক করা ছাড়াও তাঁর সরকারী কাজের ফাইল, চিঠিপত্র ঠিকঠাক করে রাখার দায়িত্ব নিতে হলো অনেকটা। বাবার একান্ত সচিবের কাজ। কাজের চাপে জওহরলাল অনেক সময় খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে যেতেন। ইন্দিরাকে এসে বাবাকে খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে হতো। চাকরবাকরেরা কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পেত না। তাছাড়া, গুরুতর কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে বিশ্বস্ত কারো সঙ্গে আলোচনা করা ছিল নেহরুর চিরদিনের অভ্যাস। গান্ধীজী যতদিন ছিলেন, নেহরু গান্ধীজীর পরামর্শই নিতেন। গান্ধীজীর পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের। প্যাটেলের পর রফি আহমেদ

কিদোয়াই। এবং তাঁর পর মেয়ে ইন্দিরার মতামত চাইতে তিনি ভুলতেন না। ইন্দিরাকে তাই বাবার আশেপাশে ছায়ার মতো থাকতে হতো সব সময়। আগলে থাকতে হতো বুঝি অনেকটা মহাব্যস্ত অসহায় বৃদ্ধ এ শিশুটিকে! তাছাড়া 'তিন মূর্তি' ভবনে অতিথি সমাগমের ছেদ নেই। দেশবিদেশের বিশিষ্ট অমাত্যবর্গ দিল্লীতে তো হামেশা যাওয়া আসা করতেন। এর মধ্যে রয়েছেন প্রেসিডেণ্ট টিটো, ক্রুশ্চেভ, বুলগানিন, চৌ এন-লাই, নাসের, এলিনর রুজভেল্ট, জোসেফ কেনেডি, প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ প্রমুখ অনেকে। প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে তাঁদের আদর-আপ্যায়নের ভার ইন্দিরাকে নিতে হতো। কাজেই দিল্লীতেই ইন্দিরাকে সব সময় হতো কাটাতে।

তবু ইন্দিরা যখনই সময় পেয়েছেন ছেলেদের নিয়ে লক্ষ্ণৌ চলে গেছেন ফিরোজের কাছে। ফিরোজ গান্ধী আপত্তি তুলেছেন। দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌ কম দূর নয়। ২৭০ মাইলের মতো। অতখানি পথ ছেলেদের নিয়ে ছোটাছুটি না করাই ভাল। তার চাইতে ফিরোজই বরং দিল্লী গিয়ে দুদিন কাটিয়ে আসবেন। তাই জানালেন।

তাই ঠিক হলো। ইন্দিরা ছোট বেলায় মা বাবার কাছে কাছে থাকবার সুযোগ পাননি। কেননা কমলা ও জওহরলালকে তখন জেলে জেলে কাটাতে হয়েছে। কাজেই ইন্দিরাকে অনেকটা নিঃসঙ্গভাবে যাপন করতে হতো দাসদাসীর হেপাজতে। আপন সন্তানের বেলায় যেন আর তা না ঘটে। নিজে তাই রাজীব ও সঞ্জয়ের তদারকের ভার ব্যক্তিগতভাবে নিতে ভুললেন না। যতখানি সম্ভব নিজের হাতে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দিতেন। খেলাধুলাও করতেন একসঙ্গে। শিশু চলচ্চিত্র কোথাও দেখানো হলে নিয়ে যেতেন। ছেলে রাজীব ও সঞ্জয় মাকে যেমন ভালবাসতো বাবাকেও তেমনি। ফিরোজও ছেলেদের জন্যে নিজের হাতে তৈরি নানা খেলনা নিয়ে আসতেন। ছেলেরা ভবিষ্যতে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে উঠুক তেমনি করে গড়ে তুলতে

চেয়েছিলেন। (উত্তরকালে পিতার এ আশা পূর্ণ হয়েছে। তিনি অবশ্য তা আর দেখে যেতে পারেন নি।)

১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফিরোজ গান্ধী কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে বেরিলি কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন বিপুল ভোটাধিক্যে। কাজেই তাঁকে 'ন্যাশন্যাল হেরাল্ডে'র ম্যানেজিং এডিটরের পদে ইস্তফা দিয়ে দিল্লীতে চলে আসতে হলো।

প্রথমে অবশ্য ফিরোজ গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর 'তিন মূর্তি' ভবনে এসে উঠলেন। শুধু ইন্দিরা নয়, ছেলেরাও তখন দিল্লীতে। প্রধানমন্ত্রীর জামাতা হিসেবে ফিরোজ গান্ধীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেল নতুন ভাবে। আনুষ্ঠানিক খানাপিনা। নিত্য নতুন অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। দৈনন্দিন জীবনে অনেকটা বোঝা হয়ে দাঁড়াল এসব।

ফিরোজ গান্ধী দুদিনেই হাঁপিয়ে উঠলেন। আপন স্বাতন্ত্র্য বোধে কোথায় যেন চিড় ধরলো। কেমন যেন বাধলো। পত্নী ইন্দিরার সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এম.পি.-দের সরকারী কোয়ার্টারে উঠে এলেন। ছোট্ট বাড়ী। স্বতন্ত্র আবাসস্থল। আপন মনে তিনি তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিলেন। ফুলের বাগান করতে ভালোবাসতেন ফিরোজ গান্ধী। এম.পি.-দের কোয়ার্টারের ছোট্ট জমিটুকুতেও গাছপালা পুঁততে ভুললেন না। ফুলে ফুলে তাকে সুশোভিত করে তুললেন নিজ হাতে। লক্ষ্ণৌ থেকে নিজের সৌখিন আসবাবপত্রগুলিও আনিয়ে নিলেন।

পৃথক বাসভবনে অবস্থান করলেও জামাতা ফিরোজ 'তিন মূর্তি' ভবনে এসে উপস্থিত থাকতেন ব্রেকফাস্ট টেবিলে। পুত্রদের সঙ্গে প্রাতঃরাশ সমাপন করতেন।

কিন্তু বেশিদিন এভাবে গেল না গড়িয়ে। ছেলেরা পড়াশুনার জন্যে দেরাদুনের এক স্কুলে চলে গেল। পত্নী ইন্দিরাও জওহরলালের সঙ্গে আজ এখানে কাল ওখানে। পরের দিন হয়তো বাইরে কোথাও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ফিরোজ গান্ধী তখন একাই দিল্লীতে। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি, বাদবিসংবাদ শুরু হওয়াই স্বাভাবিক।

তাই হলো। ফিরোজ একদিন কথাটা ইন্দিরার কাছে পাড়লেন।

ইন্দিরা মুখের উপর খেঁকিয়ে উঠলেন। শুনিয়ে দিলেন :

'আমি শুধু তোমার বিয়ে-করা বউ নই। ছেলের মাও।' তারপর ঠোঁট উল্টে জবাব দিলেন :

'বাবার দেখাশুনাও আমাকে করতে হয়। তাছাড়া তাঁর নানান কাজের তদারকও। হাতের কাছে সবকিছু গোছানো না পেলে রেগে গিয়ে উনি বাড়ি মাত করবেন।'

'আগে তো ঘরের বউ। তারপর তো দেশের কাজ।' ফিরোজও উত্তর দিলেন সমান গলায়।

'তা ঠিক, এখন আমাকে তুমি কি করতে বলো? এদিকেও তো সব দেখাশুনা করতে হবে?'

ইন্দিরা গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

পেছনে নেতিয়ে-পড়া পুরু পরদাখানির দিকে চোখ দুটি তুলে ফিরোজ তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাসও বুঝি ঝরে পড়ল তাঁর বুক থেকে।

নিজেকে তারপর ডুবিয়ে দিলেন ফিরোজ সংসদীয় কাজের মধ্যে। এতদিন তিনি ছিলেন কংগ্রেসী সংসদ সদস্যদলের ভিতরে ব্যাক বেঞ্চার। এবার এগিয়ে এলেন প্রথম সারিতে। ডালমিয়া জৈন শিল্পগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানী বুঝি তাদের তহবিলের অপপ্রয়োগ করেছিলো। তিনি তাই ডালমিয়া জৈন ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের অসাধু ব্যাবসার লেনদেনের মুখোশ দিলেন খসিয়ে। ফলে রামকৃষ্ণ ডালমিয়া গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘদিন তাঁর সাজাও হয়। শুধু তাই নয়, ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের কার্য-কলাপের অনুসন্ধানের জন্যও কমিশন বসে। এবং ফলে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান হয় রাষ্ট্রীকৃত। বিড়লা প্রমুখ বৃহৎ শিল্পপতিরা প্রধানমন্ত্রীর জামাতাকে দিয়ে চতুরতার সঙ্গে ডালমিয়া নিধনযজ্ঞ বুঝি সম্পন্ন করে নিলেন। মৎস্যন্যায়নীতি!

এবার পালা নবীন আর এক শিল্পপতির। তরুণ উচ্চাভিলাসী

হরিদাস মুন্দ্রার বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হলো। বিপুল তথ্য, অকাট্য যুক্তি ও ক্ষুরধার বুদ্ধির সমন্বয়ে ফিরোজ উত্থাপন করলেন শিল্পপতি হরিদাস মুন্দ্রার মামলা। লোকসভায় অভিযোগ আনলেন রাষ্ট্রীকৃত লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন হরিদাস মুন্দ্রাকে বিপুল ঋণ দিয়েছে অসঙ্গত উপায়ে। লাইফ ইনসিওরেন্স রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। প্রাইভেট সেকটরের আয়ত্তাধীন। তাতে দুর্নীতি! সুতরাং পার্লামেন্টে হৈ-চৈ পড়ে গেল। নেহরু মন্ত্রিসভার অর্থসচিব তখন টি. টি. কৃষ্ণমাচারী। জওহরলালের বিশ্বস্ত সহযোগী। তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ!

নেহরু রীতিমত অপ্রস্তুত। পার্লামেন্টের চাপে তদন্ত কমিশন গঠিত হলো। আর তার নেতৃত্ব করলেন বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীএম. সি. চাগলা। চাগলা তদন্ত কমিশনের রায় মুন্দ্রার বিরুদ্ধে গেল। ডালমিয়ার মতো হরিদাস মুন্দ্রাও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন দীর্ঘকাল। শ্রীকৃষ্ণমাচারীও বাধ্য হন পদত্যাগ করতে।

ফিরোজ এটা চান নি। সরকারী প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির মুখোশ খসিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অর্থসচিবের পদত্যাগ তিনি কামনা করেননি। কিংবা চাননি শ্বশুরমশাইকে অপ্রস্তুত করতে। দেশবিদেশে নাম তাঁর ছড়িয়ে পড়ল। জাতীয় নেতা রাতারাতি। কিন্তু ফিরোজ এ জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। অনেকটা স্বগত ভাবে বলে উঠেছিলেন :

'আরে, কহাঁ মারা, কহাঁ লগা!'

আরে, মারলাম কাকে, লাগলো কাকে?

সুবক্তা ও নির্ভীক প্রবক্তা হিসেবে ফিরোজ গান্ধী প্রতিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু ডালমিয়া ও মুন্দ্রার তদন্ত ব্যাপারে ফিরোজ গান্ধীকে দীর্ঘ দিন ধরে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হল। পাকা পার্লামেণ্টারিয়ানের মতো নিজের ভাষণ তৈরি করতে হয়েছে। অনেক সময় ভুলে থাকতে হয়েছে আহার নিদ্রার কথা।

ফিরোজের শরীর ভেঙে পড়ল। দেখাশুনা করার কেউ

বিশেষ নেই। ইন্দিরা সময় করে স্বামীর কাছে ছুটে আসতে পারেন না সব সময়। খাওয়া-দাওয়া দেখাশুনা করা হয়ে ওঠে না। ফিরোজ পৃথকভাবে এম. পি.-দের কোয়ার্টারে থাকার দরুন পাঁচজনে পাঁচকথা চুপিসারে বলাবলি করতে শুরু করলো। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে বলে ইঙ্গিত করতেও ছাড়লো না। কোন কোন মার্কিন সাংবাদিক তো প্রকাশ্যে মন্তব্য করতেও ছাড়লেন না যে, 'ফিরোজ ইন্দিরার প্রতি আর বিশ্বস্ত নন।' (Welles Hangen : '*After Nehru, Who?*')

এমন কি হিন্দু-বিবাহ বিলে যে বিবাহ বিচ্ছেদের ধারা রয়েছে তা ইন্দিরার জন্য বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে কয়েকটি স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল ইঙ্গিত করতেও কসুর করলে না।

ফিরোজ সহসা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হৃদরোগে আক্রান্ত। ইন্দিরা তখন রাজনৈতিক কাজে নেপালে। দিল্লী থেকে বহু দূরে। তবু স্বামীর অসুখের খবর পেয়ে রাজধানীতে ছুটে এলেন তাড়াহুড়ো করে। নার্সিং হোমে স্বামীর সেবাশুশ্রূষার সব ভার তুলে নিলেন নিজের হাতে। ইন্দিরার আদর যত্নে ফিরোজ সুস্থ হয়ে উঠলেন। প্রথম আক্রমণ। ফিরোজ টাল সামলে নিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মেনন ফিরোজকেও ইন্দিরার মতো স্নেহের চোখে দেখতেন। লণ্ডনে এ দুই তরুণ-তরুণীকে তিনি সমাজতন্ত্রবাদে পাঠ দিয়েছেন। হাতে কলমে গড়ে তুলেছেন দুজনকে। বস্তুতঃ ইন্দিরা যদি তাঁর ঠাকুরদার কোলে বসে শিশুকালে রাজনৈতিক শিক্ষা পেয়ে থাকেন এবং একটু বড়ো হয়ে বাবার কাছে ইতিহাসের প্রথম পাঠ নিয়ে থাকেন আর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নিকট শিল্প-সত্তার অনুশীলন, তবে লণ্ডনে শ্রীকৃষ্ণ মেননের কাছে ঘটে তাঁর সত্যিকারের দীক্ষা বাস্তব রাজনীতির। শ্রীকৃষ্ণ মেননকে তাই দু'জনে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমীহের চোখে দেখতেন।

শ্রীকৃষ্ণ মেনন উদ্যোগী হয়ে ছেলেদের নিয়ে ইন্দিরার কাশ্মীরে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক পরিবেশে পুত্র ও পত্নীর সাহচর্যে ফিরোজ অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। মধুর দিনগুলি বুঝি আবার ফিরে এল। পুনর্মিলন!

কিন্তু 'ত্রিমূর্তি ভবনে'র টানে ইন্দিরা বেশিদিন আর থাকতে পারলেন না। রাজধানীতে ফিরে আসতে হলো।

ফিরোজ আবার নতুন করে জনজীবনের মধ্যে ডুবে গেলেন। মুন্দ্রা ঘটনায় ফিরোজের জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিল। রাজধানীর সাধারণ মানুষ বিশেষ করে টাঙ্গাওয়ালা, গাড়িওয়ালা, দুধওয়ালা, মুটে-মজুর, নিচুতলার লোক অনেকেই জামাতা ফিরোজকে আপনজন বলে মনে করতো। তাদের নানা অভাব অভিযোগের কথা জানাতেও কসুর করতো না। ফিরোজ গান্ধীও তাদের সে সব অভাব অভিযোগের কথা কান পেতে শুনতেন। যথাযত বিহিতের চেষ্টা করতেন। ফলে মানসিক উত্তেজনা উদ্‌বেগ তাঁর বাড়ল বই কমল না।

২ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ ফিরোজ হঠাৎ বুকে যন্ত্রণা অনুভব করলেন। তবু লোকসভার অধিবেশনে যোগ দিলেন ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে। পাঁচদিন পরে বুকের ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠল। ফিরোজ টেলিফোনে ডাক্তারের সঙ্গে কি যেন আলোচনা করলেন। তারপর নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে রওনা হলেন নার্সিং হোম অভিমুখে। নার্সিং হোমে পৌঁছেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। হৃদরোগ। দ্বিতীয় আক্রমণ। শুধু ছটফট। অসহ্য যন্ত্রণা! আর বারবার অস্থির প্রশ্ন:

'কই, ইন্দু এখনো এলো না? ইন্দুকে কেউ খবর দাওনি?'

ইন্দিরা তখন কেরলে। কংগ্রেসের কাজে ব্যস্ত। তারবার্তা পেয়ে ইন্দিরা সেদিনই রাজধানীতে ছুটে এলেন। রাত্রের দিকে ফিরোজের অবস্থা খারাপের দিকে গেলো। ইন্দিরা সারারাত জেগে স্বামীর শয্যাপাশে বসে কাটালেন। শেষ রাত্রে ইন্দিরার

একখানি হাত চেপে ধরলেন ফিরোজ। তারপর তাঁর কোলে মাথা রেখে ত্যাগ করলেন শেষ নিঃশ্বাস (৮ সেপ্টেম্বর '৬০)।

রাজীব ও সঞ্জয় দেরাদুনের স্কুল থেকে এসে পড়লো। ফিরোজরা পার্শী। পার্শীদের মৃতদেহকে 'টাওয়ার অব সাইলেন্সে' নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ফিরোজ তাঁর মরদেহকে দাহ করবার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। কাজেই ফিরোজের দেহ দাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। আর রাজীব পিতার মুখাগ্নি-ক্রিয়া সম্পন্ন করল। দিল্লীর হাজার হাজার মেহনতি মানুষ শবানুগমন করল।

.ইন্দিরা ভেঙে পড়লেন। সারাদিন আপন ঘরে নিজেকে বন্দী করে রাখলেন। আর একক নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিজের নিদারুণ শোক ভুলবার চেষ্টা করলেন।

জওহরলাল জামাতা ফিরোজকে খুব একটা সুনজরে দেখতে না পারলেও অপ্রত্যাশিত এ শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে অপলকে তিনি তাকিয়ে রইলেন স্থিরভাবে। বোন কৃষ্ণা হাতিসিংকে দেখতে পেয়ে ধরা গলায় বলে উঠলেন :

'আহা, এত তাড়াতাড়ি যে ও মারা যাবে আমি ভাবতেই পারি নি। ছেলেমানুষ। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়স। খালি ইন্দুর কথা বারবার জিজ্ঞেস করছিল।'

ইন্দিরার বয়স তখন তেতাল্লিশ। এরই মধ্যে তাঁকে বৈধব্যদশা বরণ করতে হলো। অনেক দিন পর 'লেডিজ হোম জার্নাল' পত্রিকায় (মে ১৯৬৬) এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বিবাহ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

'স্বামীর সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে, স্বামীর ঘর ছেড়ে আমি চলে এসেছি—এমনি নানা কথা, কানাঘুষা আমার কানেও এসেছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আমাদের বিয়ে অবশ্য আদর্শগতভাবে সুখের বিয়ে নয়। তবু আমরা সময়ে সময়ে খুব সুখী হয়েছিলাম। সময়ে সময়ে আমরা দুজন ঝগড়াও করেছি। এর কারণ, আমরা দুজনেই ছিলাম অনেকটা রগচটা মানুষ। জেদী।

একরোখা। আর কিছুটা পারিপার্শ্বিক অবস্থা। উনি যদি আমাকে নিষেধ করতেন তাহলে আমি জনসাধারণের কাজে এগিয়ে আসতে পারতাম না। কিন্তু আমি যা করতে চাইতাম তা আমাকে এমনই পেয়ে বসত যে তা দেখে উনি ভয় পেয়ে যেতেন। তিনি আমাকে কোন না কোন কাজে আবদ্ধ রাখতে চাইতেন। তাছাড়া তিনি তাঁর নিজের কাজকর্মের মধ্যে সব সময় মগ্ন থাকতেন। কিন্তু আমি জনজীবনে প্রবেশ করলাম এবং কৃতকার্য হলাম। এটাকে তিনি কোন কোন সময় পছন্দ করতেন, আবার কোন সময় করতেন না। অন্য লোকেরা, বিশেষ করে আত্মীয়স্বজন বন্ধুরা ছিলেন সবচেয়ে খারাপ। তাঁরা বলে বসতেন :

'কি, অমুকের স্বামী হয়ে এখন কেমন লাগছে!'

'তাতে উনি ভীষণ ঘাবড়ে যেতেন। এবং আমাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সাধ্যসাধনা করতে হত তাঁর সে রাগ ভাঙাতে। স্বামীর পুরুষ-অহমিকায় আঘাত দেবার মতো সব চাইতে বেশি পাপ বিবাহিত জীবনে আর নেই।…শেষের দিকে আমরা এসব কাটিয়ে উঠেছিলাম অনেকটা। এবং ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরকে বুঝতে শিখেছিলাম।

১০

ফিরোজ নেই। শেষ বন্ধনটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল মৃত্যুর নির্মম আঘাতে।

ইন্দিরা এবার নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন দেশের কাজে। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে, এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন নানান কাজে অকাজে। ১৯৫৫ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ইন্দিরাজী। তাঁর উপর কংগ্রেসের মহিলা বিভাগের ভার ন্যস্ত ছিল। কাজেই ইন্দিরা দেশের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। পরিদর্শন করে বেড়াতে লাগলেন মহিলা সংগঠনের কাজ। মেয়েদের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মনীতি।

১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরাজী নির্বাচনী প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পিতার নির্বাচনী কেন্দ্র ফুলপুরের ১১০০ গ্রামে গিয়ে নির্বাচনী প্রচার করতে লাগলেন। গ্রামবাসী সবাই ভিড় করে এল। ইন্দিরাজীর বক্তৃতার প্রতিটি কথা শুনলে মন দিয়ে। মেয়েরা শপথ নিলে কংগ্রেসকে ভোট দেবার। পুরুষেরাও।

উত্তর প্রদেশ থেকে এবার গুজরাটে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গুজরাটে জনসাধারণের প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা। নির্বাচনী সভা সব পণ্ড। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিতে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে জনতার হিংসাত্মক আন্দোলন। ইন্দিরাজীর নির্ভীক কণ্ঠ এ সমস্যার সমাধানে সহায়তা করলো অনেকখানি।

কংগ্রেস সংগঠনে তখন বিরুদ্ধ মতবাদ ও শক্তি মাথা তুলে উঠেছিল। প্রশ্ন উঠল: প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বেশি, না কংগ্রেস সংগঠনের? প্রধানমন্ত্রী কি পার্টির নির্দেশ মতো চলবেন, না আপন

বিবেক অনুসারে ? স্বাধীনতার পূর্বে কংগ্রেসের সর্বশক্তি ন্যস্ত ছিল তার নেতা সভাপতির হস্তে। কিন্তু স্বাধীনতার পর সংসদীয় নেতা প্রধানমন্ত্রী প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। সংগঠন সভাপতি অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। এ বিরোধ আরও তীব্র হয়ে দেখা দিল কংগ্রেসের দুই সভাপতির পদত্যাগে। ১৯৫১ থেকে '৫৪ সাল পর্যন্ত জওহরলালই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। আবার প্রধানমন্ত্রীও। তারপর ১৯৫৫ থেকে '৫৮ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীইউ. এন. ডেবর। তখন থেকে কংগ্রেস সংগঠন জনসংযোগ হারাতে শুরু করে। সংসদীয় নেতাই কংগ্রেসের সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ালেন অনেকটা। সকল নীতি, কর্মপন্থার নিয়ন্তা হয়ে পড়লেন।

ফলে পার্টি সংগঠনের মধ্যে ধীরে ধীরে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে কংগ্রেসের যুব সম্প্রদায় সংগঠিত হলো 'জিঞ্জার গ্রুপ' গোষ্ঠীতে। ফিরোজ গান্ধী তখন বেঁচে। এ সংগঠনের ব্যাপারে ফিরোজ ও ইন্দিরার হাত কম ছিল না। এ গোষ্ঠী কংগ্রেসের সমাজবাদী কর্মপন্থা কার্যকরী করার জন্যে জোর দিতে লাগলো। কিন্তু কংগ্রেসের প্রবীণ দল একটা না একটা অভিযোগ সৃষ্টি করে 'জিঞ্জার গোষ্ঠী'র প্রস্তাবকে একপেশে করে রাখলেন। দিলেন ধামাচাপা।

কংগ্রেসে এ পরিস্থিতিতে নাগপুর অধিবেশনে নতুন কংগ্রেস সভাপতি পদে বৃত হলেন ইন্দিরা গান্ধী (১৯৫৯)। কোন কোন মহলের ধারণা, কংগ্রেস সংগঠনে নতুন প্রাণবন্যা প্রবাহিত করার উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নেহরুই উদ্যোগী হয়েছিলেন কন্যা ইন্দিরাকে কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিত করতে। কিন্তু ঠিক তাই কি? ইন্দিরা গান্ধীর পূর্বে আরও তিনজন মহিলা কংগ্রেস সভাপতির আসন অলংকৃত করে গেছেন. শ্রীমতী এ্যানি বেসান্ট (১৯১৭), শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু (১৯২৫) আর শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা (১৯৩৩)। তাছাড়া ঠাকুরদা মতিলাল নেহরু ও পিতা জওহরলাল

একাধিকবার কংগ্রেস সভাপতি হয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন তাই তিন পুরুষের।

১৯৫৯ সালে ইন্দিরা কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলে জওহরলাল যা বলেছিলেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য। নেহরুর কথায়:

'আমি ওকে এত নিকটভাবে জানি যে, আমার পক্ষে কিছু বলা আজ কঠিন। আমি জানি না, সে আমার কাছ থেকে কী পেয়েছে। কিন্তু সে তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে তার সুন্দর স্বভাব, অতি প্রচুর কর্মক্ষমতা এবং অন্তরের সততা। সে আমার কন্যা বলে আমি আজ গর্বিত। আমি গর্বিত, সে আমার 'কমরেড'। আমি গর্বিত, সে আজ আমার নেতা।'

কাজেই নাগপুর কংগ্রেসের মসনদে ইন্দিরাকে পিতা জওহরলাল বসিয়ে দেননি। কংগ্রেস সদস্যরাই তাঁকে বরণ করে নিয়েছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি পদে ইন্দিরাজীর ভূমিকা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

নাগপুর কংগ্রেসের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হলো কৃষির উন্নতিকল্পে ভারতের ভূমিসংস্কার। গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমবায় ভিত্তিতে কৃষি-কাজের ব্যবস্থা। জমির মালিক জমির অনুপাতে এবং কৃষক শ্রমের অনুপাতে উৎপাদনের অংশ পাবে। ১৯৫৯ সালের মধ্যে মধ্যস্বত্ব লোপ আইন প্রবর্তন, খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রীকরণ আর যৌথ খামার ব্যবস্থার প্রচলন। ব্যক্তিগত মালিকানায় সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ নির্ধারণ। এবং কিষাণরা যাতে শস্যের সংগত মূল্য পায় তার জন্যে বীজ বপনের আগে শস্যের সর্বনিম্ন দর বেঁধে দেবার সুপারিশ।

কিন্তু এ সুপারিশ শুধু কংগ্রেসের দলিল দস্তাবেজের মধ্যে চাপা পড়ে রইল। কার্যকরী আর হয়ে উঠলো না। দেশের খাদ্য সমস্যার সুরাহাও না। 'সবুজ বিপ্লব'-এর স্বপ্ন আর সার্থক হয়ে উঠল না। তাহলেও কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে ইন্দিরাজীর প্রচেষ্টা প্রশংসার। কোন কোন রাজ্যের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে তিনি সচেষ্ট হন। শান্তি ও স্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্যে অগ্রসর হন নির্ভীক পদক্ষেপে।

কেরল-পরিস্থিতির কথাই ধরা যাক। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে সুদূর দক্ষিণ ভারতের প্রগতিশীল এ রাজ্যটিতে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় সংবিধান সম্মত ভোটের রায়ে। এবং শ্রীই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ভোটের রায়ে কম্যুনিস্ট সরকার গঠন এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তার নজির আর কোথাও নেই। কাজেই, এ রাজ্যের নতুন সরকারের প্রতি সন্দেহ ও সংশয় দানা বেঁধে ওঠে অনেকের। বিশেষ করে প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের শিবিরে কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও নানাবিধ আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে ত্রিচূরের কাছে এক পল্লীতে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধে। তাতে পাঁচজন কংগ্রেস কর্মী নিহত হয়। কংগ্রেস কর্মীদের হত্যার জন্যে কম্যুনিস্ট শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দোষারোপ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুও এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কুইলনের নিকট এক কাজু বাদামের কারখানায় পুলিশের গুলিতে দুজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। তাতে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে। বিরোধীপক্ষের সর্বাত্মক আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের আবহাওয়াও সৃষ্টি হয় কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভার বিপক্ষে। আর এ রাজনৈতিক আবহাওয়াকে আরো জোরদার করে তোলে কেরালার ক্যাথলিক পাদ্রীরা। কম্যুনিস্ট সরকারের শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ওরা ফেটে পড়ে। কেননা, শিক্ষাবিল চালু হলে তাদের কায়েমী স্বার্থেই ঘা পড়বে সবিশেষ। ক্যাথলিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাই তাদের সাত হাজার ক্যাথলিক স্কুল বন্ধ করে দেয়, যাতে সরকারী আইন কার্যকরী হতে না পারে। সরকার বিরোধী কংগ্রেস, প্রজা সোস্যালিস্ট, মুসলিম লীগ প্রভৃতি বহু দল শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে দিল। ব্যাপক ছাত্র

আন্দোলনও চলতে থাকে। কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে 'চার্জশীট' আনা হল: যদিও গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ী কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসীন হয়েছে, তবুও কেরলের কম্যুনিস্ট সরকার প্রশাসন ব্যাপারে দলীয় স্বার্থকে বড় করে তুলেছে। সংস্কার সাধনের নামে দলীয় নেতাদের প্রাধান্যে নতুন করে পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত লিখিয়েছে। বেসরকারী ক্যাথলিক বিদ্যালয়গুলি বাতিল করে দিয়েছে।

কাজেই কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জোরদার হয়ে উঠল। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু গণতান্ত্রিক সংবিধানে নির্বাচিত বিরোধী সরকারকে অপসারিত করতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন।

এ পরিস্থিতিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কেরলে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে এলেন। দিল্লীতে ফিরে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন। সংসদ সদস্যদের নিকট জানালেন কেরালার কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভা অচিরে বাতিল করা হোক। কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করার সুপারিশ করলেন। ইতিপূর্বে কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়নি। সংবিধানে অবশ্য রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের ধারা আরোপিত রয়েছে।

তাই হোল। রাষ্ট্রপতি তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে কেরালার মন্ত্রিসভা বাতিল করে দিলেন। নতুন নির্বাচনের হুকুম তামিল হলো।

ইন্দিরা কেরালা রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনী সভা সংগঠন করলেন। পরিচালনা করলেন পার্টির নির্বাচনী প্রচারকার্য। ফলে কেরালায় কংগ্রেস পার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করল বিপুল ভোটে। কম্যুনিস্ট পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভেও অসমর্থ হলো।

ইন্দিরাজীর নির্বাচন পরিচালনা সার্থক হলো।

ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের দাবিতে যে আন্দোলন দেশময় ধূমায়িত হতে থাকে তা অনেকটা নির্বাপিত হয় তাদের দাবি পূরণে। কিন্তু বোম্বাই ও পাঞ্জাব এ দুই রাষ্ট্রের সমস্যার তখনও সমাধান হয়নি।

বোম্বাইয়ে তখন মারাঠীভাষী মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটীভাষী গুজরাটীদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি তুমুল রক্তাক্ত আন্দোলনে রূপ নিয়েছে।

কংগ্রেসের তরফ থেকে ইন্দিরা মহারাষ্ট্রে গেলেন ব্যাপারটির তদন্তে। তিনি মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। শুধু নেতাদের সঙ্গে নয়। লিপিবদ্ধ করে নিলেন সাধারণ মানুষের মনোভাবও। দিল্লী ফিরে তিনি তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন। সংসদের মহারাষ্ট্র সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন। এবং তিনি যে রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন তা অনুসন্ধান করতে এক কমিটি গঠন করলেন। এ কমিটির সুপারিশ হলো বোম্বাই রাষ্ট্রকে নতুন দুটি রাষ্ট্রে দ্বিখণ্ডিত করা। এক হলো মহারাষ্ট্র। তার রাজধানী হবে বোম্বাই। আর এক হলো গুজরাট। তার রাজধানী আহমেদাবাদ। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ সুপারিশ মেনে নিলো। পার্লামেন্টে এ মর্মে বিল পাশ হলো। ১ মে ১৯৬০ বোম্বাই রাষ্ট্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল নতুন দুটি রাজ্যে পাকাপাকি ভাবে।

রাজ্যে রাজ্যে ঘোরাঘুরি করে কঠোর পরিশ্রমে শ্রীমতী গান্ধীর শরীর ভেঙে পড়লো। যকৃতের কঠিন পীড়া ধরা পড়লো পরীক্ষায়। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলো। অথচ চাপা মেয়ে ইন্দিরা নিজের অসুখের কথা বিশেষ কাউকে জানতে দেননি। ইতিপূর্বে যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। অথচ মুখে তা প্রকাশ করেননি।

কংগ্রেস সভাপতির মেয়াদ ফুরিয়ে এল। ওয়ার্কিং কমিটি ইন্দিরাজীকে পুনরায় নির্বাচিত করার জন্যে পীড়াপীড়ি করলো। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী রাজী হলেন না। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীমতী গান্ধীর পর ১৯৬০ সালে বাঙ্গালোর অধিবেশনে।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝি অশান্ত তিব্বত ও ভারত। ১৯৫৯ সালের মার্চের দিকে তিব্বতের আভ্যন্তরীণ নানা অশান্তির খবর আসতে থাকে। তিব্বতের খাম্পা উপজাতিরা চীনের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। খাম্পা বিদ্রোহ রাজধানী লাসা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তিব্বতী সৈন্যরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলায়। কিন্তু এ বিদ্রোহ দমন করা হয় শীঘ্রই। পিকিং সরকার তিব্বতের ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রপ্রধান দালাই লামাকে আটক করে তিব্বতের শাসনভার পাঞ্চেন লামার হাতে তুলে দেয়।

এদিকে দালাই লামা তাঁর পারিষদ দল সহ গোপনে লাসা ত্যাগ করেন এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মা, ভাইবোন ও আশীজন সহচর নিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পথে ভারতে প্রবেশ করেন। প্রার্থনা করেন ভারত সরকারের নিকট রাজনৈতিক আশ্রয়। ভারত সরকার তা মঞ্জুর করেন এবং ভারতে সম্মানিত অতিথিরূপে তাঁদের গ্রহণ করেন। পরে বহু তিব্বতী শরণার্থীরও ভারতে আগমন ঘটে। তাদের আহার ও বাসস্থানের সমস্যা দেখা দেয়। ইন্দিরা 'তিব্বতী শরণার্থী ত্রাণ কমিটি' গঠন করেন। এ সময় দালাই লামা ব্যক্তি ও বাক্-স্বাধীনতার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানালেন। কিন্তু শ্রীনেহরু সে দাবি বাতিল করে দিলেন।

চীন সরকার দালাই লামার ব্যাপারে ভারতের উপর সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। চীনের বিরুদ্ধে ভারতের নানাস্থানে বিশেষ করে আচার্য জে. বি. কৃপালনী প্রমুখ নেতারা সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। চীনের বিরুদ্ধে ভারতে বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরুও চীনের আচরণে অসন্তোষ- প্রকাশ করলেন। ভারত ও চীনের মধ্যে ফাটল ধরলো 'পঞ্চশীল নীতি'র রক্ষাকবচ সত্ত্বেও। ১৯৫৪ সালে নেহরু চৌ এন-লাই যুক্ত বিবৃতিতে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। (পঞ্চশীলের মুল নীতি : (১) পরস্পরের আঞ্চলিক সংহতি ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পারস্পরিক মর্যাদা দান। (২) পারস্পরিক অনাক্রমণ ; (৩) একে অন্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। (৪) সমানাধিকার ও পারস্পরিক কল্যাণ এবং (৫) শান্তি-পূর্ণ সহাবস্থান। এ চুক্তির বলেই ভারত তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌম অধিকার মেনে নেয়।)

তবুও কিন্তু ১৯৬২ সালের চীন-ভারত বিরোধের সূত্রপাত চীন সরকারের তিব্বত দখলের পরেই বলা যায়। 'পঞ্চশীল' আর 'হিন্দী-চীনি ভাই-ভাই'-এর নামাবলী গায়ে দিয়ে চীন শান্তিবাদী ভারতের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

২০ অক্টোবর ১৯৬২ সালে চীনা বাহিনী বিপুল সংখ্যক সৈন্যদল নিয়ে একযোগে লাদাক ও নেফার পার্বত্য এলাকায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ভারতীয় বাহিনী উন্নত সমরাস্ত্রে সজ্জিত চীনের এ বিপুল ও ব্যাপক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। নেফার খিঞ্জেমেন, তোলা, লংজু প্রভৃতি ঘাঁটিগুলি চীনারা দখল করে নেয়।

আক্রমণ তীব্রতর হয় ১৬ নভেম্বর ১৯৬২-তে। ১৮ নভেম্বর ওয়ালং শহর ও তার পাশের বিমানঘাঁটির পতন ঘটলো। ১৯ নভেম্বর হলো কামেং ডিভিশনের বমডিলা শহর ও সে-লার। লেঃ জেনারেল বি. এম. কাউলের অধীন ভারতীয় বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। লে. জেনারেল কাউল নিজে তেজপুর সমর ঘাঁটি থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে ভীরু কাপুরুষের মতো। ছুটি নিয়ে বসলে। সমগ্র নেফা অঞ্চল চীনা আক্রমণের শিকার হলো। চীনা বাহিনী ভারতভূমির প্রায় চৌদ্দ হাজার বর্গমাইল নিলে কুক্ষিগত করে।

হঠাৎ ২১ নভেম্বর ১৯৬২ চীন একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলে। ১৯৫৯ সালের সীমারেখায় ফিরে যাবে জানালে। চীনা সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছিলো ঠিক। কিন্তু শান্তির জন্য কতকগুলি শর্ত তারা আরোপ করলে। সেগুলি ভারতের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে চীনকে ভারতভূমি ত্যাগ করতে বললেন। তিনি লোকসভায় জানালেন, তা না হলে কোনরূপ আলোচনায় ভারত সম্মত হবে না।

চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসায় এগিয়ে এলেন শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েক। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী। উদ্যোগী হলেন কলম্বো সম্মেলন আহ্বানে এশিয়া ও আফ্রিকার ছ'টি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে নিয়ে।

এরা হলো : সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ঘানা। শ্রীমতী বন্দরনায়েক ভারত ও চীনের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে কলম্বো প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য পিকিং যাত্রা করেন। তারপর নতুন দিল্লী। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুবান্দ্রিয়ও পিকিংএ আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

চীন সরকার কলম্বো প্রস্তাবে সাড়া দিলেন। শ্রীমতী বন্দরনায়েক এবার এলেন নয়াদিল্লীতে। শ্রীনেহরুর নিকট মীমাংসা প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ভারত সরকার এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। কিন্তু পিকিং তা পুরোপুরি গ্রহণ করলেন না।

ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বিপর্যয়ের মুখে শ্রীমতী ইন্দিরা নিস্পৃহ থাকতে পারেননি। বিপর্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলের মনোবল ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তিনি তেজপুর ছুটে যান। বমডিলার বিধ্বস্ত অঞ্চল নিজে পরিদর্শন করেন। জওয়ানদের অভাব অভিযোগের কথা স্বকর্ণে শ্রবণ করেন। নেফা ও লাদাকের দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে সৈন্যশিবির পরিদর্শন করেন। নাগরিক রক্ষা কমিটি গঠন করে তিনি জওয়ানদের জন্য গরম পোশাক, খাদ্য, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থা করেন। জওয়ানদের সাহায্যে সচেষ্ট হন।

চীনা বাহিনীর হাতে ভারতীয় সমরশক্তির এ অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় ভারতীয় বীর জওয়ানদের বিশ্বের দরবারে কেবল খাটো করেনি, ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের বুকেও কঠোর আঘাত হানে। শ্রীকৃষ্ণ মেনন তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনিই জেনারেল কাউলকে বহু প্রবীণ সেনানায়কদের ডিঙিয়ে আর্মি কম্যাণ্ডে বসিয়েছিলেন। কাজেই এ পরাজয় শ্রীকৃষ্ণ মেননেরই পরাজয়। তাঁকে হার স্বীকার করতে হলো। পদত্যাগ করতে হলেন বাধ্য। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযশোবন্তরাও চ্যবন শ্রীকৃষ্ণ মেননের স্থলাভিষিক্ত হলেন। এবার তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে ব্রতী হন। জওয়ানদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে সফলও হলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ঢেলে

আধুনিক সমর সজ্জায় নতুন করে গড়ে তুললেন। জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরীকে তিনি নিযুক্ত করেন স্থল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

চীন ভারত সংঘর্ষের সময় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল অবশ্য কমনওয়েলথ দেশসমূহ আর মর্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক সাহায্য লাভে বঞ্চিত হননি। কিন্তু 'পঞ্চশীলে'র ধ্বজাধারী জনপ্রজাতন্ত্রী চীনের কাছ থেকে নেহরু এ আঘাত প্রত্যাশা করেননি। স্বপ্ন তাঁর ভেঙে গেল খান খান হয়ে। জাগ্রত এশিয়ার সংহতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মহান নীতি সুউচ্চ আসনবেদী থেকে গড়িয়ে পড়ল ধুলায়।

মহান এক আদর্শের হলো অপমৃত্যু!

বড়ো। আর আমি হয়ে গেলাম বুড়ো? 'বেটী' বুঝি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে?'

ডাঃ রায় হেসে উঠলেন। তারপর স্টেথোসকোপ বার করে রুগীর বুক পরীক্ষা করলেন। লম্বা লম্বা পা ফেলে গিয়ে ঢুকলেন চিকিৎসকদের নির্দিষ্ট ঘরে। ঘরে ঢুকে রুগীর টেম্পারেচার চার্ট দেখলেন পরীক্ষা করে। ব্যবস্থাপত্র সব উল্টেপাল্টে দেখলেন। চিকিৎসকদের মুখের ওপর বলে উঠলেন: 'রুগীর ঠিক মতো চিকিৎসা হচ্ছে না কিন্তু। ডায়গ্‌নোসিস্‌ও হয়নি।'

তিনি শিশির ওষুধপত্র সব ঢেলে ফেললেন। নতুন করে ব্যবস্থাপত্র দিলেন লিখে। তিন দিন তিনি দিল্লীতে ছিলেন। তার মধ্যে জওহরলালের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা দিলো। নেহরু অনেকটা সেরে উঠলেন। এদিকে ইন্দিরাও আমেরিকা থেকে স্বদেশে ফিরে এলেন।

একটু সেরে উঠেই নেহরু আবার আপন কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। কিন্তু আগেকার সেই প্রাণোচ্ছল কর্মশক্তি ফিরে পেলেন না। দপ্তরে তাঁর টেবিলের উপর ফাইলের পর ফাইল জমতে লাগলো। সব সময় আর দেখে উঠতে পারতেন না। তাই প্রাক্তনমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে পুনরায় তিনি দপ্তরবিহীন মন্ত্রী পদে নিয়োগ করে দিলেন। বিশেষ করে মন্ত্রিসভার কাজ কর্ম তদারকের জন্যে।

নেহরুর পর কে প্রধানমন্ত্রী হবেন এ নিয়ে কানাঘুষাও শুরু হলো। নেহরুর উত্তরাধিকারী কে? 'আফ্‌টার নেহরু, হু?' আর 'আফ্‌টার নেহরু, হোয়াট?' এ নিয়ে ওয়েলস হেনজেন প্রমুখ বিদেশী সাংবদিকপুঙ্গবরা বিস্তর মাথা খেলিয়ে মোটা মোটা কিতাব লিখতে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। আর জনৈক ভারতীয় সাংবাদিক তো লিখলেন—মহামহীরুহ বটবৃক্ষের ছায়ায় কি আর কিছু গজাতে পারে? অর্থাৎ, জওহরলালের বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে আর কোন নেতাই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন না। পারবেন না কেউ।

কেউ কেউ প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যেতে সুপারিশ করলেন। জওহরলাল তাতে আপত্তি জানালেন। বললেন, দেশের জনগণই তাদের নেতা বেছে নেবে। গণতন্ত্রে তাই হয়। ইন্দিরাকে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যেতে চান কিনা, কেউ কেউ জানতে চাইলেন। নেহরু তার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। বললেন, তিনি বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের পক্ষপাতী নন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তা নয়।

কন্যা ইন্দিরাকে তিনি অমন ধারায় মানুষ করেননি। পণ্ডিতজী জানালেন এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে। বললেন :

'তাই বলে কোন দায়িত্বশীল পদের যোগ্য সে নয় এমন কথা বলা চলে না। কংগ্রেস সভাপতির পদের জন্য আমি তাকে কোনরূপ সহায়তা করিনি। দেশের মানুষই তাকে বেছে নিয়েছে। এবং আমাকে যাঁরা পছন্দ করেন না—আমার নীতির যাঁরা বিরোধী তাঁরাও পর্যন্ত বলেছেন—কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সে ভালো কাজই করেছে।' তিনি আরোও বলেন :

'আমার চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সে আপন ইচ্ছামত পথ বেছে নিয়েছে। আমি পছন্দ না করলেও তাই নেয়।…কোন কোন বিষয়ে ওর সঙ্গে আমার মতের মিল আছে। কোন কোন বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি না।' তিনি তারপর মেয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। এবং জানান :

'ইন্দিরা খুব স্বাধীনচেতা মেয়ে। নিজের পথ ধরে সে চলে ; কারো নির্দেশ মেনে নয়। আমার তো মনে হয় ঠিকই সে করে।'

জওহরলাল থামলেন। মেয়েকে তিনি আপন ভাবমূর্তির আদতে গড়ে তুলেছেন। ঠিক গড়ে তোলেননি। গড়ে উঠতে সহায়তা করেছেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে তিনি তুলে ধরেছেন মেয়ের সামনে। তাই দিয়েই ইন্দিরা নিজেকে নিজে গড়ে তুলেছে।

মেয়ের তেরো বছরের জন্মদিনে নৈনী সেণ্ট্রাল জেল থেকে ২৬ অক্টোবর ১৯৩০ সালে লেখা চিঠিখানির কথা তাঁর মনে পড়লো। অতি বিজ্ঞের মতো মেয়েকে তিনি উপদেশ দিতে চাননি। লিখেছিলেন :

'জাতির ইতিহাসে যুগ প্রবর্তনের কথা পড়েছ। ইতিহাস-বিখ্যাত নরনারীদের মহত্ত্বের কথা স্মরণ করে মাঝে মাঝে আমরা কল্পনা করি, সেই বীর ও বীরাঙ্গনাদের মতো আমরাও যেন সব বড়ো বড়ো কাজ করতে পারি। তুমি যখন ছোট ছিলে তখন জোয়ান অব্ আর্ক-এর গল্প পড়ে ভেবেছ কেমন করে তাঁর মতো হতে পারবে। সাধারণ মানুষ বীরত্বের ধার দিয়েও যায় না। নিজের নিজের সন্তান-সন্ততি বাড়ি-ঘর নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এমন সব সময় আসে যখন বড়ো একটা-কিছুর জন্যে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এরাও অসাধারণ হয়ে পড়ে। বড়ো বড়ো নেতারা যখন জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলেন তখন ইতিহাসে যুগ প্রবর্তন হয়।

'১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে—যে সালে তোমার জন্ম এই রকম একজন যুগপ্রবর্তক তাঁর কাজ আরম্ভ করেছিলেন। দুঃস্থ এবং দরিদ্রের জন্য তাঁর হৃদয় প্রেমে ও করুণায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। ঠিক তোমার যে মাসে জন্ম সে মাসেই যুগান্তকারী রুশবিপ্লব ঘটেছিল এবং তার নেতা ছিলেন লেনিন। আমাদের ভারতবর্ষেও ঠিক তেমনি একজন নেতা আমরা পেয়েছি যাঁর প্রেম ও সহৃদয়তায় অনুপ্রাণিত হয়ে আজ প্রত্যেক ভারতবাসী স্বরাজ সাধনার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তেত্রিশ কোটী ভারতবাসী আজ তাঁর মহতী বাণী শুনেছে, যদিচ সেই বাপুজী আজ কারাগারে। তারা আজ তাদের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ছেড়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আমাদের মস্ত বড়ো সৌভাগ্য যে আজ আমরা আমাদের চোখের সামনেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই যুগ প্রবর্তনের সূচনা দেখতে পাচ্ছি।'

দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে মেয়েকে সজাগ করে দিয়ে নেহরু তাঁর চিঠিতে তারপর লিখেছিলেন :

'এ বিরাট আন্দোলনে আমাদের উপর কী কর্তব্যভার পড়বে সে আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে, আমাদের স্বরাজ-সাধনা এবং আমাদের দেশ যাতে আমাদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অবমানিত না হয়, সেটুকুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। যদি ভারতের মুক্তিসেনা হতে চাই তবে মনে রাখতে হবে যে, ভারতের সম্মান আমাদের হাতে গচ্ছিত রয়েছে এবং প্রাণ দিয়েও তাকে নিষ্কলঙ্ক রাখতে হবে।'

তিনি তারপর মেয়েকে মনে করিয়ে দেন :

'অনেক সময় হয়তো আমরা আস্থা হারাবো, আমাদের পক্ষে কী যে শ্রেয় সে সম্বন্ধে বহু সন্দেহ আসবে। এ রকম দোটানায় ও সংকটের সময় মনে রাখতে হবে, আমরা এমন কিছু যেন কখনও না করি যার জন্য আমাদের একদিন লজ্জা পেতে হবে, এমন কিছু যেন না করি যা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখতে হবে। গোপন করার চেষ্টা ভীরুর—সে চেষ্টা ভারতের মুক্তিসেনার অযোগ্য। মনের সাহস ও হৃদয়ের বলই হল সবচেয়ে বড়ো ভরসা। বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে এই সাহস অবলম্বন করতে হবে। বাপুজীর নেতৃত্বে আমরা এই যে স্বরাজ আন্দোলন করছি এর মধ্যে লুকোচুরি বা ভয়ের তো কিছু নেই। প্রত্যক্ষ দিবালোকে আমরা আমাদের কর্তব্য করে যাচ্ছি ব্যক্তিগত জীবনেও যদি আমরা ভয় না করি, তবে দেখবে যে কোন কিছুই আমাদের চিত্ত বিক্ষেপ ঘটাতে পারবে না।'

পরিশেষে নেহরু ইচ্ছা প্রকাশ করেন—ইন্দিরা যেন বড় হয়ে ভারতের একজন যথার্থ মুক্তিসেনা হতে পারে।

পিতার ইচ্ছা পূরণে কন্যা ত্রুটি করেননি। মাতৃভূমির সেবায় মুক্তিসেনাই কেবল হননি, বীরাঙ্গনার ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন। বিজয়িনী ইন্দিরা। দূরদর্শিনী !

১২

দেশের চরম দুর্দিনে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো ভুবনেশ্বরে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে। নেহরু তাঁর কর্মপন্থার সপক্ষে বিরোধীদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন অধিবেশনে। সকল পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে গঠনমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছিলেন। বলতে বলতে তিনি সহসা থেমে গেলেন। বক্তৃতা-মঞ্চে মাথা রেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। আক্রান্ত হলেন স্ট্রোকে। ইন্দিরা পাশেই ছিলেন। বাবাকে ধরে ফেললেন। তারপর প্লেনে করে নিয়ে এলেন দিল্লীতে।

চিকিৎসার গুণে নেহরু প্রথম ধকল কাটিয়ে উঠলেন বটে। কিন্তু ২৭ মে (১৯৬৪) ঘনিয়ে এল সে চরম মুহূর্ত। অন্তিম ক্ষণ।

কেন্দ্রীয় সংসদ ভবনে জাতীয় পতাকা হল অর্ধনমিত। সর্বত্র শোকের ছায়া। কালো যবনিকা। আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল :

'সমুখে শান্তি পারাবার—
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার!'

নেহরুকে শেষ দেখা দেখতে দেশ ভেঙে সবাই এসে হাজির হলো তিন মূর্তি ভবনে। বিদেশী রাজ-পুরুষ ও কূটনৈতিক দলও। নেহরুর শব উপর থেকে নীচে নামানো হলো। ইন্দিরা বাবার শবের পাশে মেঝের উপর ঠায় বসে রইলেন। চোখে অপলক দৃষ্টি। ঘরে শতশত লোক যে যাওয়া আসা করছে, শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছে তদের প্রিয় নেতাকে, সেদিকে ইন্দিরার একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই। অবিচলিত। স্থাণুর মতো বসে রইলেন। তারপর এক সময় আপন ঘরে তিনি চলে গেলেন। দরজায় খিল দিয়ে বিছানার

উপর আছড়ে পড়লেন। ফেটে পড়লেন কান্নায়। বুকটা বুঝি এবার হাল্কা হলো কিছুটা। তারপর চোখে-মুখে জল দিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দূর দূর থেকে বিশিষ্ট অভ্যাগত যাঁরা সব এসেছেন তাঁদের আপ্যায়নের দিকে নজর দিলেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। তারপর শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে শবযাত্রার সব ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালেন।

জওহরলাল তাঁর শব দাহ করার জন্য জানিয়েছিলেন উইলে। ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—তাঁর এক মুঠি চিতাভস্ম যেন গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। আর বাকীটুকু এরোপ্লেনে করে নিয়ে গিয়ে যেন উপর থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় মাঠে ও প্রান্তরে। মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে তা যেন ভারতভূমির সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শান্তিবনে নেহরুর শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো। পুত্র সঞ্জয়কে নিয়ে (জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজীব তখন কেমব্রিজে পাঠরত) এক খোলা গাড়িতে ইন্দিরা পিতার শবানুগমন করেন। দিল্লীর এক সংবাদপত্রে ইন্দিরাজী পরে লিখেছিলেন :

'এক বছর হলো বাবা আমাদের ছেড়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর আত্মা আমাদের মধ্যেই রয়েছে। এবং তা থাকবে আমাদের অনুপ্রেরণা দিতে, আমাদের ভীরু পিচ্ছল পদক্ষেপ জোরদার করে তুলতে, আমাদের মধ্যে এবং আমাদের জনগণের মধ্যে বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে। কাজেই আমাদের তাঁর স্মৃতির যথাযোগ্য উত্তর সাধক হতে হবে। আমাদের উৎসর্গ করতে হবে সেই সুমহান কর্তব্যে, যেন আমরা তাঁর স্বপ্নের ভারতকে প্রগতিশীল ও পরিপূর্ণ জাতিতে পরিণত করতে পারি।'

ইন্দিরাজীর সে সংকল্প আজ কি সফল হতে চলেছে?

মে সাতাশে-ই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক বসলো। আর এ বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী প্রবীণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দাকে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হলো। সভাপতি কামরাজকে নেহরুর উত্তরাধিকারীর নাম প্রস্তাব করতে

বলা হলো। শ্রীকামরাজ শাস্ত্রীজীর নাম প্রস্তাব করলেন। সংসদীয় দল অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী নন্দা কিংবা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের নাম বাতিল করে নেহরু মন্ত্রিসভার দপ্তরহীন মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুরকেই দলনেতা হিসেবে বেছে নিলে ২ জুন ১৯৬৪।

দিন সাতেক পর শ্রীশাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন।

শাস্ত্রীজী তাঁর মন্ত্রিসভায় ইন্দিরাকে যোগদান করতে আহ্বান জানালেন। পীড়াপীড়ি করলেন বহির্বিষয়ক মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে। কিন্তু ইন্দিরা রাজী হলেন না। পিতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করতে চাইলেন। এদিকে শাস্ত্রীজীও ছাড়বেন না। নেহরুর মেয়ে মন্ত্রিসভায় থাকবে না তা কি কখনও হয়? পণ্ডিতজীর সঙ্গে থেকে থেকে মন্ত্রিসভার কাজকর্মে দেশবিদেশের রাজনীতিতে তাঁর কত গভীর জ্ঞান। রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে কত আলাপ পরিচয়।

কাজেই বহির্বিষয়ক না হোক, অপর কোন দপ্তর গ্রহণ করতে ইন্দিরাকে তিনি আবার অনুরোধ জানালেন। ইন্দিরা এবার আর না করতে পারলেন না। শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভায় যোগদান করলেন। দপ্তর বেছে নিলেন তথ্য ও প্রচার। মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান হলো চতুর্থ।

শ্রীমতী গান্ধী লোকসভার নির্বাচিত সদস্য নন। আগেকার নির্বাচনে গোবিন্দবল্লভ পন্থ তাঁকে উত্তর প্রদেশ থেকে নির্বাচন প্রার্থী হতে জানিয়েছিলেন। পন্থজী উত্তর প্রদেশের শুধু বরেণ্য নেতা নন, নেহরুর বিশিষ্ট বন্ধু। কিন্তু ইন্দিরাজী তাঁর সে আবেদন করলেন উপেক্ষা। অজুহাত দেখালেন—তাঁর ছেলেরা এখনও ছোট। মা হয়ে ওদের দেখাশুনার ভার এখন তাঁকেই নিতে হবে। পন্থজী বুঝি ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন। নেহরুর কাছে অনুযোগও করেছিলেন। ইন্দিরা কিন্তু তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত হননি। কাজেই এবার তাঁকে রাজ্যসভার সদস্যপদ নিতে হলো মনোনীত সদস্য হিসাবে।

ইন্দিরাজী শাস্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যপদ খুব বেশিদিন অলংকৃত করেননি। মাত্র বছর দেড়েক। জুন ১৯৬৫ থেকে জানুয়ারী ১৯৬৬।

কিন্তু এরই মধ্যে তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গেছেন তাঁর আপন দপ্তরে আর দপ্তরের বাইরে।

তথ্য ও বেতারমন্ত্রী হয়ে ইন্দিরাই প্রথম উপলব্ধি করেন, ভারতের অগণিত 'মূঢ় মূক মুখে' ভাষা দিতে হলে, অশিক্ষা ও অর্ধশিক্ষার অন্ধকার দূর করতে হলে, রেডিও ও টেলিভিসনের ভূমিকা রয়েছে অনেকখানি। এর মাধ্যমে ঘরে ঘরে শিক্ষা প্রসারের প্রভূত সম্ভাবনা। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের দৌলতে জনসংযোগের এ সহজ মাধ্যমের ঘটেছে অপচয়। আমাদের বেতার প্রচারের সময়, সীমা আগে ছিল খুবই স্বল্প। তা কিউবা, চিলি, উত্তর ভিয়েতনাম প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেশগুলির তুলনায় ছিল সীমাবদ্ধ। ইন্দিরাজী এর সময়, সীমা দিলেন বাড়িয়ে। বেতার শ্রোতার সংখ্যাও বেড়ে গেল যখন তিনি স্বলভে বেতার যন্ত্র তৈরি করতে উৎসাহ দিলেন। শর্ট ওয়েভের এই ট্রানজিস্টারগুলিতে একাধিক কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনা যায়। ভারতে তৈরি বেশি দামের রেডিওগুলি কেবল দূর দূর বেতার কেন্দ্র ধরতেই ছিল সক্ষম।

এতদিন বেতার ছিল একচেটিয়া সরকারী প্রচারযন্ত্র। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সে ব্যবস্থা বাতিল করে বিরোধীদল ও স্বাধীন ভাষ্যকারদেরও অনুরূপ স্বযোগ দান করলেন। বেতারযন্ত্রকে শুধুমাত্র শাসকদলের মুখপাত্রে পরিণত করেননি।

নয়া দিল্লীতে ছোট্ট টেলিভিসন কেন্দ্র ছিল। কিন্তু তার প্রচার ও প্রসার ছিল সীমাবদ্ধ। শ্রীমতী গান্ধী তাকে জনপ্রিয় করে তুললেন অনুষ্ঠানস্থচীতে সামাজিক মূল্যায়ণ আরোপ করে। তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করলেন বেতার মারফত। কেননা ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা অন্ন ও বেকার সমস্যা সমাধানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী চলচ্চিত্র, মঞ্চ ও নৃত্যশিল্পের উন্নতির প্রতিও মনোযোগ দেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রসার ও উৎকর্ষসাধনে তিনি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্যোগ করেন নয়াদিল্লীতে। মঞ্চশিল্পী

ও নৃত্যশিল্প গোষ্ঠীর সাহায্যকল্পে সরকারী বৃত্তির আয়োজন করেন। ফিল্ম সেন্সর বোর্ডকেও নতুন করে ঢেলে সাজালেন। প্রগতিশীল অনেককে সভ্য তালিকাভুক্ত করে নিলেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর আপন দপ্তরের বাইরেও মন্ত্রিসভার কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো, বিশেষ করে কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখার কাজে। প্রথমে তাঁকে ছুটতে হলো মস্কো অভিমুখে। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চভ তখন ক্ষমতাচ্যুত। আলেকসি কোসিগিন ও লিওনিদ ব্রেজনেভ তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী এবং পার্টি সেক্রেটারি। কাজেই সাম্প্রতিক পটপরিবর্তনে ভারতের প্রতি সোভিয়েত সরকারের কি মনোভাব তা জানার জন্য মন্ত্রিসভা শ্রীমতী গান্ধীকে পাঠালেন মস্কো পরিক্রমায়। ইন্দিরাজী ইতিপূর্বে পিতা জওহলালের সঙ্গে মস্কো পরিদর্শন করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর একাও মস্কো গিয়েছেন। কিন্তু ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে তাঁর মস্কো আগমন এই প্রথম। সোভিয়েত সরকার ও জনগণ ইন্দিরাকে সাদর সংবর্ধনা জানালেন। এবং এ কথাও জানিয়ে দিলেন ভারতের প্রতি সোভিয়েত নীতির কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। আগেকার মতো ভারত-মৈত্রী বলবৎ রয়েছে এবং থাকবে। অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তাও অব্যাহত থাকবে আগেকার মতো।

আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এ সফর সার্থক পদক্ষেপ।

পাকিস্তানী জঙ্গীশাসক কর্তৃক ভারত আক্রমণ শাস্ত্রী মন্ত্রিসভার সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। মার্শাল আয়ুব খাঁ তখন পাকিস্তানের সামরিক অধিকর্তা। কাশ্মীরী জল ঘোলা করে তিনি নতুন দফায় ভারত আক্রমণের ফিকিরে ছিলেন। ১৯৪৭-এ পাক হানাদাররা অতর্কিতে আক্রামণ চালিয়ে কাশ্মীরের বৃহত্তর অংশ গ্রাস করে নিয়েছিল। এবার বুঝি বাকীটা! (বিশেষ করে যখন শান্তিবাদী ভারত অপ্রত্যাশিত চীনা আক্রমণের মুখে বেশ কিছুটা বেসামাল

হয়ে পড়েছিল।) তাই কিছুকাল থেকে পাকিস্তান কাশ্মীরের অভ্যন্তরে বহু অনুপ্রবেশকারীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে পাঠিয়ে ছিল। বলা বাহুল্য আক্রমণের পথ প্রস্তুত করা এর উদ্দেশ্য। এ সব পাক অনুচরেরা কাশ্মীরে ঢুকে পড়ে তার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করতে সচেষ্ট ছিল। এবার আয়ুব খাঁ তাঁর পেশাদারী সৈন্যদের পাঠালেন।

সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিপুল সংখ্যক মার্কিন ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে জম্মুর ছাম্ব এলাকায় অতর্কিতে হানা দিল পাকবাহিনী। বাসনা ছিল কাশ্মীর উপত্যকার সঙ্গে ভারতের সংযোগ সড়ক দখল করে নেওয়া। তারপর 'স্যাবার' জেটের পক্ষছায়ায় মার্কিন প্যাটন ট্যাঙ্ক হাঁকিয়ে পাঞ্জাবের সমভূমির ধূলি উড়িয়ে খাস দিল্লীর মসনদ! পাকিস্তান বেতারেও তাই ঘোষণা করা হলো। তিন দিনের মধ্যে নয়াদিল্লী পাক সেনাবাহিনীর মুঠোয় এসে যাচ্ছে!

কিন্তু পাকিস্তানী বেতারের আশা আর পূর্ণ হলো না। বীর ভারতীয় জওয়ানরা পাকিস্তানী হানাদারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুর্দম বেগে সেকেলে ট্যাঙ্ক আর নিজের দেশে তৈরি 'ন্যাট' বিমান-বহর নিয়ে। ভারতীয় বীর জওয়ানদের শৌর্যবীর্যের মুখে পাকিস্তানী আক্রমণ হলো প্রতিহত। ভারতীয় স্থলবাহিনী সর্বাধিনায়ক জয়ন্তনাথ চৌধুরীর নেতৃত্বে এগিয়ে চললো লাহোর অভিমুখে। পাক-ভারত সংঘর্ষ নিলো নতুন মোড়। পাকিস্তানের যুদ্ধপিপাসা মিটে এল। আয়ুব খাঁ শান্তির জন্য লালায়িত হয়ে উঠলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, ইন্দিরাই মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে প্রথম যিনি সম্মুখ সমরক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি পরিদর্শন করে আসেন। আহত জওয়ানদের সান্ত্বনা দেন পাশে দাঁড়িয়ে। তাদের সুখ সুবিধার তদারক করেন। শহরে শহরে ঘুরে দেশের মনোবল ও যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে জোরদার করে তোলেন। বুঝিয়ে দেন ভারত যুদ্ধ চায়নি। পাকিস্তানের গরীব মানুষেরাও চায়নি। পাকজঙ্গী শাসকরাই চাপিয়ে দিয়েছে এ যুদ্ধ

এদিকে আবার চীনা ড্রাগন তার বিপুল সৈন্য সম্ভার নিয়ে ভারত সীমান্তে এসে ভারতের প্রতি রণহুঙ্কার ছাড়তে ইতস্ততঃ করলো না। আধুনিক মার্কিন যে সমরাস্ত্র নিয়ে পাকিস্তান ভারতের উপর চড়াও হয়েছিল সেগুলো পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছিল। 'সেনট্র্যাল ট্রিটি অর্গানিজেশন' (CENTO) আর 'সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানিজেশন (SEATO)-এর সদস্য হিসাবে রুশ ও চীনা কম্যুনিস্টদের ঠেকাবার জন্য। গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার জন্য নয়। গণতান্ত্রিক ভারত মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে তাই স্মরণ করিয়ে দিলে। প্রেসিডেণ্ট জনসন ভারত আর পাকিস্তানের প্রতি সমান দাওয়াই বাতলালেন। ভারত যেটুকু সাহায্য পেত তাও দিলেন বন্ধ করে। আক্রান্ত ও আক্রমণকারী দু পক্ষকেই সমান চোখে দেখলেন।

সোভিয়েত রাশিয়াই দু-তরফের বিবাদ মেটাতে এলেন এগিয়ে। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেকসি কোসিগিন লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও আয়ুব খাঁকে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করে তাসখন্দে মিলিত হতে আমন্ত্রণ জানালেন।

দু তরফ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে।

১৯৬৬ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে বসলো ঐতিহাসিক এ শান্তি বৈঠক। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী আর বৈদিশিক মন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। আর মার্শাল আয়ুব খাঁ ও জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের।

দীর্ঘ আলাপ আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় উভয় পক্ষ আপন সীমান্তের ওপারে নিজেদের সৈন্যদল ফিরিয়ে নেবে। যুদ্ধ বিরতি রেখা মেনে নেবে।

ভারত পাকিস্তান উভয় দেশই তাতে সম্মতি জানালেন।

বাইশ দিনের লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটলো। উভয় পক্ষ সম্মত হলো নিজেদের মধ্যে বিবাদ মেটাবার জন্য বিবাদ-বিসংবাদ পরিত্যাগ করতে। তাসখন্দ বৈঠকের এ ধারা বস্তুতঃ পাকিস্তানের

নিকট ভারতের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের নামান্তর। যা পাকিস্তান বার বার প্রত্যাখ্যান করে আসছে।

অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করা, বিরুদ্ধ প্রচার বন্ধ করা, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা এবং যে-সব চুক্তি দু' দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত ছিল সেসব পুনরায় চালু করা তাসখন্দ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অপরাপর বিষয়বস্তু।

তাসখন্দ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষ্যে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী এক ভোজসভার আয়োজন করেন। শাস্ত্রীজী এই ভোজসভায় যথারীতি যোগদান করে তাঁর নির্দিষ্ট বাসভবনে ফিরে এলেন। বাসভবনে ফিরেই তিনি পুত্রকে টেলিফোন করলেন দিল্লীতে। ভারতে তাসখন্দ চুক্তির প্রতিক্রিয়া কি জানতে চাইলেন। তাঁর উদ্‌বেগের কারণ, কাশ্মীরের যে গুরুত্বপুর্ণ ঘাঁটিগুলি ভারতীয় জওয়ানরা অধিকার করেছিল তা থেকে তাদের ফিরে আসতে হবে নতুন চুক্তি অনুযায়ী। সে রাত্রেই শাস্ত্রীজী হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং প্রাণত্যাগ করেন দূর বিদেশে। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট মার্শাল আয়ুব খাঁ শাস্ত্রীজীর নশ্বর দেহ বহন করে আনেন ভারতে পরদিন। শত্রুকেও তিনি আপন করে নিলেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে!

লালবাহাদুর শাস্ত্রী (২ অক্টোবর তাঁর জন্মদিন। ২ অক্টোবর গান্ধীজীরও।) ছিলেন জাতির পরম প্রিয় নেতা। মহাত্মাজীর প্রিয় শিষ্য। নেহরুজীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। শান্তি ছিল তাঁর জীবনের শেষ বাণী। পাকিস্তানী আক্রমণ আর চীনের ক্রমবর্ধমান বৈরিতার বিরুদ্ধে মৃদুভাষী বেঁটেখাটো এ মানুষটি যে নির্ভীকতা, রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন, দেশবাসী তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। তিনি নেতৃত্বের এক নতুন বনিয়াদ তৈরি করে গেছেন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে। 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ' শ্লোগান তুলেছিলেন দেশের চরম দুর্দিনে।

ডেকে বলেছিলেন, দেশকে বাঁচাতে হবে শক্তি দিয়ে। শ্রম দিয়ে। এক প্রতিজ্ঞা অস্ত্রের। আর এক প্রতিজ্ঞা খাদ্যোৎপাদনের। কাজের মানুষ শাস্ত্রীজী এ দুই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। রাজনৈতিক দলাদলি, তুচ্ছ স্বার্থ-সংঘাত শান্ত এই মানুষটিকে কোনদিন বিচ্যুত করতে পারেনি তাঁর আদর্শ থেকে।

মাত্র আঠারো মাসের ব্যবধানে (২৭ মে ১৯৬৪ থেকে ১১ জানুয়ারী ১৯৬৬) ভারত তাঁর দুই প্রিয় প্রধানমন্ত্রীকে হারাল।

শাস্ত্রীজীর পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হলেন। ২৫ জানুয়ারী ১৯৬৬ তিনি শপথ গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নিকট।

আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের পর ইন্দিরাজী 'ট্রেজারী বেঞ্চে' প্রধানমন্ত্রীর নির্দিষ্ট আসনের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন। সংসদীয় দলপতি হিসাবে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পিতা জওহরলালও এ আসন করেছিলেন অলঙ্কৃত দীর্ঘকাল। কন্যা ইন্দিরাও আজ এ আসনে বসতে চলেছেন! মাথায় গুরুদায়িত্ব। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও যেন এ গুরুভার বহন করতে পারেন। সংশয় দানা বাঁধে ইন্দিরাজীর মনে। পর মুহূর্তে নিজেকে তিনি সামলে নেন। অনেক দিন আগে লেখা বাবার একটি চিঠির কথা আজ তাঁর মনে পড়ল। জেল থেকে তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন:

'আমরা এমন কিছু যেন কখনো না করি যার জন্যে আমাদের একদিন লজ্জা পেতে হবে। এমন কিছু যেন না করি যা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখতে হবে। গোপন করার চেষ্টা ভীরুর। সে চেষ্টা ভারতের মুক্তিসেনার অযোগ্য।...'

মনের সাহস ও হৃদয়ের বলই হলো সবচেয়ে বড়ো ভরসা—বাবা জওহরলালই তাঁকে এ কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন:

'বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে এ সাহস অবলম্বন করতে হবে।'

তখন তাঁর কিইবা বয়স! মাত্র তের। তিনি আজ দেশের নেত্রী। দলনেত্রী। অথচ ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে, আজকের এ

সম্মানিত পদে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিলেন শাস্ত্রীজী ও পন্থজী। লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও গোবিন্দ বল্লভ পন্থই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিলেন। তাঁদের অনুসৃত পথে যেন তিনি চলতে পারেন। তাঁদের আদর্শ থেকে, কর্মপন্থা থেকে বিচ্যুত যেন না হন।

ইন্দিরাজী আপন মনে কি যেন বলে উঠলেন। কার উদ্দেশে যেন প্রণাম জানালেন।

শ্রীমতী গান্ধী যেদিন প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ নেন সেদিন প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ হোমি জে. ভাবা সুইজারল্যাণ্ডে এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। তার দিন কয়েক পর আর এক বিমান দুর্ঘটনা ঘটে কাশ্মীরে। ভারতীয় বিমান কর্পোরেশনের একটি ক্যারাভেল বিমান—'আকাশদূত' দুর্ঘটনায় পড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বোম্বাই বন্দরে দশ হাজার টনের এক মালবাহী জাহাজও ডুবে যায়।

কেবল অঘটন নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগও রইল অব্যাহত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সঙ্কটও দেখা দিল। যা স্বাধীনতার পর গত বিশ বছরে সাধারণতন্ত্রী ভারতকে সম্মুখীন হতে হয়নি। ১৯৬৫-র পাক-ভারত ২২ দিনের লড়াই থামলেও তার ধকল তখনও মেটেনি। যুদ্ধের জন্যে অর্থনৈতিক সঙ্কট মাথা চাড়া দিল। অনাবৃষ্টির জন্যে আগের বছর ভারতে ফসল ভালো হয়নি। এবারও ভালো নয়। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, কেরালায়। তার মধ্যে কেরালায় সবচেয়ে বেশি। গম ভোজনে অনভ্যস্ত কেরলে হঠাৎ চালের সরবরাহ কমে যাওয়ায় কেরলবাসীদের একরূপ উপবাসে দিনযাপন করতে হয়।

শ্রীমতী গান্ধী তখন সবেমাত্র প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি কেরালার নিদারুণ খাদ্য সঙ্কটে রাজধানীতে বসে থাকতে পারলেন না। ত্রিবান্দ্রমে ছুটে গেলেন। গভীর সহানুভূতিতে ভরে উঠল

তাঁর মন। নিজের বরাদ্দ রেশনটুকু পর্যন্ত দান করলেন। মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে করে চাল আনিয়ে কেরলের খাদ্য পরিস্থিতি আনলেন আয়ত্তে।

ওড়িশা থেকে অতিরিক্ত চাল বাইরে রপ্তানী হওয়ায় ঐ রাজ্যের কয়েকটি খরা অঞ্চলে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ওড়িশার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সেখানে যান।

পশ্চিমবঙ্গে আগের বছরের মার্চ মাসে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন তীব্র আকার নিয়েছিলো। খাদ্য সংকট এত চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল যে বিধিবদ্ধ রেশন অঞ্চলগুলিতে ন্যূনতম রেশন সরবরাহও সম্ভব হচ্ছিল না। খোলা বাজারে চালের দাম হু হু করে বেড়ে গেল। প্রতিবাদে, খাদ্যশস্যের দাবিতে ডাকা হলো হরতাল! 'বাংলা বন্‌ধ'! শহর ও শহরতলির বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিল সন্ত্রাস। হিংসাত্মক কার্যাবলী। সরকারী সম্পত্তির বিনাশ। পুলিশের গুলীবর্ষণ। বহু হতাহত। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা নিজে বাংলায় ছুটে এলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিরোধীদলের শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীত্রিদিব চৌধুরী প্রমুখদের পাঠালেন বাংলায়।

উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানের কয়েকটি স্থানেও খাদ্যসংকট দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ, অনাহারে মৃত্যু ঘটে। দেশের খাদ্যাভাব আরও সঙ্গীন হয়ে ওঠে যখন মুষ্টিমেয় জোতদার ও মুনাফালোভী খাদ্যশস্য মজুত করতে শুরু করে। এর উপর সরকারী খাদ্যবণ্টন নীতিরও গলদ দেখা দেয়। এ নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামাও শুরু হয়।

এ পরিস্থিতিতে মার্কিন খাদ্য সরবরাহের অনিশ্চয়তা অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ভারতকে জরুরী সাহায্য পাঠাতে শুরু করলে আমেরিকার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। প্রেসিডেন্ট জনসন ন'লক্ষ টন খাদ্য ভারতে পাঠাতে অনুমতি দেন। কিন্তু এ সরবরাহ ছিল শর্তসাপেক্ষ। তবু ভারত এ 'ম্যাচিং এড' শর্ত

মেনে নিলে। অর্থাৎ অন্যান্য দেশ ভারতকে যে পরিমাণ খাদ্য পাঠাবে, আমেরিকাও সে পরিমাণ খাদ্য দেবে।

খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য ইন্দিরাজী কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে ব্রতী হলেন। পতিত জমির পুনরুদ্ধার ও ব্যাপক সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করলেন। শস্য ক্রয় বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করলেন।

দেশের কৃষি বিশেষজ্ঞদের ডেকে 'অধিক খাদ্য ফলাও' পরিকল্পনা পেশ করতে নির্দেশ দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য উপদেষ্টাও পাঠালেন। ইন্দিরাজীর এ 'সবুজ বিপ্লব' সেদিন সফল হয়নি বটে, কিন্তু আজ ভারত খাদ্য উৎপাদনে নিজের চাহিদা নিজে মেটাতে চলেছে। এমন কি উদ্‌বৃত্ত অংশ নিজে রপ্তানী করতেও।

খাদ্যাভাব ও উৎপাদন হ্রাসজনিত সঙ্কটকে আরও জটিল করে তুলল ভারতে বিদেশী ঋণের বোঝা আর বিদেশী পুঁজির আধিপত্য। ১৯৪৮ সালে ভারতে যেখানে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ছিল ২৫৫.৮ কোটি টাকা, ১৯৬২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৩৫.৫ কোটি টাকায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব মতে ১৯৬৩-৬৫ সালে ভারতে আরও ৯০.৩৩ কোটি টাকার বিদেশী পুঁজি অনুপ্রবেশের অনুমতি লাভ করে।

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় টাকার দামও বিশেষভাবে হ্রাস পায়। সরকারী হিসাবে এক ডলার সমান পৌনে পাঁচ টাকা থাকলেও বেসরকারী বাজারে তার দাম হয় দশ টাকা। ভারতের বৈদেশীক মুদ্রার চাহিদার তুলনায় পণ্যরপ্তানীর সামর্থ্য কম হওয়াই টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাসের প্রধান কারণ।

এ অবস্থার প্রতিকারকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ৬ জুন ১৯৬৬ সালে টাকার আন্তর্জাতিক বিনিময়-মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেন (তখন কেন্দ্রীয় অর্থসচিব ছিলেন শ্রীশচীন চৌধুরী)। শ্রীমতী গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে এটিই বুঝি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্ত। এ মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর থেকে

যাবতীয় পণ্যের মূল্য হু হু করে বেড়ে চলে। যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বিদেশ থেকে কাঁচামাল এনে দেশের প্রয়োজন পূরণ করতে হয়, টাকার আন্তর্জাতিক বিনিময়-মূল্য হ্রাস পাওয়ায় তাদের পক্ষে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের উদ্দেশ্য তাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। কারণ টাকার দাম কমানোর পরেও তার পাউণ্ড ও ডলারের তুলনায় বেসরকারী আনুপাতিক মূল্য সরকারী আনুপাতিক মূল্যের চেয়ে কম থেকে গেল। সেজন্য বিদেশ থেকে বেশি টাকা আগের মতো গোপন পথে ভারতে আসতে থাকে বা হুণ্ডির মাধ্যমে লেনদেন হতে থাকে। ফলে বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের সুযোগ থেকে ভারত সরকার যথাপূর্ব বঞ্চিত থেকে যায়।

খাদ্যাভাব, শিল্প সঙ্কট, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি অনিবার্যভাবে ভারতের সমাজ জীবনে অবাঞ্ছিত নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। দেশ-জোড়া খাদ্য আন্দোলন, ছাত্র অশান্তি, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের পুনরভ্যুত্থানের প্রয়াসকে করলো সহায়তা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাশ্মীর, কাশ্মীর থেকে কেরল পর্যন্ত ছাত্র অশান্তি পড়ল ছড়িয়ে বারুদের আগুনের মতো। ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দিলো অনেক স্থলে। ছাত্র বহিষ্কারের প্রতিবাদে কলকাতার সরকারী কলেজ মাসের পর মাস রইল বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রায় অচল। এর উপর গোহত্যা বন্ধের দাবিতে নয়াদিল্লীর রাজপথে কয়েক লক্ষ ত্রিশূল, কুঠার তরবারিধারী নাগা সন্ন্যাসী ('নগ্ন সাধু') যে তাণ্ডব শুরু করলো (৭ নভেম্বর ১৯৬৬) আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তার বুঝি নমুনা মেলে না।

এ গোহত্যা আন্দোলনের পিছনে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল জন-সঙ্ঘের সক্রিয় রাজনীতি। জনসঙ্ঘ দিল্লীতে এসব উগ্রমূর্তি নগ্ন সাধুদের নিয়ে এসেছিলেন পার্লামেণ্টের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে গোহত্যা বন্ধের দাবিতে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ এ সাধুসঙ্ঘের ছিলেন সভাপতি। লোকসভার অধিবেশন তখন

চলছিল। মারমুখী এ সব নাগা সন্ন্যাসী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পার্লমেণ্টের উপর চড়াও হলো। গাড়ি, সরকারী বাসভবন পোড়াতে করলে শুরু। লোকজন যাকে পেল তাকে মারধর। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের বাড়িতেও হামলা শুরু করলে। শ্রীকামরাজ কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। দেরিতে হলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ পুলিশ তলব করলেন। কিন্তু তার আগেই বিক্ষোভকারীরা সরকারী সম্পত্তি ও মূল্যবান দলিল দস্তাবেজ পুড়িয়ে নষ্ট করলে।

শ্রীমতী গান্ধী দিল্লীতে ছিলেন না। বিহারে খরাক্লিষ্ট অঞ্চল পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে ছুটে এলেন। লোকসভায় বললেন, এ আক্রমণ কেবল সরকারের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের জীবনধারারই বিরুদ্ধে। হিংসাকে হিংসা দিয়েই রুখতে হবে বলে তিনি সংসদে জানালেন।

এদিকে কংগ্রেস পার্টি মিলিত হয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অপসারণের দাবি জানালে। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড গোড়া থেকেই ইন্দিরার উপর আধিপত্য বিস্তারের ফিকিরে ছিল। ইন্দিরাকে দিয়ে নিজেদের মর্জিমাফিক কাজ হাসিল করার চেষ্টায়। এবার ওঁরা মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন দাবি করলেন। ইন্দিরাজীও তাঁর মন্ত্রিসভায় উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া অবাঞ্ছিত দু'তিন জন বিশিষ্ট মন্ত্রীকে বাদ দেবার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু এতদিন পেরে উঠছিলেন না। এবার সে সুযোগ এসে গেল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দর স্থলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীযশোবন্ত রাও চ্যবন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ করলেন।

নাগা সন্ন্যাসী ছেড়ে জনসঙ্ঘ এবার পুরীর জগৎগুরু শঙ্করাচার্যকে নিয়ে এল দিল্লীতে। গোহত্যা আইন বাতিলের উদ্দেশ্যে তাঁকে দিয়ে আমরণ অনশন শুরু করালে।

এদিকে হয়েছে কি, জগৎগুরু শঙ্করাচার্য অনশন করবেন কি, তাঁর দর্শনের জন্য ভক্তরা সব ছুটে এল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা আশঙ্কা করে সরকার শঙ্করাচার্যকে প্রিভেনটিভ্ আইনে আটক করার হুকুম

দেন। এবং পণ্ডিচেরিতে নিয়ে যান। নিয়ে গিয়ে সরকারী অতিথি-রূপে আটক করে রাখেন। জগৎগুরুও ভক্তদের সনির্বন্ধ অনুরোধে অনশন ত্যাগ করেন। নিরক্ষর ভারতবাসীর অন্ধ কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যে এভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে পুনরভ্যুত্থানবাদী প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি।

শুধু গোহত্যা নিবারণ আন্দোলন নয়, ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের দাবিও এ সময় জোরদার হয়ে ওঠে। যে সংসদীয় রাজ্যবিন্যাস কমিটি গঠিত হয় (ইন্দিরাজীও তার সদস্য) তা পাঞ্জাবী ভাষাভাষী রাষ্ট্রের দাবি মেনে নেয়। কিন্তু এ দিয়ে গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল। এ বিক্ষোভ দিল্লীতে পড়ল ছড়িয়ে। সেখানকার হিন্দুরা এক শিখ-মন্দির ঘেরাও করে ফেলে। মন্দিরের ভিতরকার শিখেরাও কৃপান খাড়া করে প্রস্তুত হলো। তাণ্ডব বুঝি শুরু হয়ে যায়। ঠিক সে মুহূর্তে শিখ গুরুদ্বারের সামনে এসে থামল একখানি গাড়ি। আর গাড়ি থেকে নামলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। যারা এ বিক্ষোভের মূলে তাদের তিনি করলেন নিন্দা। বললেন :

'আমার চোখে আর জল নেই। বুকে আমার জ্বলছে ক্রোধের আগুন। নিজেদের মধ্যে এমনিতর হানাহানির জন্যই কি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ? এত আত্মত্যাগ ? আত্মবিসর্জন ?'

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তেও দেখা দিল আরো নতুন বিপদ। সেখানকার নাগা ও মিজো অধিবাসীরা নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হলো। ভারত, পাকিস্তান ও বর্মা সীমান্তবর্তী দুর্গম গিরিসঙ্কুল এ অঞ্চলে বিদ্রোহী গেরিলাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মদত দিচ্ছিল জঙ্গীশাহী পাকিস্তান। ফলে ঐ বিদ্রোহী গেরিলা দল আসামের ব্যাপক অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস, ডিনামাইটের সাহায্যে ট্রেন উড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি অন্তর্ঘাত-মূলক কার্য অব্যাহত রাখে।

দূরদর্শিনী ইন্দিরা বুঝতে পারলেন সীমান্তবর্তী এ পার্বত্য এলাকার

স্বাধীন মানুষের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবির যৌক্তিকতা তিনি উপেক্ষা করতে পারবেন না। (বস্তুতঃ জানুয়ারী ১৯৭২-এ তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্তের অধিবাসীদের এ দাবি মেনে নেন এবং মেঘালয়, অরুণাচল ও মিজোরাম এ তিনটি নতুন রাষ্ট্রের উদ্‌বোধন করে আসেন। নাগাল্যাণ্ড রাষ্ট্রের পত্তন আগেই হয়েছিল।) আসামে গিয়ে তিনি তাই সেখানকার রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন যাতে বৈরী নাগা ও মিজোদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা যায়। কিন্তু পাকিস্তান ও চীনের পরোক্ষ উস্‌কানির ফলে মিটমাটের চেষ্টা তখন ব্যর্থ হয়। গেরিলাদের তৎপরতা পেল বৃদ্ধি। ইন্দিরা তখন বাধ্য হয়ে উপদ্রুত এলাকায় বোমাবর্ষণের নির্দেশ দেন।

রাজনৈতিক বিক্ষোভ—জাতীয় সংহতি বিরোধী তৎপরতা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ, মহীশূর-মহারাষ্ট্র সীমান্ত বিরোধ, সন্ত ফতে সিং-এর স্বতন্ত্র পাঞ্জাব, মাষ্টার তারা সিং-এর শিখিস্তানের দাবি, ক্রমবর্ধমান ছাত্র অশান্তি, আর জাতীয় সম্পত্তির বিনাশ চললো ঝড়ের গতিতে। কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেন। সফলও হন অনেক ক্ষেত্রে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করেন সমস্যার।

এদিকে কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যেসব সদস্য আর সিণ্ডিকেট গোষ্ঠীর যাঁরা ইন্দিরাকে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছিলেন তাঁরা দেখলেন ইন্দিরা খুব সহজ মেয়ে নন। নিজের সিদ্ধান্ত বা নীতি সহজে বিসর্জন দেবার পাত্রী নন। অপরের অঙ্গুলি সংকেতে চালিত হতে রাজী নন তিনি। কাজেই ওঁরা তখন নতুন প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। কেন্দ্র সরকারের খাদ্যনীতির শুরু করলেন সমালোচনা।

খাদ্য আমদানী আর বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকার ফলে ভারত নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। মার্কিন সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা বুঝি পিতার জোটনিরপেক্ষ নীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন।

বিরোধী দলও তাঁকে মার্কিন-ঘেঁষা বলে অভিহিত করতে কসুর করলো না। ইন্দিরা কংগ্রেস পার্টির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন :

'বেশ তো, আপনারা যদি আমার নীতির সমর্থন না করেন, আপনারা তো আপনাদের দলনেতাকে পরিবর্তন করতে পারেন। আমাকে অপসারিত করুন।'

তখন কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। সবাই চুপচাপ। পার্টি সদস্যরা কেউ প্রধানমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সম্মত নন।

বিজয়িনী ইন্দিরার হল জয়। পরদিন সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হলো :

নেহরু নীতি বহাল।

'লালগোলাপে'র প্রত্যাবর্তন !

ইন্দিরাজী যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন তখন তাঁকে তাঁর প্রাক্তন আর দুজন প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় অধিকতর গুরুদায়িত্বের সম্মুখীন হতে হয়। যে পরিস্থিতির মোকাবিলা তাঁকে করতে হয় তা জওহরলাল বা লালবাহাদুর কাউকেই করতে হয়নি। দেশে খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি, জীবনযাত্রার ব্যয় যেভাবে ফেঁপে ওঠে তা ইতিপূর্বে তেমন দেখা দেয়নি। প্রতিপক্ষও আইন ও শৃঙ্খলা ব্যাহত করে সরকারকে কোনঠাসা, বিপর্যস্ত করতে ছাড়েনি। ভারতে যে স্থিতি ও সংহতি গত আঠারো বৎসরে অটুট ছিল এবার তাতে ফাটল ধরতে শুরু করলো।

শ্রীমতী গান্ধী জওহরলালের মতো অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য বেসরকারী সংস্থাগুলিকেও সমান অগ্রাধিকার দানে বিশ্বাসী ছিলেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা—জাতীয় কংগ্রেসের এ লক্ষ্যই ছিল ইন্দিরাজীর আদর্শ। দেশের মধ্যে গান্ধীজীর আদর্শগত 'গরিবী হটাও' নীতি ইন্দিরাজী

অনুসরণ করতে চাইলেন। আর বৈদেশিক ব্যাপারে পিতা জওহরলালের মতো স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ নীতির পূর্বানুবৃত্তি।

১৯৬৬ সালের অক্টোবরে ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে তিন জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র—যুগোশ্লাভিয়া, মিশর ও ভারতের শীর্ষ নেতৃ-সম্মেলন আরম্ভ হয়। এ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ জোট-নিরপেক্ষ নীতিতে অবিচল আস্থা প্রকাশ করেন। এবং জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির বৈষয়িক উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দেন।

ইন্দিরাজীর বৈদেশিক নীতির ফলে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের বহু দেশের সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। রোডেশিয়ায় শ্বেতাঙ্গ শাসন কায়েম হওয়ার বিরুদ্ধে ভারত আফ্রিকার দেশগুলির মতোই প্রতিবাদ জানালে তীব্র ভাষায়। এবং রোডেশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলে। উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমা বর্ষণের প্রতিবাদ জানালে। ভিয়েতনামে মার্কিন কার্যকলাপ সমর্থনের জন্য মার্কিন সরকারের সমস্ত রকম চাপ ভারত অগ্রাহ্য করলে। পরিষ্কার জানিয়ে দিলে—ভিয়েতনাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া দরকার। মার্কিন সরকার ভারতে প্রতিশ্রুত খাদ্য আসা সহসা বন্ধ করে দিলেও ভারত তার নীতিগত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলো না।

নানা দুর্যোগ দুর্ঘটনার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার কার্যক্রম শুরু। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশে ক্ষমতাসীন। কোন কোন নেতা ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ দেখা দিল নিজেদের মধ্যে। ১৯৬৭-র নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে অনেকেই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে উৎসুক হয়ে উঠলেন। মনোনয়ন লাভে বঞ্চিত যাঁরা তাঁদের অনেকে আবার ক্ষুব্ধ হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করলেন বা গড়ে তুললেন ভিন্ন দল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারী মহলেও অসন্তোষ ক্রমশঃ ধূমায়িত হতে থাকে।

কংগ্রেস বিরোধীরা এর সুযোগ নিলে। কংগ্রেস পার্টিকে

গদিচ্যুত করে ক্ষমতা দখলের জন্যে তারা কোমর বেঁধে উঠলো। বামপন্থী কম্যুনিস্ট দল (সি. পি. আই., সি. পি. এম.) থেকে আরম্ভ করে হিন্দু সাম্প্রদায়িক জনসঙ্ঘ, রক্ষণশীল পুঁজিবাদী স্বতন্ত্র পার্টি (প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা রাজাগোপালাচারী এর প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৫৫ সালে।) সবাই এ ক্ষমতাদখলের প্রতিযোগিতায় তৎপর হয়ে উঠলো।

দেশের এই পটভূমিতে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭-তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চললো। স্বাধীন ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন। দলনেত্রী হিসাবে নির্বাচনের প্রধান দায়িত্ব ইন্দিরাজীকে নিতে হলো। ১৯৬২ সালের তৃতীয় নির্বাচনেও নির্বাচনী প্রচারের কাজে তাঁকে সক্রিয় অংশ নিতে হয়েছিল পিতা জওহরলালের ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন। কলকাতা থেকে শ্রীনগর, শ্রীনগর থেকে দূর ত্রিবান্দ্রম, দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্ত থেকে আসামের প্রত্যন্ত প্রদেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে তিনি কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারকার্য চালাতে শুরু করলেন। গাড়ি, গো-শকট, ট্রাক, এরোপ্লেন, যানবাহন যা পেয়েছেন তাই ব্যবহার করে কংগ্রেসের নির্বাচনী সভায় সভায় বক্তৃতা করে বেড়ালেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রচারের মুখে প্রতিপক্ষের বক্তব্য বানচাল হয়ে গেল। তখন ওরা কোন কোন ক্ষেত্রে গুণ্ডামী আর হিংসাত্মক পন্থার আশ্রয় নিলে। কংগ্রেসের নির্বাচনী সভা পণ্ড করার জন্য ভাড়াটে লোক লেলিয়ে দিতে বিরোধীদলগুলি সচেষ্ট হলো। কোন কোন কংগ্রেসী মন্ত্রীর উপরও চড়াও হলো। গাড়ি পুড়িয়ে দিতেও ছাড়ল না।

ওড়িশায় এমনি এক নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে একদিন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা স্বতন্ত্র প্রতিপক্ষ দলের বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। বিরোধীদল কিছু ভাড়াটে লোকও বুঝি আমদানী করেছিল। শ্রীমতী গান্ধীর বক্তৃতা শুরু হলে ওরা আরম্ভ করে দিলে বিক্ষোভ, হৈচৈ। এক টুকরো ইঁট বুঝি কে বা কারা প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলে ভিড় থেকে। ইঁটখানি এসে লাগলো প্রধানমন্ত্রীর

মুখে। নাকের ওপর। উঃ, বলে প্রধানমন্ত্রী সহসা গোঙিয়ে উঠলেন। রুমালখানা বার করে চেপে ধরলেন ক্ষতস্থানে। ছোট্ট রুমালখানা রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো। দু-এক ফোঁটা রক্ত শাড়ীর উপরও ঝরে পড়ল। সিকিউরিটি পুলিশ দল ছুটে এল। প্রধানমন্ত্রীকে বক্তৃতা বন্ধ করে সভাস্থল ত্যাগ করতে অনুরোধ জানালে। উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও তাই অনুরোধ করলেন। বললেন বক্তৃতা বন্ধ করে বসে পড়তে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সে অনুরোধ কানে তুললেন না। বক্তৃতার খেই তিনি হারালেন না। যেমন বলছিলেন তেমনই বলে চললেন। ক্রুদ্ধ জনতাকে লক্ষ্য করে এবার বললেন :

'আজকে আমাকে যে অপমান করা হলো সে অপমান আমার প্রতি নয়। সে অপমান সারা দেশের। কেননা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমি দেশরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকি।'

শ্রীমতী ইন্দিরা রক্তেরাঙা রুমালখানা দিয়ে নাকটা আবার মুছে নিলেন। তারপর বক্তৃতার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপর এ ভীরু কাপুরুষোচিত আক্রমণের জন্য সমগ্র দেশ ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে উঠল। ভোটদাতারা হীন আক্রমণকারীদের পার্টিকে চিনে নিতে ভুললো না। নির্বাচনে রায় দিল তার বিরুদ্ধে।

দিল্লীতে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী নাকের ক্ষত নিয়ে। হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো। ক্ষত স্থানে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন দেখা দিল। ছোট অপারেশন। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে ছোট পিসী কৃষ্ণা হাতিসিং-এর টেলিফোন কল পেলেন বম্বে থেকে। তাঁর কুশল বার্তার উত্তরে ইন্দিরা একরূপ নাকী সুরে বলে উঠলেন :

'এ দেখ না চিট্টি, অ্যানেসথেসিয়ার পর ডাক্তারবাবুকে আমি বললাম—আমার নাকটার জায়গায় প্লাসটিক সার্জারি করে সুন্দর একটা নাক বসিয়ে দিন। আমার নাকটা তো বিশ্রী! তাহলে সুন্দর একটা নাক মিলতো। ভালোই দেখাতো। অমন সুযোগটা মাঠে মারা গেল। ডাক্তারবাবু হতাশ করলেন।'

ঘটনাটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী অবশ্য ঠাট্টা করতে ছাড়লেন না। কিন্তু ব্যাপারটা গড়াল অনেক দূর।

ওড়িশার ঘটনার দিনকয়েক আগে জয়পুরেও এমনি এক বিরাট জনসভায় নির্বাচনী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ইন্দিরাজী। গো-হত্যা নিষিদ্ধ করণের সমর্থনে জনসঙ্ঘের কর্মীরা সভা পণ্ড করার উদ্দেশে হৈ-চৈ, গোলমাল শুরু করে দিলে। বক্তৃতা দিতে দিতে প্রধানমন্ত্রী একবার থামলেন। তারপর বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে বলে উঠলেন :

'আমি তোমাদের এমনিধারা বিক্ষোভ প্রদর্শনে ভীত নই। আমি জানি এর পিছনে কারা রয়েছে। কোন দলের হয়ে তোমরা মাতব্বরী করতে এসেছ।'

ইন্দিরাজী তারপর বললেন :

'তোমরা গিয়ে তোমাদের মহারাজা আর মহারানীদের জিজ্ঞাসা করে এস তাঁরা তাঁদের রাজত্বকালে প্রজাদের জন্যে দেশের মধ্যে কটা নলকূপ স্থাপন করেছিলেন? বৃটিশ আমলে নিজেরা তো প্রজাদের টাকায় গাড়ি হাঁকিয়েছেন। খানাপিনা করেছেন। বিলাসের মধ্যে ডুবে ছিলেন। নিজেদের গরীব প্রজাদের জন্য কতটুকু ভেবেছেন? তোমাদের জন্যে কতটুকুই বা করেছেন?'

বিক্ষোভকারীদের মুখ তখন স্তব্ধ হয়ে গেল।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা সারা ভারতে নির্বাচনী প্রচার করে বেড়ালেন। শুধু তাই নয়, নিজের নির্বাচন কেন্দ্রও পরিদর্শনে এলেন। পিতা জওহরলালের ফুলপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হতে তাঁকে ভোটদাতারা সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। তিনি তা এড়িয়ে স্বামী ফিরোজের বেরিলি কেন্দ্রেই প্রার্থী হলেন।

১৪

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। '৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ছিল সারা ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী দল। কিন্তু আভ্যন্তরিক কোন্দলের ফলে কংগ্রেস '৬৭-র চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত হলো সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল জাতীয় কংগ্রেস। কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার, ত্রিপুরা, মহীশূর, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের এক একটি প্রভাবশালী অংশ দলছুট হয়ে জনকংগ্রেস বা ভিন্ন নামে সংগঠন গড়ে তুললো।

নেহরুহীন ভারতে এই প্রথম নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস হয়ে পড়ল অভ্যন্তরীণ কলহে জর্জরিত।

বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসকে জমিদার ও জায়গীরদারদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হলো।

তার উপর আছে গো-হত্যা সম্পর্কিত নীতি। গো-হত্যা নিষিদ্ধ-করণ আইনের সমালোচনায় ঝড় তুললো বিরোধী পক্ষ। ভাষানীতিও কংগ্রেসকে বিব্রত করে তুললে অনেকখানি। আর অর্থনৈতিক নীতির সমালোচনা তো ছিলোই।

অবশ্য কংগ্রেস যেমন নানাদিক থেকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, তেমনি পড়েছিল কংগ্রেসবিরোধী শক্তিগুলিও।

এ অবস্থায় জনগণের রায় নেওয়া হলো। কিন্তু নির্বাচকদের রায়ের অধিকাংশই যায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।

১৯৬৬-র নির্বাচনে কংগ্রেসের উপর জনগণের আস্থা হ্রাস পেলেও কংগ্রেস লোকসভায় শতকরা ৫৫ ভাগ ভোট লাভ করে।

অবশ্য এর আগেকার নির্বাচনে কংগ্রেস পায় লোকসভায় শতকরা ৭০টি আসন।

১৬টি রাজ্য, একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের বিধানসভার মধ্যে নয়টি রাজ্য কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে যায়। মাত্র আটটি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়। নির্বাচনে হেরে গেলেও কংগ্রেস কিন্তু প্রতি রাজ্যে পরিণত হয় একক বৃহত্তম দলে। অবশ্য কেরল ও মাদ্রাজ-এ আর তা হলো না। সিণ্ডিকেটপন্থী যেসব প্রবীণ নেতা ইন্দিরাকে একদা দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই নির্বাচনে গেলেন হেরে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার পরাজিত হলেন এক স্বল্প-পরিচিত ছাত্র প্রার্থীর নিকট।

যে সব রাজ্যে বিরোধী দল জয়লাভ করে তাদের অনেকেই কোয়ালিশন সরকার গঠনে প্রয়াসী হয়। কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট প্রভাবিত যুক্তফ্রন্ট সরকার হলো প্রতিষ্ঠিত। ওড়িশাতে স্বতন্ত্র দল এবং মাদ্রাজে ডি. এম. কে. ক্ষমতায় আসে। পাঞ্জাবেও কোয়ালিশন সরকার হয় গঠিত।

যদিও শ্রীমতী গান্ধী তাঁর রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হলেন, তবুও তাঁর বুঝতে দেরি হল না যে পার্টি হিসেবে কংগ্রেসের লোকপ্রিয়তা সাধারণের মধ্যে উবে আসছে। কংগ্রেসের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। কংগ্রেস জনসাধারণের কাছ থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কংগ্রেসকে পুনরায় সঞ্জীবিত করতে হলে তার নতুন দাওয়াই দরকার। তাকে ঢেলে সাজাতে হবে নতুন করে। যুবশক্তিকে কংগ্রেসের পক্ষছায়ায় আনতে হবে। অবাঞ্ছিতদের বাছাই করে বাদ দিতে হবে। সমাজতন্ত্রের পথে, প্রগতির স্রোতে হাল ধরতে হবে কংগ্রেস তরণীর। ভুবনেশ্বরের জনসভায় ইঁট ছুঁড়ে মারার ঘটনাটি বুঝি তারই ইঙ্গিত। ছায়া পূর্বগামী!

আজ তাঁর মনে পড়ল জানুয়ারী ১৯৩১ সালে জেল থেকে লেখা বাবার একখানি চিঠির কথা। বাবা লিখেছিলেন:

'আজ তোমাকে চিঠি লিখতে বসে মনে হলো, সুদূর মেঘগর্জনের

মতো যেন বহু কণ্ঠের একটা অস্ফুট গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি, শুধু মনে হলো শব্দটা যেন চেনা-চেনা, যেন বুকের মধ্যে তার অনুরণন বাজছে। জনতা নিকটতর হলে কথা-গুলোও স্পষ্টতর হলো, আর বুঝতে বাকী রইল না। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সমস্ত কারাগার মুখর হয়ে উঠলো। মনটা খুশীতে ভরে উঠলো। আমাদের এত কাছাকাছি, কারাপ্রাচীরের ঠিক অপর পাশেই কারা যে বিপ্লবের বাণী ঘোষণা করে চলে গেল জানি না। হয়তো তারা এই শহরেরই লোক, হয়তো তারা গাঁ থেকে এসেছে—কৃষকের দল। নাই বা জানলাম ওরা কোথাকার লোক—ওদের ওই নতুন যুগের আবাহন মন্ত্রে আমাদের সমস্ত মন যেন নীরবে সাড়া দিল।'

'ইনকিলাব জিন্দাবাদে'র অর্থ কী? বাবাই তারপর ব্যাখ্যা করেছিলেন। লিখেছিলেন কেনই বা আমরা বিপ্লব চাই। জানিয়েছিলেন:

'ভারত আজ অনেক কিছু নতুন করে গড়তে চায়। যে বিরাট পরিবর্তন সে চায় তা যখন সার্থক হবে, যখন স্বরাজ পাবে, তখনও কিন্তু ভারতের চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না।

'আমাদের দেশে এখন আমরা একটা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা অবশ্যই স্বাধীনতা চাই—কিন্তু তার চেয়েও আরও কিছু বেশি চাই। আমরা সব আবদ্ধ জলাশয়গুলির রুদ্ধ গতিপথ মুক্ত করে দিয়ে সর্বত্র জলপ্রবাহ আনতে চাই। আমাদের দেশ থেকে দুঃখ দৈন্য মলিনতা ঝেঁটিয়ে দূর করতেই হবে। আর যতদূর পারা যায়, দূর করতে হবে বহু লোকের মনে আবরণ-স্বরূপ সেই মাকড়সার জাল, যা তাদের চিন্তাশক্তি লুপ্ত করে দিয়েছে এবং আমাদের মহৎ কাজে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। এটা খুব বড়ো কাজ। হয়তো এতে সময়ও লাগবে যথেষ্ট। লাগাও ধাক্কা, হেঁইয়ো জোয়ান, ইনকিলাব জিন্দাবাদ!'

পরিশেষে তিনি লিখেছেন:

'...কালের চাকা ঘুরে চলেছে। যারা তলায় চাপা পড়েছিল তারা আজ উপরে উঠে আসছে। উপরওয়ালারা নেমে যাচ্ছে নীচে। এ দেশের চাকা ঘোরার সময় এসেছে এবার। চাকার গায়ে কাঁধ লাগিয়ে এবার আমরা এমন ধাক্কা দেব যে সে চাকার ঘূর্ণি আর কেউ থামাতে পারবে না।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!'

বাবার এ চিঠিগুলি তাঁর জীবনের পাথেয়। নিজেকে নিজে গড়ে তোলার উপাদান। শুধু নিজেকে গড়ে তোলার নয়। দেশকে গড়ে তোলারও।

তাই বুঝি বাঙ্গালোর কংগ্রেসের অধিবেশনে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর খসড়া পেশ করলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসে সিণ্ডিকেট গোষ্ঠীর নেতারা এর করলেন তীব্র বিরোধিতা। এ নিয়ে যে মতবিরোধ দেখা দিল তার পরিসমাপ্তি ঘটলো কংগ্রেস বিভাগের মধ্যে। ইন্দিরাজী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে সংঘবদ্ধ হলেন প্রগতিশীল কর্মপন্থার সার্থক রূপায়ণের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে যাবার পর লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্ন দেখা দিল। ইন্দিরাজী অবশ্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমর্থন পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মসূচীর সফল বাস্তব রূপায়ণের জন্য তা যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে যখন তাঁকে কোন কোন ক্ষেত্রে বামপন্থী দলগুলির সমর্থনের উপরও নির্ভর করতে হচ্ছিল।

শ্রীমতী গান্ধী এবার লোকসভাকে ভেঙে নতুন করে গড়ার কাজে অগ্রসর হলেন। তিনি লোকসভা বাতিলের সুপারিশ করলেন। রাষ্ট্রপতি শ্রীভি. ভি. গিরি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ মতো লোকসভা বাতিলের নির্দেশ দেন। অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের আদেশ করলেন জারী।

১৯৭১ সালের লোকসভা উপনির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হলো।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের লোকসভা সদস্যের সংখ্যা ছিল ২৮৩। '৭১-এ শ্রীমতী গান্ধীর অনুগামীরা জিতলেন বিপুলভাবে। মোট ৫১৫টি আসনের ৩৫০টিই তাঁরা দখল করলেন। আর বিরোধী কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ৬৫ থেকে কমে গিয়ে মাত্র ১৬টিতে দাঁড়াল। এ জয় শ্রীমতী গান্ধীর। তাঁর প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর।

১৯৭১ সালে লোকসভার উপনির্বাচনে কংগ্রেস জনসাধারণের বিপুল সমর্থন লাভ করে। লোকসভায় শ্রীমতী গান্ধী সুপ্রতিষ্ঠিত করেন নিজেকে।

১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে ভারতের ষোলটি রাজ্য, একটি কেন্দ্র শাসনাধীন অঞ্চল এবং দিল্লীর মেট্রোপলিটান কাউন্সিলের (তামিলনাড়ু, কেরল, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ এবং অরুণাচল এ নির্বাচনের আওতার বাইরে ছিল।) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭২-এর নির্বাচনে যে প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল তা হলো '৭১ সালের মতো এবারেও কি শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস জয়-গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করতে সমর্থ হবে?

এবারের নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য দিক দুটি। এক বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আর অপরটি সমাজতন্ত্রের পথে দেশের অগ্রগতি।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ইন্দিরাজীর সফল ভূমিকা তাঁকে মহান করে তুলেছিল দেশবাসীর কাছে। বাংলাদেশের প্রশ্নে ইন্দিরাজীর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সার্থক। মুক্তিসংগ্রামে সমস্ত রকমের সাহায্যে ছাড়াও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্যে তিনি যে চেষ্টা চালিয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন তাতে শুধু ভারতের বা বাংলাদেশের কাছে নয়, বিশ্বের জনসাধারণের কাছে তিনি বিপুল অভিনন্দন লাভ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বুঝেছিলেন যে, 'গরিবী হটাবার' যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন জনসাধারণের নিকট তা রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন রাজ্যে রাজ্যে কেন্দ্রের মতো গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও

সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী স্থায়ী এবং কেন্দ্রের সহযোগী সরকার। তাই '৭২-এর নির্বাচনে তাঁর মূল শ্লোগান ছিল: 'কেন্দ্রে রাজ্যে এক সরকার চালু কর।'

শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচকমণ্ডলীর উদ্দেশে এক খোলা চিঠির মারফত আবেদন করেন:

'আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করেছি। এক কোটি শরণার্থীর সসম্মানে ও নিরাপদে স্বদেশে ফেরার ব্যবস্থা করেছি। এবার আমাদের আরও বড় যুদ্ধে লড়তে হবে। এ লড়াই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।'

তিনি তারপর মনে করিয়ে দেন:

'দৃঢ়তা ও একতার মনোভাব নিয়ে এ সংগ্রামের সামিল হতে হবে। জনগণ ও প্রশাসনকে কাজ করতে হবে একযোগে। নীরব দর্শক হয়ে থাকলে চলবে না।'

নির্বাচনী প্রচারকার্যে বোম্বাইয়ের এক জনসভায় শ্রীমতী গান্ধী শান্তিপূর্ণ পন্থায় ধনবৈষম্য দূর করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন: 'তা না হলে দেশে হিংসা ও রক্তাক্ত বিপ্লব দেখা দেবে।'

তিনি উল্লেখ করেন ১৯৭১ সালের লোকসভা উপনির্বাচনের কথা। সেবার জনসাধারণ কেন্দ্রে একটি স্থায়ী, শক্তিশালী সরকার গঠনের স্বপক্ষে রায় দিয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী তাই বলেন:

'এখন সকলকে আবার সে কাজ করতে হবে। রাজ্যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার। তাহলেই ভারত পারবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সমস্যাবলীর সমাধান করতে।'

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ১৯৭২ সালের নির্বাচনে যে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালান তা এক কথায় অভূতপূর্ব। কংগ্রেসের ইতিহাসে তার কোনো নজীর মেলে না। ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জওহরলাল যে প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন তাকেও হার মানায়। দীর্ঘ পঁচিশ দিন ধরে শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচনী প্রচার চালান। ১৬টি রাজ্য এবং ছুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে 'ঝটিকা সফর' করেন। মোট ২৫০টি

জনসভায় তিনি ভাষণ দেন। সারা ভারতের প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল পথ তিনি করেন পরিভ্রমণ। তিন কোটিরও বেশি লোক তাঁর ভাষণ শোনার পায় সুযোগ। এক দিল্লীতেই তিনি ভাষণ দেন ১৫টি জনসভায়।

শ্রীমতী গান্ধী নয় দিনে তিন বার পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। এখানে তিনি ২৬টি জনসভায় বক্তৃতা করেন। কলকাতা নিয়ে রাজ্যের ১৬টি জেলারই জনসভায় ভাষণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারে সৃষ্টি করেন এক রেকর্ড।

প্রতিপক্ষ বামপন্থী দলগুলি ইন্দিরা সরকারের সমালোচনা করতে ছাড়ল না। দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে শাসক কংগ্রেস 'স্বৈরাচারের' আশ্রয় নিয়েছে। ইন্দিরাজীর 'গরিবী-হটাও' সমাজতান্ত্রিক বুলি কেবল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করারই শ্লোগান বলে উল্লেখ করতে ওরা ছাড়ল না! অভিযোগ করলে, স্বাধীনতা লাভের পর গত ২৪ বছর ধরে কংগ্রেস এক নাগাড়ে পুঁজিবাদ বিকাশের পথে দেশকে পরিচালনা করে আসছে। তাই দেশব্যাপী আজ এমন অর্থনৈতিক সঙ্কট। মাথাপিছু ঋণের বোঝা ২০০ টাকারও বেশি।…'ঘরে ঘরে বেকার কেন? ইন্দিরা সরকার জবাব দাও'—*দেয়ালে দেয়ালে প্রতিপক্ষের শ্লোগান।*

কিন্তু পদ্মার বাঁধভাঙা বন্যার মতো 'ইন্দিরা তরঙ্গের' মুখে বিরোধী দলের সব তোড়জোড়, সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেল।

নির্বাচনে কংগ্রেস লাভ করল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। রাজ্যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলো স্থায়ী, শক্তিশালী কংগ্রেস সরকার। সে তালিকায় রইল গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, আসাম, অন্ধ্র, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, জম্মু ও কাশ্মীর এবং রাজস্থান। বাদ গেল না পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, হরিয়ানা, বিহার ও পাঞ্জাব। দিল্লীর মেট্রোপলিটান কাউন্সিলেও কংগ্রেসের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলো, যা এতদিন ছিল জনসঙ্ঘের দখলে। ভিন্ন চিত্র দেখা দিল শুধু মেঘালয় আর কেন্দ্রশাসিত গোয়ায়।

১৮

দেশবিদেশ থেকে শত শত চিঠিপত্র প্রতিদিনই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট এসে থাকে। এদের অনেকগুলি আবার রাজনৈতিক কূটনীতি বিষয়ক। বেশির ভাগই ব্যক্তিগত। শ্রীমতী গান্ধী সেগুলি আগ্রহ সহকারে পাঠ করে থাকেন। সে সব চিঠিপত্রের উত্তর দিতে তিনি মোটেই দেরি করেন না। তিনি অনেক চিঠিরই মুখে মুখে উত্তর বলে যান। আর বিশেষ ধরনের চিঠিগুলি নিজের হাতেও লেখেন। তা যে কোন ধরনেরই হোক না কেন, তিনি কসুর করেন না উত্তর দিতে।

১৯৬৮ সালের শেষের দিকে বোম্বাইয়ের একটি কিশোরী তাঁকে এমনি একখানি পত্র লেখে। এ পত্রে মেয়েটি তাঁর স্টাইল ও চলচ্চিত্র সেন্সরের কথা, বেশভূষা, বিদেশী জিনিসের প্রতি জনসাধারণের পক্ষপাতিত্বের কথা—এমনি অনেক কিছুই খুশিমতো লিখে জানাল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে।

শ্রীমতী গান্ধী তখন বিহারে সফর করে বেড়াচ্ছিলেন। রাঁচী থেকে তিনি তার উত্তর দিলেন। লিখলেন :

'তোমার চমৎকার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। দেশের অনেকে হয়ত সিনেমার ব্যাপারে তোমার মতের সঙ্গে সায় দেবে। দেশের পাঁচ-ছয় কোটি বাৎসরিক সিনেমা-দর্শকের মধ্যে বেশিসংখ্যকই সিনেমা ভালবাসে।

'জনসাধারণ যা পছন্দ করে অনেক সময় যে তাই ঠিক, এমন নয় কিন্তু। সুরুচি সব সময় সহজাত হয় না। আমার তো মনে হয় যারা অল্পবয়স্ক তারাই কেবল এ নিয়ে মাথা ঘামায়।

'রুচি আর ভব্যতার বাছবিচার যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়।

আমাদের দেশে পবিত্র মন্দির আর দেবালয় গাত্রে এমন অনেক চিত্র ও খোদাই করা মূর্তি আছে যাদের গায়ের উপরদিককার অঙ্গবাস নেই। সেযুগে তাদের কুরুচিপূর্ণ বলা হতো না। এমন অনেক সমাজ রয়েছে যেখানে পোশাক-আশাকের ব্যাপারে কড়াকড়ি রয়েছে, সেখানেও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধ-দল দেখা যায়। সময় সময় এই বিদ্রোহীদের মধ্যে মহৎ শিল্পীও জন্মলাভ করেন। তাঁরা মনে করেন গতানুগতিক ধারা বাস্তবতাকে ঢেকে রাখে।

'প্রত্যেক দেশে অশ্লীলতাকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে আইন আছে। কিন্তু এ আইনগুলিও পরিবর্তন সাপেক্ষ। আমাদের দেশে কোন চিত্র দর্শকের সামনে প্রদর্শিত হবার পূর্বে তাদের বিশেষ 'সেন্সর' করিয়ে নেওয়ার রেওয়াজ আছে। অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ চিত্রের অংশবিশেষ কিংবা যে চিত্র ঘৃণা ও হিংসা প্রণোদিত তা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবার পূর্বেই বস্তুতঃ কেটে বাদ দেওয়া হয়।

'কিন্তু তুমি ঠিকই লিখেছো। আমাদের দেশে অনেক চলচ্চিত্র আছে যা মাঝারি গোছের। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদানের রীতি এখনও আমাদের মধ্যে বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

'তুমি তোমার চিঠিতে আরও লিখেছো যে, আমাদের দেশের লোক আজকাল নিজ নিজ ভাষাতান্ত্রিকতা ও প্রাদেশিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সব দেশই এমন ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদিকে ঝোঁকেনি তার কারণ সেখানে সব লোক এসে জুটেছিল বাইরের ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে। আমাদের দেশে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে গিয়ে বসবাসের নজীর বড় একটা নেই। শিল্পের দ্রুত উন্নতি আর শহরের উন্নয়ন ঘটলেই জনসাধারণ প্রকৃত পাঁচমিশালী জনসাধারণে পরিণত হতে পারে।

'ঔপনিবেশিক শাসনকালে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। দাবিয়ে রাখা হয়েছিলো তাকে ভ্রূকুটি দেখিয়ে। বিশেষতঃ এ কারণেই আজকাল দেশের মধ্যে ভাষাগত বিক্ষোভ ও আঞ্চলিকতার ঝড় উঠেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজনৈতিক কারণে

এ পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি। আমরা অনেকেই এর বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এমন বহু দেশও রয়েছে যেখানে আঞ্চলিক মনোভাব বিস্ময়করভাবে জোরদার। বৃটেনের কথা ধরা যাক। সেখানে স্কটিশ ও ওয়েলশ্ জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন রয়েছে বিদ্যমান। বেলজিয়ামে সংঘর্ষ হয় ফরাসী ও ওয়াল্লুনদের (Walloon) মধ্যে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইংল্যাণ্ড আর সাদার্ন আনুগত্যের মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান।

'বিদেশী উৎপাদন ও বিদেশী নামকরণের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তাকে নিন্দা করে তুমি ঠিকই করেছ। তবে কি জান, সব দেশের লোকের মধ্যে বাহির বিশ্বকে রঙ্গীন চোখে দেখার প্রবণতা আছে। আমাদের তো বটেই। কেননা বিদেশী শাসনের জাঁতাকলে কেটেছে আমাদের দীর্ঘ দিন।

'অধিকতর আত্মনির্ভরতার দিকে আমরা এগিয়ে যাবো। বিদেশী বাজার আমরা যখন গড়ে তুলতে পারবো আমাদের পণ্যদ্রব্য দিয়ে আর নিজেদের শিল্পদ্রব্যের মারফত স্থানীয় পণ্যদ্রব্যের লেনদেন যখন গড়ে তুলতে পারবো, তখনই আমাদের এ হীনমন্যতা ঘুচবে। ইত্যবসরে আমাদের প্রয়োজন—আরও অনেক লোক যেন দেশের পণ্যদ্রব্যে গর্ববোধ করে। আর তা লোকের কাছে যেন গর্ব করে বলে বেড়ায়।'

শ্রীমতী গান্ধীর আর একটি চিঠি। এ চিঠি লেখা হয়েছিলো ১ জানুয়ারী ১৯৬৯ সালে কলকাতার কোন পত্রলেখককে :

'আপনার চিঠি পেয়েছি। ধন্যবাদ।

'আপনার চিঠি পেয়ে আমি ভাবছি যাঁরা দেশের কাজ করেন তাঁদের কতখানিই না দায়িত্বভার বহন করতে হয় নিজ স্কন্ধে। দেশের সব সমস্যার জবাবদিহি আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁদের ঠিক পথে চালিত করার প্রশ্ন নয়। আমি কেবল ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি আমার সাধ্যমত।

'আমাদের সকলকে বিশ্বাসে বুক বাঁধতে হয়। জ্ঞান আমাদের বাড়িয়ে তুলতে হয় সদাসর্বদা। আপনি জানতে চেয়েছেন বিশ্বাস আর জ্ঞানের মধ্যে কোনটা শ্রেয়। কথা হচ্ছে একটিকে বাদ দিয়ে অপরকে নিয়ে আমরা কি বাঁচতে পারি ?'

ইরান ও ভারতের মৈত্রীসূত্রে রাখীবন্ধন দৃঢ়তর করে ইরানের শাহানশাহ্ ও তাঁর পত্নী শাহবানন ১৯৬৮ সালে ভারত ভ্রমণে আসেন। শ্রীমতী গান্ধী তখন একটি ইরানী মেয়েকে নিচের এ চিঠিখানি লিখেছিলেন। তিনি লেখেন :

'তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। আমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভালবাসি। বিশেষ করে ছোট মেয়েদের। কেননা, আমার যে কোন বোন নেই। আমার আবার কোন মেয়েও নেই।

'তোমার চিঠিখানি কিন্তু খুব সুন্দর। কি সুন্দর হস্তাক্ষর। আমি যদি আমার ঠাকুরদা বা বাবার মতো হতাম তাহলে ফারসী ভাষায় তোমার চিঠিখানি পড়তে পারতাম। তোমার চিঠিখানি আমি অনুবাদ করিয়ে নিয়েছি। তাছাড়া, আমাদের উর্দু ভাষায় অনেক ফারসী শব্দ আছে।

'আমি তোমার সঙ্গে একমত যে, যুদ্ধবিগ্রহ মোটেই ভাল নয়। বস্তুতঃ ভারতে আমাদের নীতি হলো সব রকম বিবাদ-বিসংবাদের মূল অনুসন্ধান করা। তাই আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে— যুদ্ধ আর নয়, এ চুক্তি করতে চাই। আমরা কখনও যুদ্ধ করতে চাই না। কিন্তু কেউ যদি আমাদের দেশ আক্রমণ করে তবে আমরা তা প্রতিরোধ করব। তাই ঘটেছিল গত বৎসর। পাকিস্তানী সৈন্য-সামন্ত ভারতের উপর হামলা করে বসল। কাজেই আমাদের সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে হলো সে আক্রমণ। হটিয়ে দিলাম ওদের।

'আমার বাবা ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি কখনও ভয় অথবা ঘৃণা কাকে বলে জানতেন না। সারা জীবন তিনি শান্তির কাজ করে

গেছেন। সকল দেশ শান্তি ও বন্ধুত্বের মধ্যে বাস করুক তাই আমরা চাই।

'আমি আশা করি, তুমি ভারতের বন্ধু হয়ে উঠবে। এবং ভারত ও ইরানের মৈত্রী বৃদ্ধি করবে।'

মার্চ, '৭২ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফরে যান। সেখানকার মানুষ কি গভীর ও আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে এর প্রতীক্ষা করছিল তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় একটি ১৪ বছরের ছেলের চিঠিতে। ছেলেটির নাম মৈনুল আশান সাবেরা। ঢাকার গভর্ণমেণ্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র সে। শ্রীমতী গান্ধীকে লেখা এই কিশোরের চিঠির মধ্যে তার সবুজ প্রাণের অনাবিল ভালবাসার নির্মল সুর বেজে উঠেছে।

মৈনুল লিখেছে:

'আপনি আমাদের এই গরীব বাংলাদেশে আসবেন জেনে কী যে আনন্দ হচ্ছে! আমরা ভাষায় সে আনন্দ প্রকাশ করতে পারছি না।

'গত ২৪ বছর ধরে খানেরা আমাদের এই দেশকে শোষণ করেছে। ২৫ মার্চ থেকে পাক সেনারা (সত্যি তারা সেনা নয়, তারা পশুরও অধম) আমাদের বাবা মা ভাই বোনকে খুন করেছে। বাড়ীঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। আমাদের মা বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে।

'এই অন্ধকারতম দিনে আপনি আমাদের নরপশুদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আপনার মতো এমন সম্মানীয়, এমন প্রিয় অতিথিকে বাংলাদেশ এর আগে অভ্যর্থনা জানাবার আর সুযোগ পায়নি। আপনার এই সফর আমাদের অন্তরে প্রেরণা এনে দেবে।

'আপনার জীবন মানবজাতির সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত। আল্লা আপনাকে দীর্ঘ জীবন দিন, অবিচ্ছিন্ন আনন্দ দিন এবং সর্বাঙ্গীণ সাফল্য দিন।

'আমি আশা করব আপনি এই চিঠির উত্তর দেবেন। আপনার একটি ফটোগ্রাফও এই সঙ্গে পাঠাবেন।'

অবিশ্রান্ত নির্বাচনী অভিযানের মধ্যেও শ্রীমতী গান্ধী একটু সময় করে নিয়ে ছেলেটির চিঠির উত্তর দিয়েছেন। লিখেছেন :

'প্রিয় মৈহুল, তোমার সুন্দর চিঠির জন্য ভালবাসা জেনো। তোমার দেশ স্বাধীন হওয়ায় তুমি কী যে খুশী হয়েছ, তা বুঝতে পারছি। আমার বয়েস যখন তোমার বয়সের মতো ছিল, তখন আমিও ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে এমনি করে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

'কিন্তু মনে রাখবে, স্বাধীনতা মানে যা খুশি তাই করার ছাড়পত্র নয়। স্বাধীনতা মানে তোমার যা করা উচিত, তাই করা। সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার ডাক এই স্বাধীনতা তোমাদের কাছে এনে দিয়েছে।

'তুমি বলেছ, বাংলাদেশ গরীব। ভারতও তো ধনী দেশ নয়। তবে তার পরিধি অবশ্য অনেক বড়। কিন্তু একথা সত্য, স্বাধীনতার আগে আমরা যেমন গরীব ছিলাম, এখন অবশ্য তা নই।

'আমি ঢাকা যাবার দিন গুণছি। আমাদের দেশের মানুষের অভিনন্দন, ভালবাসা তোমাদের দেশের মানুষের জন্য বয়ে নিয়ে যাব। জানবে ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে শুধু তাদের নিজেদের দেশের জন্য যে কাজ করতে হবে তাই নয়, অন্যান্য দেশের সঙ্গে মৈত্রীর জন্য, সহযোগিতার জন্যও কাজ করতে হবে। আর কাজ করতে হবে যারা উৎপীড়িত, অপমানিত, দরিদ্র, তাদের মুক্তির জন্য।'

—ইন্দিরা গান্ধী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কেবল দেশনেত্রী নন, ব্যক্তিগত জীবনে দু'সন্তানের জননীও। মমতাময়ী মা। কেউ কেউ মনে করেন, ইন্দিরাজী বুঝি উদ্ধত স্বভাবের মেয়ে। জীবনে তাঁর কোনরূপ আগ্রহ নেই। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। ইন্দিরা অবশ্য ছোটবেলা থেকে ছিলেন কিছুটা লাজুক প্রকৃতির। অনেকটা একা একা নিঃসঙ্গ জীবন তাঁকে কাটাতে হয়েছে শৈশবে। লোকজন, হাজার কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে এখনো তাঁর অনেক সময় মনে হয় নিজেকে একক।

নিঃসঙ্গ, অসহায়। বুঝি নিস্পৃহ। কোন কোন সাক্ষাৎকারী তাই তাঁকে ভেবে থাকেন।

পরিপাটি বেশভূষা করতে শ্রীমতী ইন্দিরা ভালইবাসেন। তাঁর ওয়ার্ডরোব ভর্তি থাকে রঙ-বেরঙের নানান শাড়ী আর কাশ্মীরী শালে। 'মিনক' কোটও পরেন বিদেশ সফরে গিয়ে। প্রসাধনে তাঁর এক সময় অরুচি ছিল না! হালকা ঠোঁটরঞ্জনী ব্যবহার করতে ভালবাসতেন। পায়ের নখ রঞ্জিত করতেন। তবে হাই-হিল জুতো তিনি পছন্দ করেন না। ১৯৬৬ সালে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার পর প্রেসিডেণ্ট জনসনের আমন্ত্রণে শ্রীমতী গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে। এ তাঁর প্রথম আমেরিকা ভ্রমণ নয়। তবু ওয়াশিংটনে পদার্পণ করেই বিশেষ সম্মানিত অতিথিটি অমনি ছুটে গিয়েছিলেন 'হেয়ার ড্যু' করাতে বাইরে প্রটোকল আর সিকিউরিটির বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে। শুধু তাই নয়, যেখানে তিনি যেতেন যথাসম্ভব সেখানকার বেশভূষায় নিজেকে সজ্জিত করার চেষ্টা করতেন। রোমে গিয়ে রোমানী হতেন। যস্মিন দেশে যদাচারঃ!

অবশ্য একথা ঠিক, ছোটবেলায় ইন্দিরাকে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। গান্ধীজীর সাবরমতী আশ্রম বা পুণার ভকীল দম্পতির স্কুলে এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। এমনকি শান্তিনিকেতনের কলেজ জীবনেও নয়। অপরাপর মেয়েদের মতো মায়ের দামী শাড়ী পরা তাঁর কপালে জোটেনি। কেননা, কমলাও নেহরু পরিবারের আর সব মেয়েদের মতো নিজের মূল্যবান পোশাক 'বিলেতী দ্রব্য বর্জন' আন্দোলনের সময় পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে' নিয়েছিলেন। স্বামী ফিরোজ নবপরিণীতা বধুকে অবশ্য সাজাতে চাইতেন। শোভন ও শৌখীন শাড়ী ও অঙ্গাভরণ এনে দিয়েছিলেন নানা স্থান থেকে। কিন্তু ইন্দিরার কপালে তা পরে সেজেগুজে থাকা আর হয়ে ওঠেনি। সেদিনকার কথা তাঁর আজও মনে পড়ে।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে

জওহরলালের সঙ্গে মেয়ে ইন্দিরাও গিয়েছিলেন লণ্ডনে। বান্ধবীদের কেউ কেউ বুঝি তাঁকে তখন বহুমূল্য অলঙ্কার কিছু পরিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন :

'রাজকীয় উৎসবে যোগদান করতে যাচ্ছ, এখন এসব কিছু পরে না গেলে কি মানায়? লোকেই বা কি বলবে?'

ইন্দিরা তাই বুঝি পরেছিলেন দামী এক কণ্ঠহার। সেটা পরে ইন্দিরা যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, জওহরলালের চোখ তা এড়াল না। ভ্রূ কুঁচকে বলে উঠলেন :

'অত সাজগোজ করার, সঙ্ সাজার কি দরকার? যাও ওসব খুলে এস গে।'

'সে আমি বুঝবো। তোমাকে ভাবতে হবে না।' ইন্দিরা বাবার মুখের ওপর বলে উঠলে। তারপর গজগজ করতে করতে গাড়িতে চাপলেন। সে গয়না পরেই তিনি অভিষেক উৎসবে যোগদান করতে গেলেন।

তারপর অবশ্য অভ্যাগতদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁকে অনেকবার সাজগোজ করতে হয়েছে। কিন্তু কোনোবারই জড়োয়া গয়না অঙ্গে তিনি চাপাননি। বন্ধুবান্ধবের পীড়াপীড়িতেও না। হেসে বলেছেন :

'আমি বুড়ো হয়েছি, ওসব কি এখন আমায় সাজে? রেখে দাও, বৌমারা পরবে।'

কিন্তু পুত্রবধূরও বা শাশুড়ীর দেয়া গয়না আর পরা হলো কই! বাষট্টি সালের চীনা আক্রমণের সময় শ্রীমতী গান্ধী যে তাঁর সব সোনার গয়না 'জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে' দান করে বসেছেন।

এক নম্বর সফদারজঙ্গ রোডে প্রধানমন্ত্রীর ছোট বাসভবনটির দিকে তাকালে কিন্তু বোঝা যায় সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পকলা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কতখানি মিশে গেছে তাঁর। শোভন ও সুরুচির ছাপ ঘরে ও বাইরে সর্বত্র। অনাড়ম্বর ড্রয়িংরুমটি নাতিপ্রশস্ত। খান-কয়েক সোফা। কাঠের স্থাপত্য শিল্পের তুটি নিদর্শন ও পুষ্পাধার। দেয়ালে যেখানটায় চুল্লী ছিল সেখানটা সিল্ক রংয়ের কাঠের

আবরণে আবৃত। দেয়ালে দু-একটি তৈলচিত্র। আর দুখানি রঙীন আলোকচিত্র—একখানি পিতা নেহরুর। অপরটি স্বামী ফিরোজ গান্ধীর। বসবার ঘরে ঢুকবার প্রবেশ পথের দেয়ালে ঝুলানো অটোগ্রাফ করা অনেকগুলি বাঁধান ফটোগ্রাফ। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন, জাকির হোসেন, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতাদের। পথের এক স্থলে ব্রোঞ্জ ধাতুর গণেশের একটি মূর্তিও চোখে পড়ে। বসবার ঘরের এক কোণে স্ট্যাণ্ডের উপর সযত্নে রক্ষিত শ্রীশ্রীতারার মূর্তি। অনতিদূরে ম্যাণ্টলপীসের পাশে বইয়ের একটি শেল্‌ফ। আর তাতে রয়েছে নগুচি, থিওডোর হোয়াইট, লুই ফিশার, কে. পি. এস. মেনন, জর্জ কেনন, টম বোয়া, জঁা পল সাত্রঁ, এলডুস হাক্সলে, ইউজিন আয়োনেসকো, জোসেফ ক্যাম্পবেল, জে. কৃষ্ণমূর্তি প্রমুখ বহু লেখকের গ্রন্থ সজ্জিত। 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী'ও রয়েছে সেখানে। পুস্তকগুলি থেকে গৃহকর্ত্রীর শিক্ষা সংস্কৃতি ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দিরা গান্ধীর প্রিয় ফল আম ও লিচু। আপেলও তার মধ্যে পড়ে। পেনট্রিঘরে রৌপ্যাধারে সাজানো থাকে নানা ধরনের এমনি সব ফল। পাশে ছোট শেল্‌ফে দেশবিদেশের রান্নাবান্নার গুটিকয়েক বইও নজরে পড়বে। এক হলো 'রাউণ্ড দি ওয়ার্লড কুকবুক', 'এ কমপ্লিট ভেজিটেরিয়ান রেসিপি বুক' আর 'ইট এণ্ড গ্রো বিউটিফুল'। এমনি আর একখানি বই 'দি অমলেট বুক'। এটা ফিরোজ গান্ধীর। অমলেট নিজের হাতে তৈরি করতে গিয়ে বুঝি বইখানির পাতা উল্টেছেন অনেকবার। মাধু, পেপী আর পুতলী—গৃহপালিত কুকুর তিনটি গৃহকর্ত্রীর আশেপাশে ঘুরঘুর করতে থাকে কিছু খাবারের আশায়।

শ্রীমতী গান্ধীর দিনের কাজ হয় রাজধানীর বাইরের ডজনখানেক দৈনিক সংবাদপত্রের উপর সাত তাড়াতাড়ি এক নজর চোখ বুলিয়ে নেয়ার মধ্যে। বিরূপ কোন মন্তব্য নজরে পড়লে তিনি তৎক্ষণাৎ

সেটা ব্যক্তিগত সহকারীর দৃষ্টিতে আনেন। নির্দেশ দেন সেটা তুলে রাখতে আর বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে। সাড়ে সাতটায় তাঁর একান্ত সচিব এসে পড়েন সরকারী কাগজপত্র নিয়ে এবং দৈনন্দিন দেখা সাক্ষাৎ ও কর্মসূচীর তালিকা স্মরণ করিয়ে দিতে। সাড়ে আটটায় প্রধানমন্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন তাঁর অগণিত সাক্ষাৎ অভিলাষীদের সঙ্গে মোলাকাত করতে এবং বাগানের লনে রঙীন সামিয়ানার নিচে প্রায়ই সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের পর্ব সারতে। দেশ-বিদেশের দর্শনপ্রার্থী নানা ছাত্র, শিক্ষক, পাদ্রী, রিলিফকর্মী, বৈদেশিক ভ্রমণকারীর দল—অনেকেই আসেন সকাল বেলা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। প্রধানমন্ত্রী যথারীতি সময় করে দেখা করেন। তাদের ফাই-ফরমাশ বা অভিযোগ যথাসাধ্য পূরণ করার চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন তাদের অভিযোগের প্রতিকারের। দশটা নাগাদ তিনি তাঁর সাউথ্ ব্লক সরকারী দপ্তরে গিয়ে হাজির হন। সেক্রেটারিরা সব দরকারী ও জরুরী ফাইলপত্র নিয়ে উপস্থিত হন সেখানে। মন্ত্রী, আমলা বা বৈদেশিক দূতাবাসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিশেষ কাজ থাকলে তা সমাপন করার পালা এবার। অভ্যাগত কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রপ্রতিনিধিকে সংবর্ধনা বা বিদায় জানাতে হলে পালাম বিমান বন্দরেও ছুটতে হয় গাড়ি নিয়ে প্রোটোকল বজায় রাখতে দস্তুর মতো।

একটা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী ঘরে ফেরেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়। অনেক সময় তাঁকে বাইরে বাইরে খেয়ে নিতে হয় সম্মানিত অতিথিদের সংবর্ধনা ভোজে। ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর তাঁকে আবার ছুটতে হয় আপিসে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে হয়। জরুরী আলাপ আলোচনাও। সোমবার ও মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীকে সবচাইতে বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। কেন না সংসদের অধিবেশন কালে এ দু'দিনই তাঁকে বিরোধী পক্ষের প্রশ্নোত্তরের হতে হয় সম্মুখীন। কোন মন্ত্রী বেকায়দায় পড়লে তাঁকেই এগিয়ে এসে করতে হয় আবার মুশকিল আসান।

সন্ধ্যায় সভা-সমিতি বা কোন মিটিংয়ে যেতে না হলে তিনি কংগ্রেস পার্টিবৈঠকে উপস্থিত থাকেন। কংগ্রেস সংসদের নানা কাজে থাকতে হয় ব্যস্ত। অভ্যাগতদের সংবর্ধনা সভাতেও প্রায় উপস্থিত থাকেন মবলংকার হল বা অন্য কোথাও। এছাড়া রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতির দেওয়া সংবর্ধনা ভোজে কিংবা হায়দরাবাদ হাউসে সরকারী নৈশভোজে যোগদান তো করতে হয়ই। কিংবা হয়ত কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। কিছুক্ষণ থেকে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে বেরিয়ে পড়তে হয় অপর কোন এনগেজমেণ্ট রাখতে।

সফদারজঙ্গ রোডের বাসভবনে ফিরতে রাত ন'টারও বেশি অনেক দিন হয়ে যায়। বসবার ঘরে ঢুকে দেখেন বিশেষ দর্শনার্থীদের অনেকে তখনও হয়ত তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। তারপর সংক্ষিপ্ত নৈশাহার শেষ করে বিছানায় গিয়ে আবার জরুরী ফাইল নিয়ে বসা। ঘুমাতে অনেকদিন রাত ছুপুর হয়ে যায়। প্রিয় কুকুর ক'টি গৃহকর্ত্রীকে বুঝি তখন লক্ষ্য করতে থাকে নীরবে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শারীরিক ব্যায়ামের সময় পান না প্রধানমন্ত্রী এখন আর। তাছাড়া পৌত্র রাহুলের পরিচর্যার তদারক তাঁকে করতে হয় নিজে। নইলে ছোটবেলা থেকেই তাঁর অভ্যেস শারীরিক কিছু না কিছু ব্যায়াম করা। ছোটবেলায় এলাহাবাদে থাকতে তিনি ঘোড়ায় চড়তেন। সুইজারল্যাণ্ডে বরফের উপর স্কী করতেন। কাশ্মীরে গিয়ে নাগিন হ্রদে সাঁতার কাটতে ভালবাসতেন আর হিমালয়ের পাহাড়-পর্বতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে। এখন অবশ্য কোনটাই হয়ে ওঠে না। ভোরবেলা উঠে বাগানে পায়চারি করতে করতে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রিয় জন্তু-জানোয়ারদের দেখাশুনা, তদারক করতে ভোলেন না।

'আচ্ছা আপনি যদি একদিন ছুটি পান, তাহলে কিভাবে কাটাবেন?'

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলেন পুণা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের একদল ছাত্র-ছাত্রী ২৭ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে।

'আমি ছুটির কথা কল্পনাও করতে পারি না'—জবাব দিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

'আপনার ব্যক্তিগত জীবনে সখ বলতে কিছু আছে কি?' সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের আবার প্রশ্ন।

'আমার ব্যক্তিগত জীবনে সখ বলতে যা বোঝায় তা হলো বেশ কিছু পড়াশুনা করা, ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি কাজকর্ম দেখা, বাগানে গিয়ে তদারক করা, কি কি রান্না হবে তার তালিকা তৈরি আর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। আর যদি বেশি সময় হাতে পাই, তবে পাহাড়ে যাই এবং দীর্ঘ পথ হাঁটতে ভালবাসি।' জবাব দিলেন শ্রীমতী গান্ধী।

শ্রীমতী গান্ধী আরো বললেন, 'প্রতিদিন বেশ কিছুটা সময় নাতনী প্রিয়ংকা আর নাতি রাহুলের সঙ্গে কাটাই। প্রতিদিন ভোরে আমি সবার আগে ঘুম থেকে উঠি। আমি একটানা নয় ঘণ্টা ধরে ঘুমুতে ভালবাসি। কিন্তু বরাতের ফেরে তা হয় না। আমি সাধারণতঃ মাত্র পাঁচ ঘণ্টা ঘুমাই। ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময় আমি প্রতিদিন মাত্র দু'ঘণ্টা ঘুমাতাম।'

শিল্পকলার প্রতি শ্রীমতী গান্ধীর গভীর অনুরাগ আজকের নয়। শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের পাদপীঠে। কোন শিল্পীকে বা তাঁর সৃষ্টিকে, বিশেষ করে আধুনিক শিল্পকলাকে যদি কেউ উপহাস করেন, শ্রীমতী গান্ধী অনেক সময় তার প্রতিবাদ জানান। যদিও তিনি কোন বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীর সমর্থক নন তবুও আধুনিক শিল্পকলার প্রতি তাঁর মমতাবোধ রয়েছে। সঙ্গীত চর্চার প্রতি তিনি সমান অনুরাগী। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় সঙ্গীতই তিনি শুনতে ভালবাসেন। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় রেডিও খুলে তিনি কিছুক্ষণ গান শুনতে ভোলেন না। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভক্ত হলেও শ্রীমতী গান্ধী আধুনিক লঘু সুরের এবং সুগম সঙ্গীতের প্রতিও বিতৃষ্ণ নন। নাচের ক্ষেত্রেও তাই। লোকনৃত্য তাঁর খুবই প্রিয়। আর মণিপুরী নৃত্য তো তিনি শিখেছিলেন শান্তিনিকেতনে।

বই কেনার বাতিক বাবার মতো শ্রীমতী গান্ধীরও। মতিলালের মৃত্যুর পর নেহরু পরিবারে যখন কৃচ্ছ্রসাধনা চলছিল তখনও কিন্তু বই কেনার এ শখ থেকে তাঁকে কেউ বিরত করতে পারেনি। এখনও সময় পেলে এয়ার পোর্টের বুক সপে বা রেলওয়ে স্টেশনের বুকস্টলে ছুটে যান তিনি। সময় কাটাবার জন্যে বইপত্র কিছু একটা কিনে আনেন। হালে প্রকাশিত কোন বই পেলে তো কথাই নেই। তিনি তা গোগ্রাসে গিলে নিতে দেরি করেন না। আর নতুন কোন দেশে গিয়ে প্রথমেই তিনি মিউজিয়াম অথবা আর্ট গ্যালারী দেখতে ভোলেন না। থিয়েটারে বা অপেরাতেও যান সময় পেলে। আর কবিতার বই পেলে তো কথাই নেই! পিতা নেহরুর মতো ইন্দিরাও কবিতা পড়তে ভালবাসেন। শ্রীমতী গান্ধীর প্রধান সংবাদ উপদেষ্টা মিঃ সারদাপ্রসাদ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন :

'জুন ১৯৬৫ সালে শ্রীমতী গান্ধী লণ্ডনে গিয়েছিলেন নেহরু স্মারক প্রদর্শনীতে যোগদান করতে। এ প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড উইলসন। সেদিনই আবার এলবার্ট হলে এক কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান হবে খবর পেলেন শ্রীমতী গান্ধী। তিনি অমন সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। সকলের অলক্ষ্যে এক সময় তিনি এলবার্ট হলে ঢুকে পড়লেন প্রদর্শনীর কর্মসূচীর ফাঁকে। তারপর কবিতা পাঠ শুনে বেরিয়ে এলেন। ভাগ্যিস কোন রিপোর্টার বা ফটোগ্রাফারের নজরে তিনি পড়েননি। তাই রক্ষে।'

খাটবার ক্ষমতাও তাঁর অপরিসীম। দৈনিক ষোল থেকে আঠারো ঘণ্টা একনাগাড়ে তিনি কাজ করে যেতে পারেন। ক্লান্তিবোধ করেন না। উনিশশো একাত্তরের পাক-ভারত লড়াইয়ের সময় রাত্রে তিনি কোনদিন দু ঘণ্টাও ঘুমোতে পারেননি। বিশ্রাম পাননি। গত '৭২-এর নির্বাচনে তিনি দৈনিক বারো তেরোটি জন-সভায় বক্তৃতা করেছেন। দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে গিয়েছেন তিনি বিমানে, হেলিকপ্টারে, গাড়িতে। নারী হয়ে

তিনি যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তা কোনো পুরুষের পক্ষেও সচরাচর সম্ভব নয়। মাত্র পাঁচ দিনে শ্রীমতী গান্ধী তিনটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে নির্বাচনী সফর করেছিলেন। তাঁর এ দুর্দম কর্মশক্তির প্রেরণা কোথায়? জানতে চেয়েছিলেন এক মহিলা সাংবাদিক। মৃদু হেসে প্রধানমন্ত্রী জবাব দিয়েছিলেন: 'আমি যা বিশ্বাস করি, তাই-ই করি এবং আমার যা করার তাই-ই করি!'

এত সব কায়িক ও মানসিক ধকলের পরেও স্বাস্থ্য তাঁর রয়েছে অটুট। বস্তুতঃ ১৯৬০ সালে যকৃতের অস্ত্রোপচারের পর তাঁকে বড় রকমের কোন অসুখে শয্যাশায়ী হতে হয়নি। অবশ্য সংসদের দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর অধিবেশনের পর তাঁকে কিছুটা যে অবসন্ন হতে হয় না, এমন নয়। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের। একটু পরেই তিনি তার জের কাটিয়ে ওঠেন। একটানা দিনের পর দিন কাজও তাঁকে কাবু করতে পারেনি। একদা এডওয়ার্ড টমসন লণ্ডনে তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে নেহরুকে যা লিখেছিলেন তা এতদিনে বুঝি মিলে গেল।

শুধু অদম্য কর্মশক্তি নয়, সাহসিকতার দিক থেকেও তিনি অনন্য। বাবাকেও যান হার মানিয়ে। নভেম্বর ১৯৬২ সালে আকস্মিক চীনা আক্রমণের মুখে ভারতীয় বাহিনী যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, বমডিলার পতন ঘটে এবং আসামের তেজপুর শহর ছেড়ে আমলারা সবাই পালিয়ে আসে, তখন শ্রীমতী গান্ধী আসামে যাবেন বলে বাবার অনুমতি চাইলেন। নেহরুর কাছ থেকে তিনি কোনো উত্তর পেলেন না। তখন তিনি বাবাকে যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণের উদ্দেশে বেতার ভাষণ দিতে অনুরোধ করলেন। নেহরু অবশ্য তাই দিলেন। ভাষণ শেষ করে নেহরু মেয়েকে বললেন:

'কই, তুমি আসামে গেলে না?'

'বাঃ, সারাদিন আমি তো তোমার অনুমতিরই অপেক্ষা করছি।' ইন্দিরা জবাব দিলেন।

'তাই নাকি ? বেশ, যেতে চাও তো যাও !' নেহরু বললেন নিস্পৃহভাবে : 'আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করছো কেন ?'

ইন্দিরা আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে সে রাত্রেই যাবার সব ব্যবস্থা করলেন। ভোর পাঁচটায় প্লেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রী ব্যাপারটা জানতে পেরে ইন্দিরাকে বললেন :

'গৌহাটিতে আগে যেও। আমিও আসছি শীগগির।'

তারপর একটু থেমে শাস্ত্রীজী বললেন :

'তেজপুরে রাত্রিতে থাকা নিরাপদ হবে না। কেননা শত্রুপক্ষ যে কোনো সময় তেজপুর দখল করে নিতে পারে।'

ইন্দিরা কিন্তু অত উপদেশ শুনবার পাত্রীটি নন। তেজপুরে সারারাত তিনি কেবল যাপন করেননি, ভোর চারটেয় উঠে কুড়ি মাইল জীপ হাঁকিয়ে যুদ্ধ এলাকা পরিদর্শনও করে আসেন। তাঁকে দেখে জওয়ান ও জনসাধারণের মনোবল ফিরে আসে। জনতা ঘিরে ধরে তাঁকে। অভিযোগ করে—পুলিশ, সরকারী আমলারা এমনকি মন্ত্রীরা পর্যন্ত সবাই তাদের ফেলে পালিয়ে গেছে। পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে ভীরু কাপুরুষের মতো।

শ্রীমতী গান্ধী উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। বললেন :

'মন্ত্রীরা পালাবেন কেন ? ওঁরা গা ঢাকা দিয়েছেন। চীনা সৈন্য এসে পড়লে ওঁদেরই তো প্রথমে পাকড়াও করবে। তারপর ওঁদের দিয়ে বৈরী সরকার গঠন করিয়ে ছাড়বে। সরকারী আমলা বা মন্ত্রীদের এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল বলুন ?'

জনতা শ্রীমতী গান্ধীর কথায় শান্ত হলো। তিনি যে ক'দিন তেজপুরে ছিলেন, নেফার অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলিই কেবল পরিদর্শন করেননি, জওয়ানদের মনোবল ফিরিরে আনতে চেষ্টা করেন। আহত সৈনিকদের শিবিরগুলিও করে আসেন পরিদর্শন।

এমনি আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল আগস্ট ১৯৬৫ সালে। ইন্দিরাজী তখন প্রধানমন্ত্রী হন নি। শাস্ত্রী মন্ত্রিসভায় তথ্য ও বেতার

মন্ত্রী। দিনকয়েকের জন্যে তিনি তখন কাশ্মীরে বেড়াতে যান। কাশ্মীরে এসে দেখেন তিনি যে গৃহবোটটি ভাড়া করেছিলেন সেটা খালি পড়ে আছে। মাঝি-মাল্লা, লোকজন কোথায় গেছে উধাও হয়ে। আশেপাশের লোকজনও সব তাই। খোঁজখবর করে তিনি জানতে পারলেন মশার দৌরাত্ম্যে সবাই নাকি পালিয়ে গেছে। স্থানীয় আমলারা তাই তাঁকে জানালে। ইন্দিরাজী তা মানতে রাজী হলেন না। অনেক পীড়াপীড়িতে আসল কথাটা বেফাঁস হয়ে পড়ল। খাটো গলায় তারা বলল, পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের এ সীমান্ত রাজ্যে ১৯৪৭ সালের মতো আবার ঢুকে পড়তে শুরু করেছে।

শ্রীমতী গান্ধী তা শুনে রাজ্য মন্ত্রিসভার অধিবেশন ডাকলেন। নিজেও তিনি চুপ করে বসে রইলেন না। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী হিসাবে সারাদিন তিনি রেডিও আপিসে ও প্রেস ইন্‌ফরমেশন ব্যুরোতে কাটালেন নানা খোঁজ-খবর সংগ্রহ করে করে। প্রমাণ পেলেন পাক অনুপ্রবেশের সংবাদ মিথ্যা নয়। এবং ৯ আগস্ট তারিখ শ্রীনগর দখলের ডি-ডে (D-day) হিসেবে ধার্য হয়েছে। কাশ্মীর মন্ত্রিসভার সবাই হয়ে পড়ল বিচলিত।

ইন্দিরাজী তখন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী গোলাম মহম্মদ সাদিককে সব ব্যাপার জানিয়ে শাস্ত্রীজীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করলেন। মহম্মদ সাদিক তাই করলেন। মধ্য রাত্রি গড়িয়ে গেল। কিন্তু এ ব্যাপারে দিল্লী থেকে কোন সাড়া মিলল না। এদিকে গোটা শ্রীনগর শহরে নেমে এল আতঙ্কের ছায়া। সরকারী মহলের সবাই হয়ে উঠল সন্ত্রস্ত। একজন মন্ত্রী তো শ্রীমতী গান্ধীর নিকট বলেই বসলেন :

'আমি ১৯৪৭-এ পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়েছিলাম। পাকিস্তানের সবাই তা জানে। হানাদাররা আজ যদি আমায় পাকড়াও করে তবে ওরা আমাকে আর আস্ত রাখবে না। গায়ের

চামড়া তুলে নিয়ে তবে ছাড়বে। আমি অত বুদ্ধু নই বাপু! আমি তাই কেটে পড়ছি।'

ইন্দিরাজী মুখ নিচু করে সব শুনলেন। বললেন:

'বেশ, আপনি যেতে চান তো যান। আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেকে যাব। হানাদারদের মোকাবিলা করব।'

ইন্দিরাজীর কথা শুনে মন্ত্রীমশাইয়ের বুঝি টনক নড়ল। তিনি আর আপনার প্রাণ নিয়ে পালালেন না। শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় থেকে গেলেন ইন্দিরাজীর সঙ্গে।

এদিকে রাজধানী দিল্লীর তুষ্ণী ভাবে ইন্দিরাজী নিজেও ক্ষুণ্ণ কম হননি। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী ভারতে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশের বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের প্রধান সামরিক পর্যবেক্ষকের তদন্ত রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের বিবৃতির পর এ বিষয়ে যথার্থ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তবু ১০ আগস্ট পাঞ্জাব পুলিশ বাহিনীর তুটি দল শ্রীনগরে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু ১২ তারিখের আগে ভারতীয় ফৌজ কাশ্মীরে প্রেরিত হয়নি। পরদিনেই গোটা পরিস্থিতিটা ভারতের অনুকূলে এসে গেল। ইন্দিরাজী এবার শ্রীনগর ছেড়ে দিল্লী রওনা হলেন। নয়াদিল্লী তখন তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে পঞ্চমুখ। সবাই তারিফ করতে লাগল তাঁর সাহসিকতার। তাঁর দূরদর্শিতার। বলাবলি করতে লাগল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আর কিছু থাক বা না থাক, একটি 'বেটাছেলে' আছেন অন্ততঃ!

এ 'বেটাছেলেটি'র আরও পরিচয় পরেও পাওয়া গেছে অনেকবার। কেবল বাষট্টি সালের চীন ভারত সংঘর্ষের সময় নয়, উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের ভারত-পাক বাইশ দিনের লড়াইয়ের সময়ও ইন্দিরাজী সামরিক খাকি আবরণে নিজেকে ঢেকে ভারতীয় অগ্রবর্তী ঘাঁটিসমূহ পরিদর্শন করেছেন নিজে। যুদ্ধরত ভারতীয় জওয়ানদের উৎসাহিত করেছেন। তাদের মধ্যে খাবার ও পোশাক করেছেন বিতরণ। দেখাশুনা করেছেন আহত জওয়ানদের

হাসপাতালে গিয়ে। ফজিলকা আর আমবালা সীমান্ত এলাকায় হাজার হাজার লোক তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্যে তখন ভিড় করেছে শত্রুপক্ষের বোমাবর্ষণ উপেক্ষা করে।

এর নজীর একাত্তর সালের পাক-ভারত চৌদ্দ দিনের লড়াইয়েও রয়েছে অজস্র। শুধু শ্রম সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে নয়, দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সকল সমস্যার সমাধান করে নেন যথাসময়ে। অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেন শত্রুর অপচেষ্টা।

উনিশশো একষট্টি সালের গোড়ার দিকে জব্বলপুরে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হলে শ্রীমতী গান্ধীই সকলের আগে ছুটে গিয়ে তুই সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেন। বীভৎস সাম্প্রদায়িক হানাহানির অবসান ঘটান।

উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে মাদ্রাজে তখন হিন্দীভাষা প্রচলন নিয়ে দারুণ বিক্ষোভ। শ্রীমতী গান্ধীই প্রথম ছুটে যান সেখানে। জনসভায় আশ্বাস দেন—উত্তর ভারতের ভাষা হিন্দীকে কখনোই দক্ষিণ ভারতে চাপিয়ে দেওয়া হবে না রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। জনমতকে করা হবে না উপেক্ষা। ইন্দিরাজীর সে আশ্বাসে প্রশমিত হয় মাদ্রাজের জনসাধারণের বিক্ষোভ।

অপরের মতামতকে কিন্তু ইন্দিরাজী সমান মর্যাদা দিতে ভোলেন না। তারই একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন শ্রীআনন্দ মোহন তাঁর তথ্যবহুল জীবনীগ্রন্থ 'ইন্দিরা গান্ধী'-তে (মেরিডিথ প্রেস, নিউ ইয়র্ক)। ঘটনাটি হলো :

আসামের বিশিষ্ট পি. এস. পি. নেতা শ্রীহেম বড়ুয়া, এম. পি. তখন উইলিংডন নার্সিং হোমে ছিলেন অসুস্থ হয়ে। শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে একদিন দেখতে যান। হেমবাবু এজন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। শ্রীমতী গান্ধী যে তাঁকে দেখতে আসবেন ভাবেননি। শ্রীমতী গান্ধী ঘরে ঢুকে দেখেন হেমবাবু একখানি বই পড়ছেন এক মনে। বইখানি হলো 'দি আর্ট অব প্লেন টক' ('The Art of Plain Talk')। বইটি লক্ষ্য করে শ্রীমতী গান্ধী একটু হেসে উঠলেন। বললেন :

'বড়ুয়াজী, আপনার আবার এই বই পড়ার দরকার কী? আপনি তো হামেশা বেশ প্লেন টক্ই করে থাকেন। আর্টটা তো আপনি বেশ রপ্ত করে নিয়েছেন।'

পি. এস. পি. নেতা হেসে জবাব দিলেন :

'ইংরেজী ভাষাটা একটু ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম কিনা, তাই।'

শ্রীমতী গান্ধী শ্রীহেম বড়ুয়ার কাছ থেকে বইখানি চেয়ে নিলেন হাত বাড়িয়ে। বললেন : 'দিন, আমিও তাহলে একটু ঝালিয়ে নি।' তারপর স্মিত হেসে বললেন :

'ভয় নেই, আপনার বই বিকেলেই ফেরত দেব।'

বিকেলে অবশ্য বইখানি শ্রীবড়ুয়া ফেরত পান। সঙ্গে রয়েছে আরও তিনখানি বই। একখানি সাংবাদিক বি. জি. ভার্গেস-এর লেখা 'ডিজাইন ফর টুমরো'। দ্বিতীয়খানি 'দলাইলামার আত্মচরিত'। আর তৃতীয়টি রোনাল্ড সেগলের লেখা 'ক্রাইসিস্ ইন ইণ্ডিয়া'। সেগলের বইখানিতে যে নেহরু-নীতি ও নেহরু-কর্মপন্থার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করা হয়েছে তা কারও অজানা ছিল না। তবু কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী বিরোধী সংসদ-সদস্যের হাতে বইখানি তুলে দিতে দ্বিধা করেননি। এমন কি পিতার কড়া সমালোচনা করা হলেও। আপন মতবাদ কারও উপর চাপিয়ে দিতে তিনি চান না। তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ রেখে যায় ছোট্ট এ ঘটনাটি।

শুধু শ্রীমতী গান্ধী নন, নেহরু পরিবারের সবাই, পিতা জওহরলাল কিংবা ঠাকুরদা মতিলাল কেউ নিজেদের মতবাদ অপর কারও, বিশেষ করে ছোটদের উপর চাপাতে চাইতেন না। জওহরলাল তো নিজেই পিতা মতিলাল কিংবা কন্যা ইন্দিরার সঙ্গে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অনেক বিষয়ে একমত ছিলেন না। তবু কিন্তু তিনি কোনদিন ভুলেও ইন্দিরার স্বাধীন চিন্তায় হস্তক্ষেপ করেননি। শ্রীআনন্দ মোহন এমনি আর একটি ঘটনার কথা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'দি লেডী বিহাইণ্ড দি মাস্ক্' অধ্যায়ে।

টাটা পরিবার গোষ্ঠীর মিঃ পি. এল. ন্যারিয়েলওয়ালা একদিন

প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। পুত্র সঞ্জয়কে নিয়ে ইন্দিরাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান। খেতে বসে মিঃ নারিয়েল-ওয়ালা সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করলেন : 'তুমি তো ইংলণ্ডে যাচ্ছো, ওখানে গিয়ে কি পড়বে?'

সঞ্জয় জবাব দিল :

'বিলেত থেকে টেকনিক্যাল ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরব। দেশে ফিরে মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কারখানা খুলব।'

মিঃ ন্যারিয়েলওয়ালা তো অবাক। বললেন : 'সে কি? মোটর কারখানা? এখন তো হলো এরোপ্লেনের যুগ। মোটরের চাইতে এরোপ্লেন ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সম্ভাবনা উজ্জ্বল।'

'সে ঠিক।' সঞ্জয় সায় দিল। বলল, 'কিন্তু আমাদের দেশে মোটর নির্মাণের কারখানারই সম্ভাবনা বেশি এরোপ্লেনের চাইতে। কেননা এরোপ্লেন ইণ্ডাস্ট্রি পাবলিক সেক্টরের অধীন। সরকারী প্রতিষ্ঠান। সে ব্যবসায়ে আমার লাভ কি? সরকারী প্রতিষ্ঠানে আমি কাজ করতে চাই না।'

শুনে মিঃ ন্যারিয়েলওয়ালা তো থ'! দাদামশাই আর মার সামনে সঞ্জয়ের কাছ থেকে এমনধারা উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেননি। কেননা বাবা, মা, দাদামশাই সবাই ব্যক্তিগতভাবে পাবলিক সেকটরের সমর্থক। নেহরু একবার মুখ তুলে তাকালেন দৌহিত্রের দিকে। তারপর স্মিত হাসলেন। আর ইন্দিরা গম্ভীর হয়ে আহারে মন দিলেন। পুত্রকে কিন্তু আপন মতে আনবার কোনরূপ চেষ্টা করলেন না। স্বকীয় মতবাদ চাপাতে চাইলেন না।

ইন্দিরাজী কাজের লোক। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কখনো পিছপা হন না। এবং তা বড় কি ছোট যে কোনও তরফ থেকেই আসুক না কেন। ছোট এমনি একটি ঘটনা :

ইন্দিরাজী তখন ছিলেন এক স্কুলের সভাপতি। ঐ স্কুলের জনৈক শিক্ষক স্কুলের সেক্রেটারিকে ডিঙ্গিয়ে তাঁর নিকট কোন এক অন্যায় অবিচারের প্রতিকারকল্পে আবেদন করেন। তাতে কিন্তু

সেক্রেটারি মহা চটে যান। তিনি ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। শ্রীমতী গান্ধী তা জানতে পেরে সেক্রেটারিমশাইকে তলব করলেন। বললেন :

'স্কুলের জন্য আপনি যা করেছেন তার তুলনা নেই। কিন্তু তাই বলে আপনি আপনার অধীনস্থ এক শিক্ষকের প্রতি অমন অবিচার করলে চলবে কেন? এখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের অভাব অভিযোগ যদি আমাকে কেউ জানায় তবে তা দোষেরই বা হবে কেন?'

১৯৬৪ সালে ইন্দিরাজী যখন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী তখনও এমনিতর আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর শত শত কর্মীর আবেদন তিনি নিজেই শোনেন স্টেশন ডিরেকটরকে এড়িয়ে। এবং তাঁদের দাবি পুরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় বেতার শিল্পীদের পাঁচ বছরের কণ্ট্রাকট, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, আনুষঙ্গিক ভাতা, কর্মী ইউনিয়নের স্বীকৃতি প্রভৃতি দাবিগুলি মেনে নেওয়া হয়। শ্রীমতী গান্ধীর আগে দীর্ঘ সতের বছরের মধ্যে অপর কোন মন্ত্রীর আমলে এমন ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি।

বহুবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও শ্রীমতী গান্ধী রয়েছেন জড়িত। ভারতীয় শিশু মঙ্গল পরিষদের সভাপতি, জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক শিশু মঙ্গল সমিতির ভাইস প্রেসিডেণ্ট, ১৯৬০ সালে ইউনেসকোয় (UNESCO) ভারতীয় প্রতিনিধি, ইউনেসকোর কার্যকরী কমিটির সভ্য, ভারতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভ্য, শিশুদের জাতীয় ক্রীড়া কৌতুক সঙ্ঘ 'বাল-ভবনে'র সভাপতি, নয়াদিল্লীর অনুন্নত বালকদের আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্র 'বাল সহায়ক সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট।

হাজার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হলেও ইন্দিরাজী নিজেকে জাহির করার কিংবা কোনরূপ আত্মপ্রচারের প্রত্যাশী নন।

জাতীয় কংগ্রেসের মহিলা বিভাগ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে

সম্মানিত করার জন্যে একবার প্রস্তাব করে যে উনিশ নভেম্বর ইন্দিরাজীর জন্মদিনে কংগ্রেসের মহিলাদের তরফ থেকে 'মহিলা দিবস' পালন করা হোক। যেমন পালন করা হয়ে থাকে প্রতি বছর 'শিশু দিবস' নেহরুর জন্মদিন ১৪ নভেম্বরে।

প্রস্তাব শুনে শ্রীমতী গান্ধী তুমুল আপত্তি জানালেন। প্রতিবাদ করে উঠলেন। বললেন:

'না, না, সে হয় না। আমাকে নিয়ে আবার মহিলা দিবস কেন?' তাঁর আপত্তির মুখে কংগ্রেস মহিলা বিভাগের সব আবদার ভেস্তে গেল।

'মহিলা দিবস' আর প্রতিপালিত হয়নি। ঘটনাটি ইন্দিরাজীর এক জীবনীকারের কাছে বিবৃত করেছেন দিল্লীর প্রখ্যাত মহিলা কংগ্রেসকর্মী শ্রীমতী মুকুল ব্যানার্জী (বর্তমানে সংসদ সদস্য)।

ইন্দিরাজীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের কোনরূপ অভিযোগ যে নেই এমন নয়। তাঁর 'গরিবী হটাও' নীতি ভুয়ো বলে হয়তো কেউ উড়িয়ে দেবেন। হয়তো বলবেন: 'ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ কেবল সমাজবাদের সস্তা শ্লোগান।' 'গণতান্ত্রিক মোর্চা প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতারই মুখোস মাত্র।' কিংবা হয়তো বলবেন: 'শ্রীমতী গান্ধী তাঁর কর্তৃত্ব বা ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে দেশটাকে 'উচ্ছন্নে' দিচ্ছেন। বৈদেশিক ঋণভার বাড়িয়ে তুলছেন দিনের পর দিন।' কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভারতের তিন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে জওহরলাল নেহরু যদি হন স্বপ্নচারী, লালবাহাদুর শাস্ত্রী যদি সংশোধনবাদী (রিভিশনারি), তাহলে ইন্দিরা গান্ধী নিশ্চয় 'টেলিভিশনারি' বা দূরদর্শিনী!

শ্রীমতী গান্ধীর আঠারো মাস কাল তথ্য ও বেতারমন্ত্রী হিসেবে কিংবা গত ছ'বছর কাল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এ দূরদর্শিতারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। পাক-ভারত যুদ্ধে অসামান্য সাফল্যের পর 'ভারতরত্ন' ইন্দিরাকে যখন দেশবাসী দেবদূত বা দেবী বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে থাকেন, তিনি সে মানসিকতার করেন

প্রতিবাদ। অন্ধ্র প্রদেশের কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় শ্রীমতী গান্ধী বলেন :

ভারতে দেবদেবীর দুর্ভিক্ষ হয়নি। তেত্রিশ কোটি দেবদেবী অলরেডি রয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা আর বাড়াবার দরকার নেই। তিনি একজন সাধারণ কংগ্রেস কর্মী মাত্র। দেবদূত বা দেবী নন।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র মতোই বুঝি তারপর বলে উঠেছিলেন :

'নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।'

১৬

'বাংলাদেশের ভাইবোনেরা,

'ভারতবর্ষের পঞ্চান্ন কোটি মানুষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন নিয়ে আমি আপনাদের সোনার বাংলায় এসেছি। আজ ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ আপনাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শতায়ু কামনা করেন।'

১৭ মার্চ ১৯৭২ শ্রীমতী গান্ধী ঢাকায় গিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে (৫৩তম) অভিনন্দন জানিয়ে এলেন সোহরাওয়ার্দি ময়দানে (রমনা রেসকোর্স) 'ইন্দিরা মঞ্চ' থেকে। শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণের জন্য রমনা ময়দানে ময়ূরপঙ্খী নৌকার আকারে স্থায়ী এ মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। 'জয় বাংলা' বলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বক্তৃতার কয়েক ছত্র বাংলাতে শুরু করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মুখে বাংলা ভাষা শুনে ঢাকার ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ল। জয়ধ্বনি তুলল:

ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ!

বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ!

ভারত-বাংলা মৈত্রী জিন্দাবাদ!

বঙ্গবন্ধুকে তাঁর জন্মদিনে শ্রীমতী গান্ধী কাশ্মীরী কাঠের তৈরি একটি পাইপ ও চন্দন কাঠের তৈরি একটি ফুল উপহার দেন। আর অর্পণ করেন কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র রচনা সম্ভার।

ইন্দিরাজী তাঁর ভাষণে বলেন:

'ভারত ও বাংলাদেশের আদর্শ অভিন্ন। সে আদর্শ হলো গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ভারত এ আদর্শের জন্যে, মানবিক মূল্যবোধের জন্যে বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের সঙ্গে ভারতের বীর জওয়ানরা রক্ত দিয়েছে। ভারত চায় বাংলাদেশ নিজের পায়ে যেন দাঁড়ায়। দু' দেশের মৈত্রীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সাধারণ নীতিবোধের প্রতি আনুগত্যের উপর।'

ভারত বাংলাদেশকে কোনরূপ প্রভাবান্বিত করতে চায় না বলে ইন্দিরাজী জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারতীয় বীর জওয়ানদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। ভূয়সী প্রশংসা করেন তাদের। এবং বলেন : পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা ভারত ও বাংলাদেশের পরম কল্যাণ সম্ভব। শীতলক্ষ্যা নদীর বুকে দু' দেশের দুই প্রধানমন্ত্রী স্টীমারে করে নদী ভ্রমণে যান। এরই মধ্যে দুজনে দু' দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের প্রশ্ন এবং আরও অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দু প্রধানমন্ত্রী শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার এক ঐতিহাসিক চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেন। দু দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক সংহতির প্রতিশ্রুতিও দেন। এ চুক্তি অনেকটা আগস্ট ১৯৭১ সালে স্বাক্ষরিত ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির অনুরূপ।

বুকভরা ভালবাসা আর প্রতিশ্রুতি নিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা ঢাকা থেকে ফিরলেন। জয় করে এলেন ওপার বাংলার প্রতিটি হৃদয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরও মাস দেড়েক আগে ৮ ফেব্রুয়ারী '৭২ তিন দিনব্যাপী মহানগরী কলকাতা সফর শেষ করে ঢাকায় ফিরলেন এপার বাংলার প্রতিটি হৃদয় জয় করে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দিল্লী থেকে ছুটে এসে বঙ্গবন্ধুকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। কলকাতা ভেঙ্গে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে জনসাধারণ ছুটে এল। ব্রিগেড গ্রাউণ্ডের বিশাল জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর অসামান্য অবদানের কথা।

বঙ্গবন্ধু তারপর ঘোষণা করলেন :

'ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র আমাদের দু' দেশের আদর্শ। এ আদর্শের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে আমাদের দু'দেশের মৈত্রী। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চিরদিন অটুট থাকবে। বিশ্বের কোন শক্তিই পারবে না এ মৈত্রীতে ফাটল ধরাতে।'

বিদায় নেবার আগে কলকাতা বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধু আবার বললেন :

'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী এশিয়ায় এক নতুন যুগের উন্মেষ ঘটিয়েছে। কেননা উভয় দেশের সরকারই নিঃস্ব ও দুর্গত জনগণের সেবায় জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ।'

বঙ্গবন্ধুর সম্মানার্থে এক ভোজসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী স্মরণ করিয়ে দিলেন :

'আমরা এমন একটি মজবুত ইমারত গড়ে তুলতে চাই যা হবে সমস্ত স্বাধীন স্ত্রী-পুরুষের বাসভূমি।' প্রধানমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুকে জানালেন :

'গুরুদেবের দূরদৃষ্টি ও জীবনদর্শন আমাদের উভয়কেই অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর বিরাটত্বের এটাই বড় প্রমাণ যে, তিনি আমাদের ও আপনাদের জনগণকে সমানভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।'

শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন :

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরূপে এ প্রথমবার তিনি সীমান্তের ওপার থেকে মৈত্রী ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে কলকাতা মহানগরীতে এসেছেন। কিন্তু এ মহানগরীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহু মধুর স্মৃতি জড়িত। তাঁর ছাত্রজীবনের সবচেয়ে আনন্দময় দিনগুলির বেশিরভাগ অতিবাহিত হয়েছে কলকাতাতেই। সে অমূল্য দিনগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো তাঁর জীবন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এ কলকাতা আগমন স্রেফ সৌজন্যমূলক

সফর নয়। দু'দেশের দুই প্রধানমন্ত্রী পারস্পরিক নানা বিষয়ে আলোচনা বৈঠকেও মিলিত হন। বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্যদের ২৫ মার্চ ১৯৭২-এর মধ্যে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অবশ্য বীর ভারতীয় জওয়ানরা বাংলাদেশ থেকে বিদায় নেয়। ঢাকা স্টেডিয়ামে ১২ মার্চ মিত্রবাহিনীর বিদায়ী কুচকাওয়াজে প্রধানমন্ত্রী মুজিবুর রহমান বলেন :

'তিরিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা মাতৃভূমিকে স্বাধীন করেছি। বাংলাদেশের বীর জনতার এ রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে আছে ভারতের মিত্রবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের বুকের রক্ত। রক্তস্নাত স্বাধীনতার পর অর্জিত আমাদের দু'দেশের এ বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।'

ইয়াহিয়া খাঁর কয়েদখানা থেকে 'ফাঁসীর আসামী' শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পেয়ে যখন ১০ জানুয়ারী লণ্ডন থেকে ঢাকার পথে দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান সেদিনও তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি স্বয়ং, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, তখনকার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী) প্রমুখ অনেকেই। ভারতের অগণিত মানুষ দিল্লীর কনকনে শীত উপেক্ষা করে ভিড় করেছিল বিমানবন্দরে। শেখ মুজিবুরের সঙ্গে ইন্দিরাজীর এ প্রথম সাক্ষাৎ।

যাঁকে কোনদিন চোখে দেখেননি, ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় নেই যাঁর সঙ্গে, তাঁরই মুক্তির জন্যে ইন্দিরাজী উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন মানবতার আহ্বানে। ১৫ আগস্ট '৭১ শেখ মুজিবুরের গোপন বিচার সম্পর্কে তাঁর মুক্তির দাবিতে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন শ্রীমতী গান্ধী। গোপন এ বার্তায় তিনি রাষ্ট্রপ্রধানদের জানান ইয়াহিয়া খাঁ এ বিচারের প্রহসনে মুজিবুর রহমানের প্রাণদণ্ডের ফিকিরে রয়েছেন। উপমহাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার বৃহত্তর স্বার্থে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রভাব বিস্তার করতে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজীর আবেদন সফল হয়। বিশ্ব জনমতের চাপে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী জাতির জনককে মুক্তি দিতে জুলফিকার আলী ভুট্টো বাধ্য হন।

শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করেন। ৬ ডিসেম্বর '৭১ সালে লোকসভায় তিনি যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তা সূচনা করে নতুন অধ্যায়। পাক জঙ্গীশাহীর অত্যাচারে উৎপীড়িত পূর্ব বাংলা থেকে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর দুঃখ দুর্দশার করুণ কাহিনী সহ্য করতে না পেরে শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট ধরনা দেন এর প্রতিকারের জন্যে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তিনি প্রেসিডেণ্ট নিকসনকে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি জ্ঞাপন করেন। ৪ নভেম্বর ১৯৭১ ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট নিকসনের প্রদত্ত সংবর্ধনা সভায় তিনি বলেন :

'আমাদের প্রান্তে যে উত্তেজনা বিরাজ করছে তার একটি স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজে বার করবার জন্যে আমি এখানে এসেছি। ছুটে এসেছি আপনাদের সুবিবেচনা ও সহানুভূতির প্রত্যাশায়। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে এ ধরনের সুবিবেচিত আবেগ ও সহানুভূতি সময় সময় মানবগোষ্ঠীকে হতাশা থেকে রক্ষা করেছে।'

পূর্ব বাংলায় যা ঘটেছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যারূপে সূচিত হলেও তা ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান। এটা শুধু ভারতের ব্যাপার নয়, সমগ্র বিশ্বসমাজের সমস্যা বলে তিনি একে অভিহিত করেন।

পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র ও নিরপরাধ জনগণের নিকট বেপরোয়া পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর এ হামলার উদ্দেশ্য হলো পূর্ব বাংলার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করা। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনসাধারণ যে অভিমত ব্যক্ত করে তাকে গলা টিপে হত্যা করাই ছিল জঙ্গীশাহীর লক্ষ্য।

বেয়নেট, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, গোলা আর বিমানবহরের উলঙ্গ প্রয়োগের মধ্যে জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চললো। এ নজীর বিশ্বের কোথাও নেই। বাংলার জনগণ তাই করলো স্বাধীনতা ঘোষণা। 'যে কোন ভাবে হোক, যে কোন মূল্যে হোক, সারা বাংলাদেশের দিকে দিকে শত্রুসৈন্যদের প্রতিরোধ করুন—' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডাক দিলেন ২৬ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে। বললেন: 'শত্রুর কবল থেকে মুক্তির জন্যে আপনারা যে সংগ্রাম চালাবেন, আল্লাই তাতে আপনাদের সহায় হবেন।'

দেশবাসীর প্রতি বিপ্লবী নেতার এ বাণী অজ্ঞাত এক বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষিত হলো। জানিয়ে দেওয়া হলো বিশ্ববাসীকে— 'বাংলাদেশ এখন যুদ্ধে লিপ্ত। বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করে চলেছে সাহসের সঙ্গে। জয় বাংলা!'

জঙ্গীশাহী ইয়াহিয়া খাঁ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘোষণা করলেন দুশমন বলে। আর নিরস্ত্র বাংলার জনগণের উপর চালালেন নির্মম, নিষ্ঠুর, বর্বর অত্যাচার। তাজা খুন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ। সোনার বাংলার ত্রিশ লক্ষ মানুষ হলো শহীদ। দু' লক্ষেরও বেশি অসহায় নির্যাতিত নারী হলেন 'ওয়ার হিরোইন' দখলদার পাক নরপশুদের কবলে। এক কোটির মতো আবাল-বৃদ্ধ নরনারী হলো বাস্তুচ্যুত। শরণার্থী। আঁতকে উঠল আর্ত মানবতা। সোনার বাংলার সাধারণ মানুষের আর্তিতে সাড়া দিলেন শ্রীমতী গান্ধী।

বাংলাদেশের এ মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৬ ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদলের অত্মসমর্পণে কিংবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের সোনার বাংলায় প্রত্যাবর্তনের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ নয়, তার মুল আরও আগে।

১৯৪৮ সাল। পাকিস্তান সরকার উর্দুকে সারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করলে। গভর্নর-জেনারেল মহম্মদ আলী জিন্না জানিয়ে দিলেন, উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদেরও

একমাত্র সরকারী ভাষা বলে মেনে নিতে হবে। এ ঘোষণার অর্থ, পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৭'২ জনের ভাষা উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়া হলো শতকরা ৫২ জনের মাতৃভাষা বাংলার উপর।

১৪ আগস্ট ১৯৪৭-এ ভারত বিভাগ হয়ে ঐশ্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের সৃষ্টি। পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ৫৫ হাজার বর্গমাইল (ইংলণ্ড ও ওয়েলসের তুলনায় কিছু কম) আর লোকসংখ্যা সাড়ে সাত কোটির মতো। তার মধ্যে সাড়ে ছয় কোটিরও বেশি মুসলমান বাসিন্দা (এক ইন্দোনেশিয়া ছাড়া অপর কোন মুসলিম রাষ্ট্রে এত মুসলিম বাসিন্দা নেই)। পূর্ব বাংলার বাসিন্দারাই হলেন পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু। মোট জনসংখ্যা বারো কোটির মধ্যে। বাংলা তাদের মাতৃভাষা। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এ দু-অংশের মধ্যে স্থলপথে ব্যবধান প্রায় হাজার মাইল। ভাষা, ইতিহাস, সাংস্কৃতিক পরিবেশও পৃথক।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পাক শাসক মহল পূর্ববঙ্গের বাঙালী অধিবাসীদের উপর চালালো বৈষম্যমূলক নীতি। অর্থনৈতিক ধনসম্পদে পূর্ব বাংলা প্রভূত ঐশ্বর্যশালী হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের গড়পড়তা আয় পূর্ব বাংলার চাইতে শতকরা ৬১ ভাগ বেশি (১৯৬৯-৭০ পরিসংখ্যান)। এর কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব বাংলাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী করে রাখা। পাটজাত পণ্যের বৈদেশিক মুদ্রা কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতি ও হিতকল্পে ব্যয়িত হত। পাঞ্জাবী, সিন্ধী ও জুনাগড়ী ব্যাবসাদারদের মুনাফা বৃদ্ধির দিকে পাক জঙ্গীশাহীর যতখানি দৃষ্টি, পূর্ব বাংলার নিপীড়িত মেহনতী মানুষের সমৃদ্ধির দিকে ততখানি ছিল না।

কেবল অর্থনৈতিক শোষণ নয়। সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার উপর তার কর্তৃত্ব রাখলে অব্যাহত। জেঃ ইয়াহিয়া খাঁর অধীন পাক সামরিক বাহিনীর ৭২ জন জেনারেলের মধ্যে মাত্র একজন হলেন বাঙালী। কেন্দ্রীয়

প্রশাসন ক্ষেত্রের উচ্চস্তরের চাকুরিতেও পাঁচ ভাগের চার ভাগ পদই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া। বাদ বাকীটা নিয়েই বাঙালী চাকুরিজীবীদের থাকতে হতো সন্তুষ্ট। মুখ ফুটে কিছু বলবার সাহস ছিল না খান সেনাদের জঙ্গী বুটের তলায়।

কিন্তু মুজিবের বাংলাকে দাবিয়ে রাখা গেল না। বাংলা ভাষার দাবিতে তোলপাড় হয়ে উঠলো পূর্ব বাংলা। পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালো বাংলার জনগণ। ভাষা আন্দোলনের উত্তাল স্রোত ভেঙে পড়লো পদ্মার পাড় ভাঙা বন্যার মতো। আর এ দুর্বার আন্দোলনের কর্ণধারদের অন্যতম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের একটি ছাত্র। সোনার বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি মুছে ফেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার 'অপরাধে' তিনি হলেন কলেজ থেকে বিতাড়িত। যেতে হল জেলে। তখন অবশ্য কিছু কালের জন্যে (১৯৪৮ সালে)। আর ১৯৪৮ সালে সাজা হলো তিন বছরের। এ বিপ্লবী নেতাই আজকের বঙ্গবন্ধু। এবং সেই তাঁর প্রথম কারাবরণ। মুক্ত বাংলার মুক্তির ইতিহাসের জয়যাত্রা। নিহিত হলো বিদ্রোহী বাংলাদেশের সংগ্রামের বীজ।

১৯৫০ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলন নিল নতুন মোড়। তার ধারা ব্যাহত করার জন্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢেলে দিলো শাসক গোষ্ঠী। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আবার শুরু হলো। তবু কিন্তু ভাষা আন্দোলনের কণ্ঠকে করা গেল না রোধ। ১১ মার্চ ১৯৫১ সালে ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হলো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে ৯ ফেব্রুয়ারী '৫২ সালে ঢাকার ছাত্রদের দীর্ঘ এক মিছিল বের হলো। ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্রদের এমনি আর এক মিছিলের উপর চললো গুলি। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বরের তাজা খুনে স্নাত হলো ঢাকার রাজপথ। সে থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখটি শহীদ দিবসরূপে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। অমর ২১ ফেব্রুয়ারী :

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি!
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি!
আমার সোনার দেশের রক্তে গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি!'...

শুধু গুলীবর্ষণ নয়। গ্রেপ্তার, ছাত্র বিতাড়ন চললো পাইকারী হারে। বিশ্ববিদ্যালয়কে রাখলো বন্ধ করে। কিন্তু ভাষা আন্দোলনকে বন্ধ করা গেল না।

চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলীম লীগকে পরাজিত করে শের এ-বঙ্গাল ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু দু'মাস পরেই তাঁর মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হলো। ফজলুল হককে করা হলো স্বগৃহে অন্তরীণ। আর তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী। আবার ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনা হলো সাজানো 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের চাপে এ মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো। আর মুজিবুর হলেন বেকসুর খালাস। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব বাংলায় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুলভাবে জয়লাভ করে।

প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খাঁ সংবিধানের জন্যে আইনগত কাঠামো গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারী ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক বসলো। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া বললেন—মুজিবুরই পূর্ব পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস্ পার্টির নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো জানালেন তিনি জাতীয় পরিষদে বসবেন না। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খাঁও পিছু হটতে লাগলেন। ঢাকার রাজনৈতিক আবহাওয়া অন্য খাতে তখন বইতে শুরু করলো।

এদিকে ছাত্রদের কণ্ঠে দাবি উঠলো—'স্বাধীনতা চাই।'

পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে ওরা করলো ভস্মীভূত। পাক ফৌজের গুলি লাঠির প্রতিবাদে পালিত হলো হরতাল। গণবিক্ষোভে ফেটে পড়লো পূর্ববঙ্গ। পথে পথে জনতার ব্যারিকেড। খণ্ডযুদ্ধে শত শত হতাহত। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে পাকিস্তানী ফৌজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ডাক দিলেন জনগণকে। সারা পূর্ববঙ্গে সাধারণ ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান হলো। ২৫ মার্চ ঢাকার অলিতে গলিতে চললো খান সেনাদের তাণ্ডব নৃত্য। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছারখার। নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা। নারকীয় অত্যাচার। ২৬ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হলো : 'বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র'।

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিব নগরের আম্রকুঞ্জে আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম হলো নতুন এক রাষ্ট্রের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানচিত্রে নতুন একটি সংযোজন। নতুন একটি নাম। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। তার রয়েছে নিজস্ব জাতীয় পতাকা : সবুজ, মাঝখানে লাল বৃত্ত। আর তার মধ্যে সোনালী রঙে আঁকা সোনার বাংলার প্রতিকৃতি। আর তার জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের :

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি
মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে,
আমি নয়ন জলে ভাসি॥'

৩৭

এবারেও রাত তখন বারোটা।

বারোটা নয়। বারোটা চল্লিশ। স্তব্ধ অটল সিমলা পাহাড়ের শীর্ষদেশে বরফ বুঝি গললো। গলতে শুরু করল দুই দেশের দুই প্রধানের হৃদয়বত্তা আর মানবতার উত্তাপে। ভারত আর পকিস্তানের দুই প্রধানের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত এ সিমলা শীর্ষ-সম্মেলনে স্বাক্ষরিত হলো এক ঐতিহাসিক চুক্তি। মতৈক্যে আসা গেল এক নাগাড়ে পাঁচ দিনের (২৮ জুন থেকে ২ জুলাই ১৯৭২) আলাপ আলোচনার পর যখন সকল প্রচেষ্টা বানচাল হবার মুখে, তখনই স্বাক্ষরিত হয় এ চুক্তি, গভীর রাতে।

এ সিমলা পাহাড়েই ভারত বিভাগের পূর্বে ১৯৪৬ সালে লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের আলোচনা হয়েছিল ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে। ছাব্বিশ বছর পর আবার এ সিমলা পাহাড়েই গুরুত্বপূর্ণ আর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো ভারত ও পাকিস্তান উপমহাদেশে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। সিমলা চুক্তির পাদপীঠে নেহরু-নুন, নেহরু-লিয়াকত কিংবা শাস্ত্রী-আয়ুবের তাশখন্দ চুক্তিও ম্রিয়মাণ হতে চললো।

হিমাচল ভবনে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বিদায়ী ভোজের আয়োজন করেছিলেন। খানাপিনার পর দুই দেশের প্রধান শেষবারের মতো মিলিত হন। তখন একান্তে আবার আলোচনা শুরু করেন। পরদিন সকালে প্রেসিডেণ্ট ভুট্টোর স্বদেশে ফেরার কথা। ফিরতে হবে বুঝি রিক্ত হস্তে। তার আগেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশের মধ্যে আর যুদ্ধবিগ্রহ নয়। মীমাংসার পথ,

বলপ্রয়োগ নয়। দুই পক্ষের আলাপ আলোচনার মধ্যে দুই দেশের সমস্যার সমাধান করতে হবে। তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা নয় (এর মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘও রয়েছে)। সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে মতের ঐক্য স্থাপিত হলো।

শ্রীমতী গান্ধী বেরিয়ে এসে ভোজসভায় উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভার বিশিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে খসড়া চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবন, পররাষ্ট্র সচিব সর্দার স্বরণ সিং, প্রতি-রক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলী আহমেদও তা অনুমোদন করলেন। জনাব ভুট্টোও তাঁর আমলা পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের নেতা আজিজ আহমেদ ও অন্যান্যদের সঙ্গে (এ পর্যায়ে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন শ্রী ডি. পি. ধর ও তাঁর অসুস্থতার সময় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব শ্রী পি. এন. হাসকার।) এ বিষয়ে আলোচনা করে নেন। তারপরই স্বাক্ষরদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয় সরকারী হিমাচল ভবনের প্রশস্ত কক্ষে।

শ্রীমতী গান্ধীর পরনে ছিল সেদিন সোনালী চওড়া পাড় শাড়ি। ভুট্টোর গায়ে নীল বোতাম বসানো কলার দেওয়া কোট। স্বাক্ষর-দানের পর শ্রীমতী গান্ধী ও জনাব ভুট্টো দুজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পরস্পর পরস্পরের দিকে হাত প্রসারিত করে দিলেন। পাঁচদিন আগে যে গভীর উৎকণ্ঠা, দ্বিধা, সংকোচ আর অনিশ্চয়তার জগদ্দল পাথর সিমলার বুকে চেপে বসেছিল, এবার তা অপসারিত হলো; দূর হলো একান্ত সহৃদয়তার স্রোতে।

দু' দেশের দুই নেতা করমর্দন করলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে আর যুদ্ধবিগ্রহ নয়। শান্তির অমোঘ বাণী এবার হোক অনুরণিত। পঁচিশ বছরের তিক্ত সম্পর্কের—তিক্ত অভিজ্ঞতার হোক এবার অবসান। এ তার মিলনের রাখীবন্ধন। কেননা গত পঁচিশ বছরে প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র চার চার বার সংঘর্ষে হয়েছে লিপ্ত। ভারতকে বিদেশী হানাদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়েছে। এর ফলে দু' দেশের কম-সে-কম পঁচিশ হাজার তাজা জওয়ান প্রাণ হারিয়েছে।

সাড়ে চার কোটি মানুষ হয়েছে ছিন্নমূল উদ্‌বাস্তু. যুদ্ধের রসদ যোগাতে গিয়ে ব্যয় হয়েছে কোটি কোটি টাকা। পাশাপাশি দুই দেশের মানুষকে বিচ্ছিন্ন—আলাদা করে দিয়েছে সীমান্ত বরাবর হাজার হাজার মাইল কাঁটা তারের বেড়া। সঙ্গীন উঁচিয়ে শিরস্ত্রাণ পরা অতন্দ্র প্রহরীর টহল। চেকপোস্ট আর পিল বক্সের বাধানিষেধ।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত বাইশ দিনের লড়াইয়ের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আবার ব্যাবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ইত্যাদি সব সম্পর্কেরও ঘটেছে অবসান। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে চৌদ্দ দিনের লড়াইয়ের পর থেকে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কও হয়েছে বিচ্ছিন্ন। পারস্পরিক সন্দেহ, সংশয় দানা বেঁধে উঠেছিল জগদ্দল পাথরের মতো।

দু' দেশের মধ্যে যুদ্ধের আশংকা যদি দূরীভূত হয়, শান্তির পরিবেশ যদি ফিরে আসে, তা হলে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বা যুদ্ধের আতঙ্ক আর থাকবে না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দু' দেশের বিরোধ মেটাতে গিয়ে তৃতীয় পক্ষের মোড়লিরও আর হবে না প্রয়োজন। তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা মেনে নেওয়ার অর্থই হলো দু' দেশের বিরোধকে অকারণ দীর্ঘায়ু করে তোলা বিদেশী শক্তির কায়েমী স্বার্থে। এর নজীর রয়েছে একাধিকবার।

কাশ্মীরে পাক হানাদারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ধরনা দিয়েও ভারত সুবিচার পায়নি। সমস্যার সমাধান হয়নি। তাশখন্দে শাস্ত্রী-আয়ুব চুক্তিতেও তার কোন সুরাহা হয়নি। শান্তির স্বপক্ষে প্রধান-মন্ত্রী লালবাহাদুরের মহাপ্রয়াণেও না। তাশখন্দ চুক্তির কালি শুকোতে না শুকোতেই পাকিস্তানী সামরিক চক্রের রণ-দামামা আবার বেজে উঠলো। এবং একাত্তরের সতেরোই ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধে তার ঘটে পরিণতি। ফলে পাকিস্তানের ঘটে অঙ্গচ্ছেদ। সৃষ্ট হয় স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

পশ্চিম পাকিস্তানের উপর দিয়েও এ যুদ্ধের ধকল কম গেল না। প্রায় এক লক্ষের মতো যুদ্ধাপরাধীকে ভারত ও তার মিত্রশক্তি বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর হাতে বন্দী হতে হয়। সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে তাই পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দাবিতে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু ভারতের তরফ থেকে শ্রীমতী গান্ধী এ বিষয়ে জানিয়ে দেন যে যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তির প্রশ্ন কেবল ভারতের একতরফা নয়। বাংলাদেশ সরকারেরও। আর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানও বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশ কোন বৈঠকে মিলিত হবে না বলে জানিয়ে দেন। জিদ ধরলেন পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার আগে কোন আলোচনা হতে পারে না দু' দেশের মধ্যে।

কিন্তু সিমলা চুক্তির প্রধান অন্তরায় কেবল যুদ্ধবন্দী বিনিময় নয়, কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বলবৎ রাখা। কিন্তু ভারত তাতে রাজী হয়নি।

এক হাজার শব্দ সম্বলিত এই চুক্তিতে বলপ্রয়োগের নিন্দা করা হয়েছে। এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যা কিছু বিরোধ তা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই মীমাংসা করা হবে বলে নেওয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত। উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারত ও পাকিস্তান বিরোধের অবসান ঘটাবে। এবং দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির জন্য প্রয়াসী হবে। কিভাবে দু' দেশের মধ্যে শান্তি স্থায়ী হবে, সে সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকেরও উল্লেখ আছে। অফিসার পর্যায়ের বৈঠকে যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, অসামরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি, জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এবং পাক ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্স্থাপনের বিষয়ও বিবেচনা করা হবে।

পাকিস্তান গত যুদ্ধে ভারতের যে এলাকা দখল করে নিয়েছিল সেটা পাকিস্তানকে ছেড়ে দিতে হবে। বিনিময়ে ভারতকে হাজার

হাজার বর্গমাইল অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দিতে হবে পাকিস্তানকে। তবে এ চুক্তির হার-জিৎ বিচার করতে হলে যে জিনিসটি সকলের আগে এসে পড়ে তা হলো সিমলার হাজার শব্দ সম্বলিত এ চুক্তি পাক-ভারত 'যুদ্ধ বর্জন' চুক্তি অপেক্ষা শ্রেয়। কেননা 'যুদ্ধ বর্জন' চুক্তিটি হল নেতিবাচক। অর্থাৎ দুই দেশ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে যদি নিজেদের সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারে তবে তা নিশ্চয়ই তাশখন্দ চুক্তিকেও হার মানাবে।

বস্তুতঃ সিমলা চুক্তি একটা পরিণতি নয়, একটি সূচনা মাত্র। এবং তা শুভ। আলাপ আলোচনার পর সিমলায় যে চুক্তি সম্পাদিত হলো, তা ভারত ও পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানের পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সিমলা বৈঠক ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক সহজ, স্বাভাবিক ও প্রশস্ত করে দেবে। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সূচনা করবে নতুন সহযোগিতা ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের। উপশম করবে উত্তেজনা এ উপমহাদেশে।

সিমলা চুক্তির পূর্ণ বয়ানটি উদ্ধৃত করা গেল এখানে:

১। ভারত ও পাকিস্তান সরকার স্থির করেছেন, এ পর্যন্ত দু' দেশের মধ্যে যে সকল বিরোধ বিসংবাদের ফলে উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে সেগুলি বন্ধ করতে হবে এবং উভয় দেশ পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ও চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্রতী হবেন, যার ফলে উভয় দেশ জনগণের কল্যাণের জন্য সকল সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করতে পারেন।

এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ভারত ও পাকিস্তান সরকার নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন:

(ক) রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ ও নীতি অনুযায়ী উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকবে।

(খ) উভয় দেশ শান্তিপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করবেন।

(গ) উভয় দেশ অঙ্গীকার করেছেন যে সকল বিরোধের

শান্তিপূর্ণ মীমাংসা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের স্বীকার এবং অপর দেশের স্বার্থে হস্তক্ষেপ না করার নীতি সমান ও পারস্পরিক স্বার্থে পালন করে চলবেন।

(ঘ) গত ২৫ বছর যাবৎ যে সকল বিরোধের ফলে উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে সেগুলির কারণসমূহ শান্তিপূর্ণ উপায়ে দূর করতে হবে।

(ঙ) উভয় দেশ সর্বদা পারস্পরিক জাতীয় ঐক্য, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব মেনে চলবেন।

(চ) উভয় দেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ অনুযায়ী অপর দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা অথবা রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন করার জন্য বলপ্রয়োগ অথবা ভীতি প্রদর্শন করবেন না।

২। উভয় সরকার পরস্পরের বিরুদ্ধে অমিত্রোচিত প্রচার বন্ধের সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উভয় দেশ পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের সহায়ক সকল সংবাদ প্রচারে উৎসাহ দেবেন।

৩। উভয় দেশের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ও সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত ও পাকিস্তান সরকার নিম্নরূপ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছেন :

(ক) সকল প্রকার যোগাযোগ—ডাক-তার, সমুদ্রপথ, স্থলপথ এবং বিমান পথ—পুনরায় আরম্ভ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) উভয় দেশেই অপর দেশের নাগরিকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

(গ) সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা পুনরায় শুরু করা হবে।

(ঘ) বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিনিময় ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যসূচী গ্রহণের জন্যে উভয় দেশের প্রতিনিধিগণ মাঝে মাঝে মিলিত হবেন।

৪। চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে উভয় সরকার স্থির করেছেন যে :

(ক) ভারতীয় ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরে ফিরে যাবে।

(খ) জম্মু ও কাশ্মীরে ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে যে যুদ্ধবিরতি রেখা সৃষ্টি হয়েছে উভয় দেশ নিঃসংকোচে তা মেনে চলবেন।

কোন পক্ষই একক ভাবে ঐ সীমারেখার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য প্রবৃত্ত হবেন না। উভয় দেশই ঐ সীমারেখা লঙ্ঘনের জন্য শক্তি প্রয়োগ অথবা ভীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবেন।

(গ) এই চুক্তি কার্যকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমারেখার নিকট থেকে উভয় দেশের সেনাবাহিনী পিছনে সরে যেতে শুরু করবেন এবং ত্রিশ দিনের মধ্যে তাঁদের ঐ কাজ শেষ করতে হবে।

(ঘ) এই চুক্তি উভয় দেশের সরকার নিজ নিজ সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী অনুমোদন করবেন এবং ঐ অনুমোদনপত্র পারস্পরিক বিনিময়ের পর চুক্তিটি কার্যকরী হবে।

(ঙ) উভয় সরকার স্থির করেছেন যে, পারস্পরিক সুবিধা অনুযায়ী দেশের নেতৃবৃন্দ পুনরায় মিলিত হবেন। ইত্যবসারে উভয় সরকারের প্রতিনিধিগণ চিরস্থায়ী শান্তি, পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতিসাধন, যুদ্ধবন্দীদের এবং অসামরিক ব্যক্তিদের নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে আনা, জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান এবং উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় সংস্থাপন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাবেন।

স্বাঃ ইন্দিরা গান্ধী
প্রধানমন্ত্রী
ভারতীয় গণতন্ত্র

স্বাঃ জুলফিকার আলি ভুট্টো
প্রেসিডেন্ট
ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে বলপ্রয়োগের নীতি পরিহার সম্পর্কে উভয় দেশের নেতৃবৃন্দ এক হওয়ায় এ চুক্তি রাষ্ট্রসঙ্ঘে অভিনন্দিত হয়। বৃটেন, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি বিশ্বের প্রায় সকল দেশই এ চুক্তিকে স্বাগত জানায়। বলা হয় এশিয়ার রাজনীতিতে এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিও তাকে সমর্থন জানায়। শুধু জনসঙ্ঘের সভাপতি সিমলা চুক্তিকে 'কালা চুক্তি' বলে অভিহিত করেন। এবং এর বিরুদ্ধে জনমত সংঘঠন করার জন্য আন্দোলন চালাতেও প্রয়াসী হন। তাহলেও দেশের জনসাধারণ এ চুক্তিকে তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। সিমলায় স্থায়ী শান্তির ভিত স্থাপন করতে পেরেছেন বলে—'শান্তির নবযুগের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন বলে' প্রেসিডেণ্ট ভুট্টো তাঁর বিদায়ী বার্তায় মন্তব্য করেন। এবং বলেন, 'শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা যদি এই চুক্তি কার্যকর করতে ব্রতী হই তাহলে আমরা আমাদের জনগণকে দিতে পারবো শান্তি।'

শ্রীমতী গান্ধীও সিমলায় পাকিস্তানী সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অনুরূপ আশা পোষণ করেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

'আমরা যদি নিজেরা নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে না পারি তবে এশিয়া চিরদিনই নিপীড়িত হয়ে থাকবে।······

'আমাদের অবশ্যই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সকল বিরোধের মীমাংসা করতে হবে।'

হার-জিতের প্রশ্ন নয়। ২ জুলাই গভীর রাত্রে সিমলার শৈলশিখরে নাটকীয় পরিবেশে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো তা কেবল বিচক্ষণতা ও বাস্তব দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়, তা এশিয়ায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। দীর্ঘ বিশ বছরের শত্রুতা ও হানাহানির পর বাইরের কারও মধ্যস্থতা না নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মিলনের প্রস্তাব—এ সিমলা চুক্তিরই প্রভাব কিনা তা বিবেচনা

করবে উত্তরসূরীরা। সত্যি, এ চুক্তি শুধু ভারত-পাকিস্তান মৈত্রীর পথই নির্দেশ করেনি, খুলে দিয়েছে আফ্রো-এশীয় মহাদেশে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক নতুন দিগন্ত। এখানেই ইন্দিরা-নীতির জয়যাত্রা। এশিয়ায় নতুন যুগের নতুন সূচনা।

শ্রীমতী গান্ধীই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। ভারত-পাকিস্তানের ১৪ দিনের লড়াই-এর পরে শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেন, তিনি তাঁর তিন শপথ পূর্ণ করেছেন। এই তিন শপথ হলো—বাংলাদেশের স্বাধীনতা, শেখ মুজিবের মুক্তি ও ভারতে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্‌বাস্তুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতের বীর জওয়ানরা দুনিয়ার সামরিক ইতিহাসে এমনই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যার নজীর খুব একটা পাওয়া যায় না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির মুখে তিনি একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে যুদ্ধের অবসান ঘটান। এবং বিশ্বদরবারে প্রমাণিত করেন ভারত শান্তিবাদী দেশ, 'আগ্রাসী' নয়, প্রতিবেশী দেশকে গ্রাস করার কোন অভিপ্রায় ভারতের নেই। শুধু তাই নয়। ১৯৭০ সালের ১৪ দিনের লড়াইয়ে আট কোটি মানুষের নতুন এক দেশের জন্মও বিশ্ব ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানেই শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষুরধার বুদ্ধি, কূটনৈতিক কৌশল ও মহান নেতৃত্বের পরিচয়ের স্বাক্ষর রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো মজবুত করার উদ্দেশ্যে ১৭ মার্চ ১৯৭২ সালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ঢাকা সফরে যান। এবং শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। মার্চ '৭২ ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ২৫ বৎসর মেয়াদী ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তির অনুরূপ শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৫ মার্চ '৭২ নির্দিষ্ট তারিখের ১০ দিন পূর্বেই বাংলাদেশ থেকে যৌথ ভারতীয় ফৌজের শেষ দলটি ফিরে আসে।

আগস্ট ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিল্লী এলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সহযোগিতাপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির পরেই ভারত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে তিন প্রধানের প্রসিদ্ধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির ফলে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকার করে। সকল যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এবং বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক পাকিস্তানে আটক ছিল তারাও স্বদেশে ফিরে আসে। বাংলাদেশে যে সকল পাকিস্তানী নাগরিক ছিল তারাও ফিরে যায়। এভাবে সকল যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধ অপরাধীদের সমস্যা সমাধান হলে ভারত ও পাকিস্তান দু'দেশের মধ্যে ডাক ও তার বিভাগের কাজ আবার চালু হয়। এবং যাওয়া আসার নিয়ম-কানুন আবার প্রবর্তিত হয় ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ তারিখের এক চুক্তিনামায়।

১৬ মে ১৯৭৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নয়াদিল্লীতে এলে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তিনি যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন তাতে দুই দেশের বোঝাপড়া ও সহযোগিতার শান্তিচুক্তির বুনিয়াদ আর এক ধাপ এগিয়ে যায়।

বেরুবাড়ী নিয়ে বিরোধ আপোসের মধ্যে মিটে যায়। এছাড়া দুইদেশের মধ্যে সীমানা এলাকা (এনক্লেভ) নিয়ে যে বিরোধ ছিল তাও পরস্পরের আলাপ-আলোচনায় সমাধান হয়। ফরাক্কা বাঁধ নিয়েও শেষপর্যন্ত দুইদেশের প্রতিনিধিরা একটা বোঝাপড়াতে আসেন। কলিকাতা বন্দর আর বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় গঙ্গার জলের সমান বিলি ব্যবস্থাতেও ওঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

১২ জুন, ১৯৭৫ সালের স্মরণীয় একটি দিন।

এ দিনেই এলাহাবাদ হাইকোর্টে চাঞ্চল্যকর রায় প্রকাশিত হয়। এ রায়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রায়বেরিলি কেন্দ্রের লোকসভার নির্বাচন নাকচ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, সংসদে প্রধানমন্ত্রীর সদস্যপদও ছ'বছরের জন্য খারিজ করা হয়। ১৯৭২-এর সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে তাঁর

প্রতিদ্বন্দ্বী সংযুক্ত স্যোশালিষ্ট দলের প্রার্থী শ্রীরাজনারায়ণকে লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। শ্রীমতী গান্ধী পান ১,৮৩,৩০৯ ভোট, আর শ্রীরাজনারায়ণ পান ৭৯,৪৯৯ ভোট। কিন্তু শ্রীরাজনারায়ণ এলাহাবাদ হাইকোর্টে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনে বৈধতার প্রশ্ন তুলে এক মামলা দায়ের করেন। শ্রীরাজনারায়ণ অভিযোগ করেন :

(১) শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সচিবালয়ের বিশেষ আমলা শ্রীযশপাল কাপুরের সাহায্য নিয়েছেন। যশপাল কাপুর তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী ছিলেন।

(২) শ্রীমতী গান্ধী তাঁর নির্বাচন সফরে ভারতীয় বিমান-বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছেন।

(৩) শ্রীমতী গান্ধী উত্তরপ্রদেশ সরকারের আমলাদের তাঁর নির্বাচনের সভা-সমিতির কাজে নিয়োগ করেছেন।

(৪) ভোটদাতাদের তিনি নানারূপ উপহার উপঢৌকন দিতে কসুর করেননি।

(৫) ভোটদাতাদের শ্রীযশপাল কাপুর ভাড়াকরা গাড়ি ও যানবাহনের সাহায্যে নির্বাচন কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন।

(৬) শ্রীমতী গান্ধী তাঁর নির্বাচনী প্রতীক গাই ও বাছুর-এ ধর্মীয় প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন।

(৭) শ্রীমতী গান্ধী তাঁর নির্বাচনে ৩৫,০০০ হাজারেরও অধিক টাকা ব্যয় করেছেন।

শ্রীমতী গান্ধী শ্রীরাজনারায়ণের প্রতিটি অভিযোগ জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেন। দীর্ঘদিন ধরে এই মামলার শুনানী চলে। বিচারপতি শ্রীজগমোহন লাল সিং-এর নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় পর্যন্ত দাঁড়াতে হয়। ১৯ মার্চ ১৯৭৫ সাক্ষ্য দিতে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী বলেন : শ্রীযুত কাপুর সচিবালয় থেকে ১৩ জানুয়ারী ১৯৭২ সালে পদত্যাগ করেন। এবং সেদিন তিনি দিল্লী ছেড়ে চলে যান। রায়বেরিলিতে শ্রীযুত কাপুর কখন

গিয়েছিলেন তা শ্রীমতী গান্ধীর জানা নেই। ১ ফেব্রুয়ারী তারিখেই তিনি প্রথম মনোনয়নপত্র পেশ করেন। এবং তখনই শ্রীযশপাল কাপুরকে তিনি তাঁর নির্বাচনী প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। কাজেই '১৪ জানুয়ারী ১৯৭২ তাঁকে আমার নির্বাচন প্রতিনিধি নিয়োগ করেছি' একথা সত্য নয়। কারণ, 'আমি তখনও নির্বাচনে প্রার্থীই হইনি।'

এখানে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮ মার্চ এলাহাবাদ হাইকোর্টে শ্রীমতী গান্ধী যখন তাঁর নির্বাচনী মামলায় সাক্ষ্য দিতে ওঠেন, তখন গোবিন্দ মিশ্র নামে এলাহাবাদের এক হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদককে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকালে পুলিশ শ্রীযুত মিশ্রের কাছে একটি গুলিভরা রিভলবার পায়। জিজ্ঞাসাবাদে প্রকাশ শ্রীমিশ্র তাঁর পত্রিকার জন্য প্রধানমন্ত্রীর মামলার খবর সংগ্রহ করতে নাকি কোর্টে এসেছিলেন। ১৯৬৯ সালের এক হত্যা মামলায় গোবিন্দ মিশ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

এ ঘটনারই তুদিন পরে ২০ মার্চ ১৯৭৫ দিনের বেলা রাজধানী দিল্লীর জনপথে ভারতের প্রধান বিচাবপতি শ্রীঅজিতনাথ রায় তাঁর ছেলের সঙ্গে গাড়ি করে ফিরছিলেন। তখন তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে তুটি গ্রেনেড ছোড়া হয়। সৌভাগ্যক্রমে গ্রেনেডগুলির বিস্ফোরণ হয়নি। তাই প্রধান বিচারপতি শ্রীযুত রায়ের প্রাণরক্ষা পায়। নইলে জানুয়ারী মাসে বিহারের সমস্তিপুর ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটত। সমস্তিপুরে ঐ গ্রেনেড বিস্ফোরণে রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রকে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হয়।

সে যাই হোক, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরেই সুপ্রীমকোর্টে আপীলের পুর্বে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিরোধী দল সোচ্চার হয়ে ওঠে। সুপ্রীমকোর্টের শেষ নিষ্পত্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করা তাঁদের আর তর সইল না। এমন কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমোহন ধারিয়া প্রমুখ অনেকেই শ্রীমতী গান্ধীর পদত্যাগের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন।

রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমোহন ধারিয়া এক বিবৃতিতে বলেন : 'শ্রীমতী গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে সংসদীয় গণতন্ত্রে একটি দৃষ্টান্ত থাকত।' শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এবং তামিলনাড়ুর ডি. এম. কে. মুখ্যমন্ত্রী মুথুভেল করুণানিধিও অনুরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। লোকসভার নির্দলীয় প্রবীণ সদস্য মিঃ ফ্র্যাঙ্ক এণ্টনী কিন্তু বিপরীত মনোভাব পোষণ করেন। এবং বলেন যে আপাততঃ প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ হাইকোর্টই তাঁকে আবেদন করতে সময় দিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর নির্বাচনের বিরুদ্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে সেটা নীতিবিরোধী অসাধু কর্মপন্থার জন্য নয়। কেবল ভুলচুকের জন্য।

এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির জরুরী সভার বৈঠক ডাকা হয়। এবং ৪৯৪ জন সদস্যের মধ্যে ৪৫০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ১৯ জুন কংগ্রেস সংসদীয় দলের এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি 'পূর্ণ আস্থা' জ্ঞাপন করা হয়। এবং বলা হয় 'জাতির স্বার্থে' প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব বজায় রাখা উচিত।

শ্রীমতী গান্ধী এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন : 'আমার প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকা বা না থাকা বিরোধী দলের দাবির উপর নির্ভর করে না। শুধু নির্ভর করে আমার নিজের পার্টি এবং জনগণ আমায় চায় কিনা তার উপর।

এদিকে নয়াদিল্লীতে ২০ জুন প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর সমর্থনে লক্ষাধিক জনতার হয় এক বিরাট সমাবেশ। এই বিপুল জনতাকে উদ্দেশ্য করে শ্রীমতী গান্ধী বলেন :

'দেশের ভিতরের এবং বাইরের শক্তিশালী দল আমার বিরুদ্ধে আজ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তারা প্রধানমন্ত্রীর জীবন নাশের চেষ্টা করতেও ইতস্ততঃ করেনি। কোন দেশই প্রধানমন্ত্রীর উপর এমনিধারা বিরোধী আক্রমণ উপেক্ষা করবে না।' আরও তিনি বলেন,

'বস্তুতঃ কোন কোন দেশের নেতৃবৃন্দ আমায় তো সরাসরি প্রশ্ন করেছেন, কেন আমি এদের এতখানি প্রশ্রয় দিচ্ছি ?'

সুপ্রীমকোর্টের অবকাশকালীন বিচারপতি শ্রীভি. আর. কৃষ্ণ আয়ারের এজলাসে ২৩ জুন ১৯৭৫ শ্রীমতী গান্ধীর আপীলের মামলা উঠলো। তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে সংসদ আর মন্ত্রিসভায় স্বীয় পদে বহাল থাকবার আদেশ দেন ২৪ জুন ১৯৭৫। কিন্তু জানান, শ্রীমতী গান্ধী সংসদে কোন ভোট দিতে পারবেন না— মামলার বিচারাধীনকালে।

সুপ্রীমকোর্টের এ হুকুমনামায় বিরোধী দল নতুন করে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের উপস্থিতিতে এক বৈঠকে তারা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ২৯ জুন ১৯৭৫ আইন অমান্য আন্দোলন অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলে। এই আন্দোলনকে মদত দিচ্ছিলো বিরোধী 'সংগঠন কংগ্রেস', 'জনসংঘ', 'ভারতীয় লোকদল', 'সোশ্যালিষ্ট পার্টি' আর 'আকালী দল'। সি. পি. এম. আর ডি. এম. কে. দলের প্রতিনিধিও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ২৫শে জুন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ দিল্লীর এক বৃহৎ সমাবেশে সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। সামরিক ফৌজ আর পুলিশবাহিনীকে ডাক দিয়ে বলেন তাঁরা যেন সরকারের 'অন্যায়' হুকুম মান্য করতে অস্বীকার করেন।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ আরও বলেন, 'বিচারপতি আয়ারের বিচারাধীন রায় বর্তমান পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। এতদিন বিষয়টি ছিল শালীনতা ও নীতিগত প্রশ্ন। কিন্তু এখন বিষয়টি দাঁড়িয়েছে যে প্রধানমন্ত্রীর হাত দুটি রজ্জুবদ্ধ। সংসদে যাঁর ভোট দেবার অধিকার নেই তিনি কি দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন ? প্রধানমন্ত্রী দেশকে এক স্বৈরতন্ত্রের দিকে নিয়ে চলেছেন।' তিনি তাই উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তাঁরা যেন প্রস্তুত হন : কর দিতে করেন অস্বীকার আর আইন অমান্য করে দলে দলে

করেন কারাবরণ। সামরিক ফৌজ এবং পুলিশবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন :

'সরকারী আমলাদের কোন অন্যায় হুকুম তামিল করা অনুচিত। সামরিকবাহিনীর দায়িত্ব হলো ভারতীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করা, তাঁদের কর্তব্য হলো সংবিধানকে রক্ষা করা। পুলিশবাহিনীকে অন্ধের মতো কাজ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়নি; তাঁদের উচিত ভেবে দেখারও। তাঁদের কি কোন আত্মসম্ভ্রম বোধ নেই? তাঁরা কি কেবল এক টুকরো রুটির জন্যই কাজে নিযুক্ত হয়েছেন?'

গত দেড় বছর ধরে বিরোধী পক্ষ দেশের মধ্যে যে হিংসা, দ্বেষ, অনাচার ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে আসছিল, নিয়মতান্ত্রিক সরকারকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে যে অবাধ চক্রান্ত চালিয়ে আসছিল তা রোধ করবার জন্য সরকার এবার বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন।

২৫শে জুন ১৯৭৫ শ্রীমোরারজী দেশাইকে সভাপতি ও জনসংঘের শ্রীনানাজী দেশমুখকে সেক্রেটারী করে 'লোকসংঘর্ষসমিতি' গঠিত হল। ২৫ জুন দিল্লীর রামলীলা ময়দানে তার এক বিরাট জনসমাবেশে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে অমান্য করতে আহ্বান জানান। এবং বলেন: 'এ সরকারের সঙ্গে আমরা কোন সহযোগিতা করব না। এক পয়সার ট্যাক্সও দেব না।'

আইন অমান্য আন্দোলন ভারতে কিছু নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু দেশের সামরিকবাহিনী ও পুলিশকে শাসন অমান্য করবার প্ররোচনা জরুরী অবস্থার সূচনা করেছিল। পরিস্থিতি আর যাই হোক ২৬ জুন রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার ঘোষণা করেন সারা দেশে। এমার্জেন্সি বা জরুরী অবস্থার ঘোষণাপত্রে জানান হয় :

'আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন। তাই জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়েছে।'

এখানে উল্লেখযোগ্য ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় সারা দেশে যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল তা ছিল

বহিঃশত্রুর আক্রমণের কবল থেকে দেশের নিরাপত্তার জন্য। আর এ জরুরী অবস্থা কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য। যদিও ঐ জরুরী অবস্থার মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি, তবুও নতুন করে রাষ্ট্রপতি সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার নির্দেশ দিলেন। ফলে সারা দেশে বিপুল ধরপাকড় শুরু হল। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীরাজনারায়ণ প্রমুখ অনেকেই গ্রেফতার হন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণার সমর্থনে সেদিনই এক বেতার ভাষণে বলেন :

'গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অকেজো করে তুলবার জন্য দেশব্যাপী এক ব্যাপক ও গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে। কাজেই রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। আপনারা জানেন ভারতের সাধারণ মানুষের স্বার্থে আমি কিছু কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলাম। গণতন্ত্রের নাম করে গণতান্ত্রিক এ কর্মসূচীকে বানচাল করাই এই গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন :

'গণভোটে নির্বাচিত সরকারকে স্বাভাবিক শাসনকার্য পরিচালনা করতে এঁরা দিচ্ছেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনত নির্বাচিত পরিষদকে বাতিল করে দেবার উদ্দেশ্যে পরিষদ-সদস্যকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। তাঁদের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য তাঁরা হিংসাত্মক কার্যাবলীর আশ্রয় নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রের শোচনীয় মৃত্যুতে সমগ্র দেশ অভিভূত। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত অজিতনাথ রায়ের উপর অনুরূপ আক্রমণ প্রচেষ্টাও নিন্দার। শুধু তাই নয়, কোন কোন ব্যক্তি আমাদের সামরিক ফৌজকে বিদ্রোহী হতে এবং পুলিশবাহিনীকে রাজদ্রোহী হতে প্ররোচিত করতেও দ্বিধা করেননি। অবশ্য আমাদের প্রতিরক্ষাবাহিনী ও পুলিশ নিয়মনিষ্ঠ ও নিতান্ত দেশভক্ত। কাজেই তাঁরা ঐ প্ররোচনার শিকার হননি। নিজেদের কর্ম-নিষ্ঠার অন্যথা করেননি। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দল আমাদের

ঐক্যের বুনিয়াদ বিপন্ন করতে সাম্প্রদায়িক জিগিরেরও আশ্রয় নিয়েছেন।'

প্রধানমন্ত্রী তারপর বলেন :

'আমার বিরুদ্ধে সকল প্রকার মিথ্যা অপপ্রচারেরও আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। ভারতের জনগণ আমাকে ছেলেবেলা থেকে জানেন। তাঁদের সেবায় আমি নিজেকে সঁপে দিয়েছি। এটা ব্যক্তিগত বিষয় নয়। আমি প্রধানমন্ত্রী থাকব কি থাকব না, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল প্রধানমন্ত্রীর আসন। গণতন্ত্রের নাম করে তাকে দলবদ্ধভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চলেছে, এটা কিন্তু জাতিস্বার্থের বিরোধী।

'দীর্ঘকাল থেকেই আমি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে এই গতি লক্ষ্য করে আসছি। কোন সরকারই দেশের স্থায়িত্বকে এভাবে বিপন্ন হ'তে দিতে পারে না। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কার্যকলাপ বৃহত্তর জনসাধারণের অধিকারকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। দেশের মধ্যে জাতীয় সরকারের শাসনক্ষমতা দুর্বল হতে শুরু করলে বাইরের বিপদ দেখা দেয়। তাই দেশের ঐক্য ও স্থায়িত্ব রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। জাতির সংহতির খাতিরেই এসব ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়।'

আইন শৃঙ্খলা মেনে চলা নাগরিকের নিজ নিজ অধিকারের উপর নতুন জরুরী অবস্থা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন। দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি দ্রুত উন্নত হলেই এই জরুরী অবস্থা যত শীঘ্র সম্ভব প্রত্যাহার করা হবে বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দান করেন।

দেশ বিদেশ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট জরুরী অবস্থার সমর্থনে বহু অভিনন্দন পত্র আসতে থাকে। তাঁর হাত শক্ত করার জন্য অনেকে অনুরোধ করেন। প্রেসিডেন্ট টিটো প্রমুখ অনেকেই শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানিয়ে তারবার্তা পাঠান। এবং জানিয়ে দেন জরুরী অবস্থা ভারতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

সোভিয়েত টেলিভিশনের এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী জরুরী অবস্থা কেন প্রয়োগ করা হয় তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন: 'আমরা এই হিংসা দ্বেষ, মিথ্যা অপপ্রচার ও অভিযান এতদিন সহ্য করে আসছিলাম। কিন্তু যখনই বিরোধীদল সুযোগ বুঝে সরকারী কার্যকলাপ অচল করে দিতে উদ্যোগী হল তখন আমরা আর বল্‌গা না কষে পারিনি।'

শ্রীমতী গান্ধী বুঝেছিলেন ভারতকে ভিয়েতনাম তৈরির চক্রান্ত করা হয়েছে। বানানো হচ্ছে আর এক 'চিলির পটভূমিকা'! এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কি চুপ করে বসে থাকা উচিত? তাঁর কি একথা বলা ন্যায়সঙ্গত হত—কি করব সব ঈশ্বরের ইচ্ছা! ভারত মাই লাই হত্যাকাণ্ডের দিনে ফিরে যাক্‌। সাম্প্রদায়িক হত্যা সংঘটিত হতো এবং তার দ্বারা বিদেশের অন্ধ ব্যবসায়ীদের সুবিধে হতে পারে। কিন্তু ভারতের কিছুতেই মঙ্গল হোত না।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ঐন্দ্রজালিকের যাদুকাঠির স্পর্শে যেন দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি পুনরায় ফিরে আসে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, গণটোকাটুকি প্রভৃতি বন্ধ হয়ে স্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয়। ট্রাম বাস যান-বাহনে বিনাটিকিটে চলা বন্ধ হয়। রেলপথের আয় বিপুলভাবে বেড়ে যায়। রেলের চাকাও কাঁটায় কাঁটায় চলতে থাকে। সরকারী অফিসে আমলাদের উপস্থিতির হার পায় বৃদ্ধি। এবং পুঞ্জীভূত কাজের বহর বহুলাংশে হ্রাস পায়। শুধু তাই নয়। আমলাদের কাজের পূর্ণ পর্যালোচনার পর অকর্মন্য, অসাধু আমলা বাছাই করে তাদের কাজ থেকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের দু'হাজারের অধিক কর্মচারীকে, এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর বহু আমলাও রয়েছেন, অবসর গ্রহণ করতে হয়।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যেই (১ জুলাই ১৯৭৫) প্রধানমন্ত্রী তাঁর ২০ দফা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন। দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ ও সামাজিক কাঠামোকে মজবুত, জোরদার

করার উদ্দেশ্যে। তিনি যে নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন, তা হলো:

১. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য-হ্রাস-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা।
২. কৃষিজমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া এবং উদ্‌বৃত্ত জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা।
৩. ভূমিহীন ও গরীব শ্রেণীর মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা।
৪. বেগার খাটানো বে-আইনী করা।
৫. কৃষি, শ্রমিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের ঋণ মকুব করা।
৬. ন্যূনতম কৃষি-মজুরী আইনত করা।
৭. আরো ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচ প্রকল্পের অধীনে আনায়ণ এবং ভূমিগ্রস্থ জল ব্যবহারের জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা।
৮. অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কর্মসূচী গ্রহণ এবং কেন্দ্রের অধীনে বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা।
৯. হস্তচালিত তাঁতশিল্পের জন্য নতুন উন্নয়ন প্রকল্প।
১০. দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে কম দামে অপেক্ষাকৃত ভাল কাপড় সরবরাহ।
১১. শহরের জমি সমাজতন্ত্রীকরণ।
১২. কর ফাঁকি রোধ এবং অর্থনৈতিক অপরাধীদের সরাসরি বিচার ও কঠোর সাজার ব্যবস্থা।
১৩. চোরাচালানকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।
১৪. বিনিয়োগ ব্যবস্থা সহজ করা ও আমদানী লাইসেন্স অপব্যবহারের জন্য সাজার ব্যবস্থা।
১৫. শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা।
১৬. সড়ক পরিবহনের জন্য জাতীয় ভিত্তিতে পারমিট প্রথা চালু করা।
১৭. আট হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর ছাড় দেওয়া।
১৮. ছাত্রাবাসের ছাত্রদের জন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ।

১৯. বই খাতা পেন্সিল ইত্যাদি লেখাপড়ার সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিতরণ। এবং

২০. অপেক্ষাকৃত দুর্বলশ্রেণীর লোকদের মধ্যে নয়া শিক্ষানবিশী পরিকল্পনা চালু করা।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচী ভারতের ইতিহাসে এক নতুন পদক্ষেপ। এ কর্মসূচী আমাদের অনড় অর্থনীতিকে প্রণোদিত করেছে উৎপাদনমুখী অর্থনীতিতে। এ কর্মসূচী ভেঙে দিতে চেয়েছে সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনকে। মুক্তি দিয়েছে দারিদ্র্যের বন্ধন থেকে লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কিষাণ ও ক্ষেতমজুরকে। এ উৎপাদনমুখী শক্তি ও গ্রাম্যজীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় জোয়ার এনেছে পরিবর্তনের। উদ্‌বৃত্ত জমি লক্ষ লক্ষ পরিবারের বেকারদের দিয়েছে কাজ, আয় বাড়িয়েছে সংসারের। গান্ধী ও জওহরলালের অনুসৃত ঐতিহ্যধারায় শ্রীমতী গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচী ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লবকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছে। দেশের অর্থনীতি দাঁড়াতে পেরেছিল মজবুত ভিত্তির উপর। রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও এসেছিল স্থিরতা, শান্তিশৃঙ্খলা সর্বত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯৭৫-৭৬ সাল ভারতীয় ইতিহাসে একদিক থেকে স্মরণীয় বছর।

ফলে আজ ভারতের খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য সংগ্রহ গিয়েছে রেকর্ড ছাড়িয়ে। সরকারী খাদ্যভাণ্ডারে জমা খাদ্য লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁচেছে। মুদ্রাস্ফীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সফল হয়েছে। পাউণ্ড ও স্টার্লিং-এর তুলনায় টাকার মূল্য দশ বছর আগে যা ছিল তার চেয়ে ভাল বলা যায়। কাজেই ভারতের অর্থনীতির জগতে প্রধান-মন্ত্রীর ২০ দফা কর্মসূচী এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করে। এবং দুরন্ত রাজনৈতিক বিরোধিতা, দুঃসহ অপপ্রচার ও প্ররোচনা সত্ত্বেও শ্রীমতী গান্ধী আপতকালীন অবস্থায় দেশের মানুষের কল্যাণ প্রচেষ্টায় ১৯৭৫-৭৬ সালের ঐ সময়ে যে সাফল্যলাভ করেছিলেন তা তাঁর 'স্বেচ্ছাচারী' শাসনের উপহার বলে নিশ্চয়ই ইতিহাসে উপেক্ষিত হবে না।

প্রধানমন্ত্রীর সাহস ও দূরদর্শিতা ভারতবর্ষকে রক্তাক্ত অরাজকতা থেকে রক্ষা করেছে। জাতীয় জীবনে ফিরিয়ে এনেছে শৃঙ্খলা; নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যবোধ। ১৯৭৫ সালের ২৬ জুনের আগেকার দিনগুলির কথা স্মরণ করলেই বোঝা যাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে সেদিন বিরোধী শক্তিগুলি কোন্ পথ বেছে নিয়েছিল। পার্লামেণ্টের ভিতরে পর্যন্ত একজন বিরোধী নেতা অনশন অবলম্বন করে নির্বাচিত সরকারের ন্যায্য অধিকার ও কাজকর্ম অচল করে দিতে চেয়েছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারকে তাঁরা ইঁট-পাটকেল, বোমা-বন্দুকের ভয় দেখিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। ছাত্র ও যুবশক্তিকে বিভ্রান্ত করে সর্বাত্মক বিপ্লবের সামিল করা হয়েছিল। অর্থাৎ নির্বাচিত সরকারকে জোর করে গদি থেকে নামিয়ে পাঁচ-মিশালী সরকার কায়েম করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। জরুরী অবস্থায় এক বছরের খতিয়ান যাচাই করে আজ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না কেন এই আদেশের প্রয়োজন ছিল। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের গুণে এবং জনসাধারণের সংকল্প ও অক্লান্ত শ্রমের ফলে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী দেশের ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কুড়ি দফা কর্মসূচী সামনে রেখে গোটা জাতিকে তার সাফল্যে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। এক বৎসরের মধ্যেই তার সুফল দেখা গেছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং উগ্রপন্থী বামপন্থী শক্তিকে দমন করে জরুরীকালীন বিধি দেশের মানুষের জীবনে এনে দিয়েছিল নিশ্চিন্ত ভাব ও নিরাপত্তা। স্কুল-কলেজ বা য়ুনিভার্সিটিতে স্টুডেণ্ট পাওয়ার বা ইয়ুথ পাওয়ারের নামে যে কাণ্ড কারখানা চলত তা বন্ধ হয়ে এখন দেশের সর্বত্র নির্বিঘ্ন ও নিয়মিত পড়াশোনা চলেছিল। মুনাফাবাজি মজুতদারির হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য সারা দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত। মূল্যবৃদ্ধিও রোধ করা হয়েছে। বিনোবাজী জরুরী অবস্থাকে বলেছেন জাতির অনুশাসন পর্ব। তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো ভারতীয় রেলে সময়ানুবর্তিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

এই শৃঙ্খলাবোধ বিভিন্ন শিল্পে, কলে-কারখানায় ও আপিসেও বহুলাংশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে জরুরী অবস্থার মধ্যেই। সমাজের যারা দুর্বলতম অংশ সেই দাস-শ্রমিকদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে অন্যায় বন্ধন থেকে। গ্রামের গরিবদের ঋণ মুকুব এবং ক্ষেত-মজুর, দিন-মজুরদের জন্য ন্যূনতম বেতন নির্দিষ্ট করে দিয়ে সমাজের বঞ্চিতদের জীবনে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। জরুরী অবস্থা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রম ও শৃঙ্খলার মূল্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে আমাদের বৃহত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

এদিকে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সুপ্রীমকোর্টের রায় বেরুলো। ১৯৭১ সালে রায়বেরেলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন বাতিল করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর আবেদন সুপ্রীমকোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর করেন এবং শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন বৈধ বলে ঘোষণা করেন। শ্রীমতী গান্ধী আগামী ছয় বছরের জন্য কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না বলে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাঁর উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন সুপ্রীমকোর্ট তাও নাকচ করে দেন। সুপ্রীমকোর্টের কনস্টিটিউশন বেঞ্চের পাঁচজন বিচারপতিই এলাহাবাদ হাইকোর্টের ১১ জুন ১৯৭৫ তারিখের রায় বাতিল করে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন বৈধ বলে ঘোষণা করেন। শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচনে কোন প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি এবং নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমাণ সংক্রান্ত 'চিলিং' অতিক্রম করেন নি বলেও বিচারপতিরা অভিমত প্রকাশ করেন।

সুপ্রীমকোর্টের পাঁচজন বিচারপতি হলেন: প্রধান বিচারপতি শ্রীঅজিতনাথ রায়, বিচারপতি খান্না, বিচারপতি কে. কে. ম্যাথু, বিচারপতি এম. এইচ. বেগ এবং বিচারপতি ওয়াই. ভি. চন্দ্রচূড়।

শ্রীমতী গান্ধী লক্ষাধিক ভোটে এস. এস. পি. প্রার্থী শ্রীরাজনারায়ণকে পরাজিত করে লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর

আইন ও রাজনীতিগত যে দীর্ঘ লড়াইয়ের সূত্রপাত হয় এই সিদ্ধান্তের ফলে তার অবসান ঘটল।

কামাগাটামারু নগরে ডিসেম্বর ১৯৭৫ নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর ভাষণে যা বলেন তাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন: 'আজকের মতো ভারতের স্বাধীনতা ইতিপূর্বে আর কোন বড় বিপদের সম্মুখীন হয়নি।'

প্রধানমন্ত্রী প্রদীপ্ত কণ্ঠে আরও বলেন:

'নিখিল ভারত কংগ্রেস, শ্রীমতী গান্ধী অথবা ভারত সরকার কোন ভুল-ত্রুটি করল কি না একান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের আশে-পাশে বহিঃশক্তিসমূহ আর দেশের মধ্যে তাদের বন্ধু-বান্ধবরা। কোন সুযোগ পেলে তাঁরা তার সদ্‌ব্যবহার করতে ছাড়বেন না। মার্কিন আর ফরাসী সংবাদপত্রগুলি অপর দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে কসুর করেনি।

চিলিতে যা ঘটে গেছে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। তারই অনুরূপ আমাদের দেশেও অনুষ্ঠিত হবার চেষ্টা চলছিল।'

প্রধানমন্ত্রী তারপর বলেন:

'ইন্দিরা আজ থাকুন বা নাই থাকুন সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণ দেখবে দেশের নেত্রী যেন ভীতু কাপুরুষ না হন। তিনি যেন সমাজতন্ত্রের পথ থেকে বিচ্যুত না হন।...

'আজ যদি জনসংঘ ক্ষমতায় আসীন হতো, তাহলে কোনো জরুরী অবস্থার প্রয়োজন হতো না। প্রয়োজন হতো কোতল করার। বাংলাদেশ আর চিলিতে তাই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। লোককে ধরে ধরে কেবল জেলে পোরা হচ্ছে না, খতম করাও হচ্ছে।'

শ্রীমতী গান্ধী তারপর আরও বলেন:

'কংগ্রেস সংবিধান পরিবর্তন চায়নি। কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি ডাকা হোক—দাবিও তোলেনি। বরং বিরোধী নেতারাই তা দাবি করেছিলেন।'

শ্রীমতী গান্ধীর বিশ দফা কর্মসূচীর সঙ্গে যুবনেতা শ্রীসঞ্জয় গান্ধী আরও পাঁচ দফা সংযোজন করেন :

১. একজন আর একজনকে শিক্ষা দেবে।

২. প্রত্যেককে একটি করে গাছ পুঁততে হবে।

৩. পণ ছাড়া বিয়ে।

৪. হাম দো, হামারা দো। এবং

৫. জাতিভেদ প্রথা বিলোপ।

পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে যুব-কংগ্রেস নেতা শ্রীসঞ্জয় গান্ধী সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে অবসর সময় নিজ নিজ কেন্দ্রে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা কর্মসূচী কার্যকর করে তুলতে আবেদন জানান। এই কর্মসূচীর পিছনে তিনি কেবল 'মগজ যোগান'-নি, তাদের কার্যকর করে তুলতে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর যুব সমর্থকদের নিয়ে দিল্লীর 'বস্তি উন্নয়নে' আত্মনিয়োগ করেন। পণ প্রথার বিরুদ্ধে সারা দেশে জোরদার প্রচারকার্য চালান। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচারেও সচেষ্ট হন। আর শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানে নজর দেন। চোরাই চালানদার, ঘুষখোর, আমলা, মুনাফাখোর ব্যাবসাদার ও ব্যাবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদের মুখোশ খসিয়ে দিতে তৎপর হন।

১৮ জানুয়ারী (১৯৭৭) প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা করলেন গণতান্ত্রিক ভারতের ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের কথা। এবং এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৬ মার্চ ১৯৭৭। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর মন্ত্রি-পরিষদের সব সদস্যদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা করবারও অবকাশ পাননি। কেননা নির্বাচনের তারিখ যেদিন ঘোষিত হয় সে সময় পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীযশবন্ত বলবন্ত রাও চ্যবন পূর্ব ইওরোপ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি শ্রীমতী গান্ধীর সিদ্ধান্তের কথা জেনে যুগোশ্লোভাকিয়া সফর বাতিল করে সরাসরি দিল্লী চলে আসেন।

নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ ধার্য করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেছিলেন কি করেন নি সেটা বড় কথা নয়। ১৬ মার্চ ষষ্ঠ নির্বাচন ডেকে তিনি তাঁর রাজনীতির আর এক দফা নতুন পদক্ষেপ করলেন। সহসা নির্বাচন ডেকে তিনি তাঁর বিরোধীপক্ষকে রীতিমত কাবু ও অপ্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। বিরোধী নেতৃবর্গের বেশীর ভাগই তখন কারারুদ্ধ বা আত্মগোপন করে রয়েছেন। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগও নেই। কাজেই বিশৃঙ্খল বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোটযুদ্ধে বিভ্রান্ত ও পরাজিত করতে কোনভাবে বেগ পেতে হবে না প্রধানমন্ত্রী ও শাসক কংগ্রেসকে। নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত। প্রধানমন্ত্রীর সহযোগীরাও তাঁর সঙ্গে সমান তালে সায় দিয়ে গেলেন।

লোকসভা নির্বাচন এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছে করলে লোকসভার নির্বাচন আরও দীর্ঘকাল পিছিয়ে দিতে পারতেন, এবং তা পারতেন জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়েই। জরুরী অবস্থাও থাকত অব্যাহত। কিন্তু তিনি ১৯৬৯ সালের মত গ্রহণ করলেন নতুন চ্যালেঞ্জ। ইন্দিরা একাদশকের (১৯৬৬-৭৭) শাসনকার্যের সমর্থন চাইলেন জনগণের কাছে। সাধারণ নির্বাচনের কথাও ঘোষণা করলেন। ঘরে ও বাইরে জরুরী অবস্থা, ধরপাকড়, কারাবাস ইত্যাদি জবরদস্তি নীতির বিরুদ্ধে যে গুঞ্জরণ উঠেছিল তারও একটা মোকাবিলায় আসা যাবে ভাবলেন বুঝি। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর রাজনৈতিক চালে কোথায় যেন ভুল হলো। ১৮ জানুয়ারী নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ঘোষিত হলো: দু'মাসের মধ্যেই নির্বাচন ও ফলাফল। সহসা নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রতিপক্ষকে হতচকিত, অপ্রস্তুত করে দেবেন বুঝি ভাবলেন। ভাবলেন পাঁচমিশালী বিরোধী দল এত অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের সংগঠিত করতে পারবে না। আর শাসক কংগ্রেসের জয় হবে সুনিশ্চিত। গত নির্বাচনের মত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলেও কংগ্রেস তার নির্বাচনী জোট সি. পি.

আই-এর সঙ্গে নির্বাচনে জয়লাভ করে আবার নতুন কংগ্রেস সরকার কায়েম করতে পারবে।

তিনি অবশ্য তাই আশা করেছিলেন। কিন্তু 'ইন্দিরা হাওয়া' দেশের মধ্যে ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে আসছিল। এই রূঢ় সত্য শ্রীমতী গান্ধী বুঝি যথাযথ উপলব্ধি করেন নি। যদি করতেন তাহলে বুঝতে পারতেন ১৯৭৫ সালের জুন মাস থেকে গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনেই কংগ্রেস-বিরোধী হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। পাঁচ-দলের জনতা ফ্রণ্ট গুজরাটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বিধানসভায় কংগ্রেস সরকারকে করে পরাস্ত।

কংগ্রেস-বিরোধী হাওয়া তারপর থেকেই বুঝি বইতে শুরু করে দেশের সর্বত্র হু হু করে। শ্রীমতী গান্ধী ও শাসক কংগ্রেসের পায়ের নীচ থেকে মাটি ক্রমশ সরে যেতে থাকে। আর সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এবং আশ্চর্যেরও, শ্রীমতী গান্ধী কি কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ড তা একবার ভেবেও দেখেন নি। কংগ্রেসের নির্বাচনী সাঙাৎ সি. পি. আই. প্রভৃতি যাঁরা পরে শ্রীসঞ্জয় গান্ধী ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের কার্য-কলাপের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তখনই সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন "সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ আমার নিজের বিরুদ্ধে আক্রমণ" বলে।

এখানে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ভূমিকা সাধারণ আর পাঁচটি মায়ের ভূমিকার চেয়ে স্বতন্ত্র বলে মেনে নিতে দ্বিধা হয়!

শ্রীমতী গান্ধীর সমালোচকেরা মহা ফাঁপরে পড়তেন যদি তাঁরা ভাবতেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সত্যিই স্বৈরতন্ত্রী হলে লোকসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচন ডাকলেন কেন? তিনি নিজেও ২৮ মার্চ তাঁর বাসভবনে নির্বাচনে পরাজিত কংগ্রেসী লোকসভার প্রাক্তন সদস্যদের এক চায়ের বৈঠকে ডেকেছিলেন। পরাজয়ের সব দায়িত্বভার নিজে তিনি মাথা পেতে নেন। এবং স্বীকার করেন, নির্বাচন ভুল সময়েই ডাকা হয়েছে। জরুরী অবস্থার ফলে জনসাধারণের মনে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সত্য। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে

জোর-জুলুমও করা হয়েছে সাধারণ মানুষের উপর। জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে যে অর্থনৈতিক লাভ হয়েছে তা দেশের সামনে যথাযথ তুলে ধরা হয়নি বলে তিনি জানান। কংগ্রেসের বিপর্যয়ের প্রধান কারণগুলির মধ্যে এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে তিনি মনে করেন। বিদেশী সাংবাদিকদের মতে নির্বাচনে কংগ্রেসের অভাবনীয় পরাজয়ের মূল কারণ প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারী মনোভাব। শ্রীমতী গান্ধী যদি তাই হন তাহলে তিনি গণতান্ত্রিক প্রথামত নির্বাচন ডাকলেন কেন? তিনি কি ভুল করেছেন? না ভেবেছিলেন জরুরী অবস্থার ফলে দেশে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত হয়েছে। আর শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। সুতরাং নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেই। বিদেশী সাংবাদিকদের মতে তৃতীয় জগতের একমাত্র গণতন্ত্রের দেশ ভারত তার ঐতিহ্যকে নষ্ট করেছে।

শ্রীসঞ্জয় গান্ধী শ্রীমতী গান্ধীর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ বলে কোন কোন মহলের ধারণা। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ছেলে সঞ্জয়কে ভাবী 'প্রধানমন্ত্রী'র পদের জন্য তালিম দিচ্ছেন বলে এসব রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক দলের অনেকে অনুযোগ করেন! 'নিউইয়র্ক টাইমস'এর সংবাদদাতা উইলিয়ম বর্ডারস সঞ্জয় গান্ধীকে 'ভারতবর্ষের যুবরাজ' (ইণ্ডিয়ান ক্রাউন প্রিন্স) বলে অভিহিত করেন (১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭)।

শ্রীযুত সঞ্জয় গান্ধী যুক্তপ্রদেশের আমেথী কেন্দ্রে একরূপ অপরিচিত 'জনতা' প্রার্থী শ্রীরবীন্দ্র প্রতাপের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হন। সঞ্জয়ের এ পরাজয় রায়বেরিলী কেন্দ্রে শ্রীমতী গান্ধীর পরাজয়ের মতই অপ্রত্যাশিত বিস্ময়। শুধু সঞ্জয়ই নয়, জরুরী অবস্থাকালীন প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আস্থাভাজন চতুষ্টয়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা সচীব বংশীলাল, তথ্য ও বেতারমন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ওম মেহেতাও পরাজিত হন। বংশীলাল ভিওয়ানি কেন্দ্রে জনতা প্রার্থী শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর নিকট ১,৬১,০০০ হাজারের বেশী ভোটে হেরে যান। আর শুক্লা

পরাজয় স্বীকার করেন শুক্লা-পরিবারের 'পকেটব্যুরো' 'রায়পুর কেন্দ্রে জনতা প্রার্থী পুরুষোত্তম কৌশিক-এর কাছে।

কংগ্রেস বিপর্যয়ের মূলে এ 'চার-ইয়ারী'র ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে দেশের জনসাধারণকে এঁরা বিভ্রান্ত করেছেন, বিপর্যস্ত করেছেন। জোরজুলুম করেছেন পরিবার পরিকল্পনার অজুহাতে, 'নাশবন্দী' করতে করেছেন জবরদস্তি। কণ্ঠরোধ করেছেন সংবাদপত্রের। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে করেছেন হনন। দেশবরেণ্য নেতৃবর্গ থেকে শুরু করে হাজারে হাজারে শাসক-কংগ্রেস বিরোধীকে কারারুদ্ধ করেছেন। দেশে স্বৈরাচারী একনায়কত্বের রাস্তাকে সুগম করেছেন। সংবাদপত্রের উপর 'সেনশরসিপ'-এর বেড়াজাল করেছেন আরোপ। সরকারী প্রচারযন্ত্র হিসাবে দলীয় স্বার্থের প্রচারে রেডিও ও টেলিভিশনের ব্যবহার করেছেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। তার উপর হস্তক্ষেপ, কণ্ঠরোধ মহা অপরাধ। বৃহত্তর শক্তি বা শাসকগোষ্ঠীর কাছে আপাততঃ পরাজয় স্বীকার করে নিলেও, মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পথে নীরবে প্রতীক্ষা করে। গণতন্ত্রী ভারতের জনগণ তারই সুযোগ নেয় লোকসভার ষষ্ঠ নির্বাচনে। সুযোগ নেয় রায়বেরিলী, আমেথী ও আরও শত শত কেন্দ্রে। রায়বেরিলীর নির্বাচন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কংগ্রেস সভাপতির সদম্ভ উক্তি: 'ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া —ইণ্ডিয়া ইজ ইন্দিরা' ভাবমূর্তিটি কিভাবে বিসর্জিত হয়েছে। এ দাবী ইন্দিরা অন্ততঃ কোনোদিন করেন নি। করেছিলেন তাঁর স্তাবকেরা। ইন্দিরাই ভারতবর্ষ নয়—ভারতবর্ষও ইন্দিরা নয়। অন্ততঃ রায়বেরিলীর রায়ে জনসাধারণ তাই সমঝিয়ে দিয়েছে ত্রিশ বছরের শাসক-কংগ্রেসের সমাধি রচনা করে নির্বাচনী ভোটযুদ্ধে।

শুধু রায়বেরিলী কি আমেথী নয়, স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে কংগ্রেস দল যে বিপুল ভোটে প্রতিটি কেন্দ্রে জয়লাভ করে এসেছে এবার হলো তার ব্যতিক্রম। গত ১৯৭১-এর নির্বাচনেও কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়ে জয়রথে ফিরে আসে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা

অর্জন করে। কেন্দ্রে কংগ্রেসী শাসন পুনরায় কায়েম হয়। তখন কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল ভারতের ষষ্ঠ নির্বাচনে এই কংগ্রেসেরই হবে পরাজয়? কংগ্রেস দল এক তৃতীয়াংশ আসনও পাবে না! লোকসভার মোট ৫৪২টি আসনের মধ্যে শাসক-কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ২৫৩টি আসন আর 'জনতা-জোট' পেয়েছে ২৭০টি। শ্রীজগজীবন রামের গণতন্ত্রী কংগ্রেস ২৮টি। দিল্লীর মসনদে অ-কংগ্রেসী 'জনতা-রাজ' হলো প্রতিষ্ঠিত।

শাসক কংগ্রেসের এই পরাজয়ের কারণ কি? নির্বাচনের মুহূর্তে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী প্রবীন কংগ্রেস নেতা (ভারতের কোটি কোটি গরীব আদমী অনুন্নত সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেতা) শ্রীজগজীবন রামের মন্ত্রিসভা থেকে সহসা পদত্যাগ? কংগ্রেসী অন্তর্দ্বন্দ্ব? শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের জনপ্রিয়তা?—'জনতা হাওয়া'ই কি কংগ্রেস-বিপর্যয়ের মূলে? এর কারণ?

কংগ্রেস-বিপর্যয়ের মূলে যে কোন একটি বা সমষ্টিগত কারণই থাকুক না কেন, এটা বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে দেশের জনসাধারণ বিশেষত দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেস-বিরোধী শিবির ইন্দিরা শিবিরের পরিবর্তে জনতা শিবিরের দিকেই ঝুঁকেছিল। 'পোলারাইজেশন'-এর খেলও বলা যায়। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনেও আজকের মত শাসক-কংগ্রেস অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়—হরেক পার্টির যুক্তফ্রন্ট গোষ্ঠীর নিকট।

তবে দাক্ষিণাত্যের ওয়েষ্টারন ঘাট বা বিন্ধ্যপর্বতের উত্তুঙ্গ চূড়া অতিক্রম করে কংগ্রেস-বিরোধী জনতা-হাওয়া অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীরাও দুই শিবিরের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েন নি। কংগ্রেস-বিরোধী জোট গড়ে তুলতে পারেন নি। 'পোলা-রাইজেশন' গণ্ডী বিস্তারলাভ করতে পারেনি সেখানে। ফলে জনতা পার্টি মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরালা প্রভৃতি দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস-ই বিজয়ী হয়েছে।

উত্তর ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-বিরোধী—ইন্দিরা-বিরোধী হাওয়া বইলেও দক্ষিণে এবং পূর্ব-ভারতে তারই ব্যতিক্রম ঘটেছে।

ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর পরাজয়ের কারণগুলি এক নজরে দেখলে দেখা যাবে :

(১) জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

(২) সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের স্বাধীনতা হরণ যা স্বভাবতঃই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ে গরিষ্ঠতম অংশের মনে প্রচণ্ড সরকার-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল। প্ররোচিত করেছিল সরকার-বিরোধী প্রচারে।

(৩) গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপ, যা কার্যতঃ দেশের জনসাধারণের মনে ঐ অধিকারগুলোকে সংরক্ষিত করার জন্য এক অখণ্ড রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করেছিল। শুধু তাই এই ব্যাপক চেতনার কাছে স্থানীয় সমস্যাগুলি হয়ে গিয়েছিল ম্লান। ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই প্রথম সিভিল লিবার্টি এবং প্রোটেকশন অব ডেমোক্রেটিক রাইট নির্বাচনে সবচেয়ে বড় পলিটিক্যাল ইস্যু হিসেবে দেখা দিল।

(৪) 'এক্সট্রা কনস্টিটুশনাল' পাওয়ার হিসেবে ভারতীয় রাজনীতিতে সঞ্জয়ের আবির্ভাব এবং তার উদ্ধত ও ক্ষমতা বহির্ভূত কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবকে আরও তীব্রতর করে তুলতে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

(৫) ক্ষমতা-পিপাসু এবং স্বার্থান্বেষীরা ব্যাপকভাবে পার্টিতে অনুপ্রবেশ করেছিল। তাদের জনস্বার্থ-বিরোধী সুবিধাবাদী কাজ-কারবার, যারা যে কোন পার্টিরই টিঁকে থাকার রাজনৈতিক গ্যারান্টি সেই জনসাধারণকে পার্টির কাছ থেকে বহু দূরে ঠেলে দিয়েছিল এবং সারাদেশ জোড়া কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভাবমূর্তিকে (পলিটিক্যাল ইমেজ) কলঙ্কিত করেছিল।

(৬) 'যে কোনরকম বিরোধীতাই দেশের স্বার্থবিরোধী' এই মনোভাবের শিকার হয়ে শ্রীমতী গান্ধী বাম, দক্ষিণ, র‍্যাডিক্যাল, লিবারেল সব দলেরই উপর যেভাবে দমন-নীতি চালিয়েছিলেন তা কার্যতঃ এক বিরাট বামপন্থী গণতান্ত্রিক ঐক্যের জন্ম দিয়েছিল, যার বাস্তব প্রতিক্রিয়া ('কংক্রিট ম্যানিফেসটেশন') হচ্ছে জনতা পার্টির জন্ম।

(৭) উপদলীয় কোন্দল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। যে সব রাজ্যে এই জিনিস হয়নি সেখানে কংগ্রেস অপেক্ষাকৃত ভালো ফল দেখাতে পেরেছে।

(৮) জরুরী অবস্থা চলাকালীন 'শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ছত্র-ছায়া'য় সঞ্জয়ের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পদার্পণকে ভারতীয় জনগণ বংশানুক্রমিক স্বৈরাচারের ভূমিকা বলে বোধ করেছিলেন।

(৯) ইন্দিরা সরকারের বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ নীতি—পাবলিক সেক্টরের প্রতি বিশেষ ঈর্ষার উদ্রেক করে এবং মার্কিনপন্থী 'ভারতীয় বুর্জোয়া'দের এক বিরাট অংশের ইন্দিরার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ।

(১০) পরিশেষে পরিবার পরিকল্পনার নামে কড়াকড়ি ও কংগ্রেস-বিরোধিতাই পরাজয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতীয় লোকসভার ষষ্ঠ নির্বাচন সত্যিই এক রক্তপাতহীন নিঃশব্দ বিপ্লব। জনগণের এ রায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মাথা পেতে নেন। তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রীর মসনদ থেকে নেমে এলেন। 'ইন্দিরা দশক'এর একটানা একাদশ বছরের ঘটনাবহুল শাসনের হলো অবসান। এ সাধারণ নির্বাচনের মানদণ্ডে ভারতীয় গণতন্ত্রের ঠ্যাস বুনিয়াদ বিশ্বের এক বিস্ময়। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সফদরজং রোড থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

শ্রীজাত্তির নিকট যে পদত্যাগপত্র পেশ করেন তাও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :

'আমি মাথা পেতে নিলাম জনগণের রায় নিঃশর্তে, সবিনয়ে। এ রায় জনগণের যৌথ রায়। আমার সহকর্মীরা মেনে নিলেন। নিলাম আমিও।

'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আনুগত্য আমাদের গভীর। নির্বাচন তারই একটা দিক। দেশের শক্তিবৃদ্ধি এবং জনগণের জন্য উন্নততর জীবন সুনিশ্চিত করে তোলার চেয়ে নির্বাচনে হার-জিতের গুরুত্ব যে কম, একথা আমি সব সময় বলেছি, এখনও বিশ্বাস করি।

'আসন্ন নতুন সরকারের উদ্দেশ্যে আমার শুভেচ্ছা রইল। আশা করব, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজবাদী ও গণতান্ত্রিক বুনিয়াদ আরও মজবুত হয়ে উঠুক। জাতির সামনে যে সব সাধারণ কাজ রয়েছে, সে কাজে কংগ্রেস দল এবং আমি সহযোগিতায় তৈরি রইলাম।

'আমাদের মহান দেশের জন্য আমরা গর্বিত। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আমার সহ-কর্মীবৃন্দ, আমার দল এবং যে লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু আমার হাতে তাঁদের আস্থা সমর্পণ করেছিলেন, যাঁরা সহযোগিতা করেছেন এবং বহু বছর ধরে যাঁরা আমাকে গভীরভাবে স্নেহ দেখিয়েছিলেন তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সর্ব শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে আমার আগ্রহ আর ভালবাসা এতটুকু বদলে যাবে না। পরিপূর্ণ সহিষ্ণুতায় মানুষের সেবা করাই ছিল শৈশব থেকে আমার ব্রত। তা আমি করে যাবই। আপনাদের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা, শুধু এখন নয়, সব সময়ের জন্য। ইতি—

বিনয়াবনত

ইন্দিরা-নেহরু গান্ধী'

১৯৭৭-এর ২০ মার্চ জনতা দলের বিজয় এবং ইন্দিরা-সরকারের পরাজয় ভারতের গণতন্ত্রে এক নবীন অভ্যুত্থান। শ্রীমতী ইন্দিরার একাদশ বৎসরের শাসনকালের সমস্ত গৌরব কেড়ে নিয়ে তাকে ধূলোয় লুটিয়ে দেওয়া হলো। আর আপতকালীন দিনগুলির অন্ধকার মূর্তির শবব্যবচ্ছেদে জনতা সরকার হয়ে উঠলেন উন্মত্ত।

জনতা সরকারের ভূমিকায় যে তিনজন প্রধান ছিলেন, কংগ্রেস দলত্যাগী শ্রীজগজীবন রাম এবং শ্রীমোরারজী দেশাই এবং জনতা দলের সর্বোচ্চ প্রবক্তা চৌধুরী চরণ সিং—তিনজনই প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য যে দলীয় কোন্দল শুরু করলেন তাই থেকে প্রমাণ হলো ভারতের আপামর জনসাধারণ সুযোগ্য জাতীয় নেতৃত্বের সৌভাগ্য খুইয়ে বসেছেন।

জনতা দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ছিল না। জননায়ক জয়প্রকাশের আশীর্বাদ ও প্রচেষ্টা যদিও মোরারজী দেশাইকে প্রধান-মন্ত্রীত্বে সমাসীন করেছিল কিন্তু জনতা দলে পরস্পর কাদা ছোড়া-ছুড়ি, ক্ষমতার লড়াই ও কোন্দলের শেষ হলো না। ফলতঃ দেশের মূল সমস্যাসমূহ ও অর্থনীতির ডামাডোলকে সামাল দিতে জনতা সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলেন।

ইন্দিরা গান্ধী, সঞ্জয় ও অন্যান্য সহযোগিদের শাস্তি দেবার জন্য জনতা সরকার যত তৎপরতার সঙ্গে একটার পর একটা কমিশন বসিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারী কোষাগার ঢেলে দিয়েছেন এবং ইন্দিরার শাস্তি বিধানের জন্য বিশেষ আদালত বসিয়েছিলেন ততখানি মনোযোগ ছিল না জনতা সরকারের দেশের মানুষের কল্যাণ সাধনে।

সমাজবাদী দলগুলিও জনতা সরকারের ছত্রছায়ায় লেনিনের অবিস্মরণীয় ফতোয়া 'এক পা এগুনো, দু'পা পিছনো'র নীতিতে নিযুক্ত ছিলেন।

দেশের হাওয়া যে বহুমুখী রইবে না, ঘূর্ণীঝড় যে থিতিয়ে যাবে সে তো আমাদের দেশের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের চোখের চাওয়ায় বোধ করবার উপায় নেই, উপায়ও ছিল না শ্রীমতী ইন্দিরার ভাবমূর্তিকে যমুনার জলে বিসর্জিত করার।

বিবর্ণ হয়েছিল ইন্দিরার মুখচ্ছবি, সহকর্মী জগজীবন রাম, যশোবন্ত রাও চ্যবনের উপদেশ ও অনুদেশে একজন মহিলার হাতও কঠোর হয়েছিল। কিন্তু ইন্দিরা-কংগ্রেসই জনতা সরকারকে ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অন্ধ্রপ্রদেশের চিকমাগালুরের উপনির্বাচনে হলেন বিজয়িনী। তবু কিন্তু লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটির অবমাননার অপরাধে তাঁকে সপ্তাহকাল তিহার জেলে কাটাতে হলো। ইতিপূর্বে সঞ্জয়কেও একমাসকাল তিহার জেলে বন্দী থেকে তাঁর 'পর্বতপ্রমাণ' অপরাধের খেসারত দিতে হয়েছে।

সে যাই হোক, আমরা ইন্দিরার বিজয়িনী ভূমিকাকে সবিস্তারে নথিবদ্ধ করব না। এখনও তাঁর পরিষ্কার নথিপত্র মেলানো দুরূহ। আপতকালীন ভূমিকায় ইন্দিরার অনেকানেক দুর্মুখ ও অভিসন্ধি-মূলক আচরণের লেখাজোখা কম নেই। ভারতীয় বুদ্ধিমান পাঠক-কুল তার সারমর্ম সহজেই গ্রহণ করেছেন।

শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বের অবসান ঘটেছিল জনতা সরকারের ২৮ মাস শাসনের পর। এটা ঘটেছিল শ্রীচরণ সিং-র (পূর্বকালীন লোকদল নেতা) রাজনৈতিক তৎপরতায়। শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেস (ইন্দিরার) দলের সাহায্য নিতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। দুর্ভাগ্যতঃ জনতা সরকারের পূর্বোক্ত ভূমিকা ইন্দিরা ও সঞ্জয়ের প্রতি প্রতিশোধমূলক আচরণ থেকে চরণ সিং-ও মুক্ত হতে পারেন নি। ফলতঃ ইন্দিরা কংগ্রেস চরণ সিং সরকারকে আর সাহায্য

করতে প্রস্তুত ছিলেন না। চরণ সিং অবশ্য তাঁর সমস্ত জীবনের উচ্চাশা প্রধানমন্ত্রীর পদ জিতে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর জাট-কুলের এই কৃতিত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭৯ সাল ২০ আগষ্ট চরণ সিং লোকসভায় তাঁর মন্ত্রীত্বের পদত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করেন।

২২ আগষ্ট রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের ৮৫ অনুচ্ছেদে তাঁকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ধারা অনুযায়ী লোকসভা ভেঙে দেন।

এরপর অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনের পালা। ডাক উঠল 'ইন্দিরা লাও দেশ কো বাঁচাও'!

কী অসম্ভব যাদুবলে একটা দলভাঙা কংগ্রেসের সংগঠনকে ইন্দিরা শক্ত-হাতে বাঁচিয়ে রাখলেন, কেমন করে তাঁর সংহারক মূর্তি দেবী দুর্গার সোনার রঙে ঝলমল করে উঠল, কোথা থেকে পেলেন তাঁর অভয়া শক্তি তা নিয়ে কল্পনা করে লাভ নেই। জনসাধারণের বিপুল ভোটে তিনি রাইবেরিলীতে গোয়ালিয়রের রাজমাতাকে নির্বাচনে পরাজিত করলেন। কংগ্রেস (ই) সারা দেশের নির্বাচনে লোকসভার দুই তৃতীয়াংশের থেকে অনেক বেশী আসন পেলেন। এবং দলনেত্রী ইন্দিরা পুনর্বার ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হলেন। ১৯৮০ জানুয়ারীর ১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণে তিনি বলেন:

'গত কয়েকদিন ধরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। যে বিশ্বাস এবং ভালোবাসা নিয়ে আজ আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন, কার্যভার গ্রহণ করার পর আমার প্রথম কর্তব্য হল তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। আমি কোন দল বা পক্ষভুক্ত হয়ে একথা বলছি না। পরম আগ্রহ এবং আন্তরিকতায় দেশের মানুষ আমাদের দিকে আজ যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেই উচ্চ বন্ধনকে আমরা প্রসারিত করতে চাই, নতুন ভারতবর্ষ গড়ার অভিযান আমাদের তাই স্বপ্ন।'

তিনি আরও বলেন:

'প্রাক্তন জনতা এবং লোকদল সরকার, ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে দেশের আর্থিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোয় যেটুকু শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তা ধুয়েমুছে দিয়ে গেছে তাদের তিরিশ মাসের শাসনে। আমরা এমন একটা সময়ে দায়িত্বভার হাতে নিচ্ছি যখন একদিকে প্রচণ্ড খরা এবং উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় রসদের ভয়ংকর রকম সংকট, শুধুমাত্র অবহেলা এবং অক্ষমতা থেকেই যার সৃষ্টি ; তেমনি অন্য দিকে শিল্পক্ষেত্রে দেড় বছর ধরে একটানা শ্রমবিরোধ, যার ফল হিসেবে ক্ষতির খাতায় জমা হয়েছে পাঁচ লক্ষ শ্রম-দিবস।

দূরদর্শিনী ইন্দিরার প্রথম সংকলনে যেখানে আমরা পাঠ শেষ করেছিলাম সেখানে তিনি ছিলেন নবজাত বাংলাদেশের বিজয়িনী বন্ধু, ইন্দিরা বিজয়িনী—দূরদর্শিনী !

ইতিমধ্যে দুরন্ত দুপুরের অন্ধকারে পরাস্ত ইন্দিরাকে ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মত ভাবতে শুরু করা হয়েছিল। সেই ছেঁড়া পাতা কালো ঠোঙার মত, ব্যবহৃত হয়ে হয়ে হলুদ বিবর্ণ হয়ে এসেছিল সেই ইতিহাস। দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলি ভেবেছিলেন নেহরু-কন্যা ভারতের রাষ্ট্রমঞ্চে সম্পূর্ণ নির্বাসিতা, এবং তাঁর কথিত অপরাধের তালিকা হিমালয়ের চেয়েও দীর্ঘতর। এ কারণে তাঁর রাজনৈতিক মৃত্যু অনিবার্য।

একদা ইন্দিরাকে নিয়ে দেবীপূজার সমারোহ ছিল। 'ইন্দিরা হল ভারত, ভারত হল ইন্দিরা' এমন সোচ্চার উক্তি শোনা গিয়েছিল অবিভক্ত কংগ্রেসী নেতাদের মুখে। অন্য পক্ষে রাইবেরিলীতে ১৯৭৭-এর নির্বাচনে পরাস্ত ইন্দিরাকে স্বেচ্ছাচারী গণতন্ত্রের সংহারক বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বংশপরম্পরা ক্রমে ভারত-রাষ্ট্র করায়ত্ত করার অপচেষ্টায় অপরাধী বলেও পাহাড় প্রমাণ তালিকা পেশ করা হয়েছিল, বিশেষ আদালতে।

শোনা গিয়েছিল ইন্দিরা রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে লোকালয় ছেড়ে হিমালয়ে চলে যাবেন। কিন্তু এমনটি ঘটতে পারল না।

জনতা সরকার সর্বতোভাবে তাঁকে রাজনৈতিক অপরাধে জেলে পাঠাতে চেয়েছিলেন। চৌধুরী চরণ সিং তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি সগর্জনে বলেছিলেন, 'যে অপরাধ তিনি (ইন্দিরা) করেছেন, জাতির

মাথায় যে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়েছেন, শাসনতন্ত্রের যে অপব্যবহার ঘটেছে, মৌলিক স্বাধীনতাকে যেভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং আদালতের স্বাধীনতাকে যেভাবে হরণ করা হয়েছিল তার জন্য নুরেমবার্গের মত এক আদালতে তাঁর বিচার হবে।'

ভারতে নুরেমবার্গ হতে পারেনি। তার বদলে কমিশন বসল। অনেকগুলি কমিশন। ছয় ছয়টি। দেশের নানাপ্রান্তে ইন্দিরার অপরাধের সাক্ষ্যসাবুদ জড়ো করা হলো। বিচার হলো শুরু।

২০ মার্চ ১৯৭৭-এ ইন্দিরা রাইবেরিলীর নির্বাচনে হেরেছিলেন। ৩ অক্টোবর ১৯৭৭ জনতা সরকারের আদেশে শ্রীমতী গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচন প্রচারে অবৈধভাবে জিপ সংগ্রহের অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং অন্য একটি অভিযোগ ছিল বোম্বাইয়ের গভীর সমুদ্রে তেল খননের আগে একটা ফরাসী কোম্পানীকে ১৭ মিলিয়ন ডলারে একটি চুক্তিপত্র দেওয়া হয়েছিল, যদিও অন্য একটি সংস্থা ঐ কাজ মাত্র চার মিলিয়ন ডলারে করতে প্রস্তুত ছিলেন। আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট ঐ অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে রায় দিলেন। ইন্দিরাকে জেলে পাঠানো সম্ভব হলো না। আর একবার অবশ্য ইন্দিরাকে জেলে পাঠাতে সমর্থ হয়েছিলেন জনতা সরকার।

পরাস্ত ইন্দিরা দেশপ্রেম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের গা-বাঁচাতে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন নি। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের জন্য যখন ইন্দিরা গান্ধী এবং সঞ্জয় গান্ধীর দলকে দায়ী করে জাতীয় কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ দল ভেঙে বেরিয়ে তৃতীয় কংগ্রেসের পত্তন করলেন, তখন ইন্দিরাই কংগ্রেসের হাল ধরেছেন। ইন্দিরা-কংগ্রেসের নেত্রী বললেন আমি দেশসেবা থেকে ছুটি নিইনি।

১৯৭৮-এর চিকমাগালোর নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচিত হয়ে পার্লামেণ্টে ফিরে এলেন। জনতা সরকারের প্রতিহিংসামূলক আচরণের আর একটি দৃষ্টান্তের ঘটনা হলো, সংসদ অবমাননার দায়ে তাঁকে পার্লামেণ্ট থেকে বহিষ্কার।

এতদসত্ত্বেও ইন্দিরা বলেছিলেন 'দেশের মানুষ যদি আমাকে চায় তবে আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব'। ফিরে তিনি এসেছেনও। এসেছেন প্রবল বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দেশের সমস্ত প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলির জোটবাঁধা বিরোধিতাকে সমূহ পরাস্ত করে।

বিরোধী দলগুলির দেশপ্রেমের যে নজীর নিকট অতীতের প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে সেটা ছিল একান্তই ইন্দিরা-বিরোধিতা। জনতা সরকারের দু'বছরের শাসনকালীন ইতিহাস ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোন্দল ও কাদা ছোঁড়াছুড়ি ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুযোগ্য সরকারের ভূমিকায় জনতা সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিজয়িনী ইন্দিরার পুনরাবর্তনে গণতন্ত্র যে আর নিরাপদ নয়, একথা এখন আবার শোনা যাচ্ছে। এটা খুব স্বাভাবিক। ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ পাঠকমাত্রেই জানেন, রাজনীতির সুবিধাবাদে ইতিহাসকে অনেক অদল বদল করা যায়। প্রগতিপ্রাজ্ঞ মার্কসবাদী দলগুলিও এমন ভুল যে করেন না তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে।

বুর্জোয়া সমাজবাদের রাস্তায় বিরোধী দলেরা থাকবেন এটা স্বাভাবিক। 'গণতন্ত্রের সংহারক' বা 'ভারতী ইন্দিরা' অজাতশত্রু তো কোনদিনই ছিলেন না। তাঁর দূরদৃষ্ট এবং অকথ্য অপরাধ এই যে, তিনি জওহরলাল নেহরুর কন্যা। জার্মান শ্রমিক নেতা লাসাল ফার্দিনান্দ বলতেন—ধনিকতন্ত্রের সমাজবাদী পুনর্বিন্যাসে গণভোট বা গণতান্ত্রিক মাধ্যমই একমাত্র পথ। সেই লাসাল ফার্দিনান্দের সততাও যে ইন্দিরার নেই একথা এ দেশের সমাজবাদীরা বিশ্বাস করেন। ইতিহাসের পরিহাস এই যে, সমাজবাদী বিপ্লবী দলগুলি গণভোট ও গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সমাজবাদের রাস্তা খুঁজছেন।

এই আন্দোলনের যে দীর্ঘপথ সেখানে অলিগলিতে অনেক পথের কাঁটা, ধুলো, নোঙরা। সেখানে অনাহত গোলাপ ফুটতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা একাদশ বৎসরকাল ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর পদে বৃত ছিলেন।

অতিবৃদ্ধ মোরারজীভাইকে ভোটে হারিয়েই কেবলমাত্র তিনি প্রধানমন্ত্রী হন নি। ধনিক তোষণের রক্ষণশীল লক্ষণাক্রান্ত জিদ দেখেছিলেন বলে মোরারজী দেশাইকে নিজের মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্তও করেছিলেন।

আমাদের দেশ বড় দীন। দুঃখী ও দরিদ্র এ দেশের অগণিত জনসাধারণ। এই জনগণ তবুও মহৎ নেতৃত্বে ধনবান। এই নেতৃত্বের প্রথম সারিতে রয়েছেন—মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র। এঁদের কাছ থেকেই পেয়েছি আমরা গণতন্ত্রী স্বাধীন ভারতের উত্তরাধিকার।

এই সব আকাশ উঁচু-মাথা নেতাদের সঙ্গে আমরা তেত্রিশ বছরের স্বাধীনতার জমিতে রক্ত ও শ্রমের ফসলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো বলে বিশ্বাস করছি। উল্লিখিত নেতৃবৃন্দের শিষ্য প্রশিষ্যরা এতাবৎ এই কাজ চালিয়ে এসেছেন। এই কাজের পুরোধা ছিলেন জওহরলাল এবং তাঁর অন্যান্য সুযোগ্য সহকর্মী।

কংগ্রেসে সভাপতি পদে বৃত থাকাকালীন ইন্দিরা গান্ধীই এক-মাত্র নেত্রী যিনি সুবিশাল ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেটা ছিল ২৫ জানুয়ারী ১৯৬৬ সাল, এবং ২০ মার্চ ১৯৭৭ সালে সংসদীয় নির্বাচনে তিনি পরাস্ত হন।

ভারতবর্ষের মত সুবিশাল দেশের দারিদ্র্য-শোষণ, আমলাদের কুশাসন, হরিজন দলন, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, দ্রব্যমূল্যের মহার্ঘ্যতা সব কিছুর জন্য ইন্দিরা এবং তাঁর দলকে দায়ী করা এই সময়ে খুব সহজ ছিল। সহজ ছিল দেশে খরা, বন্যা, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধজনিত সঙ্কটে ইন্দিরা শাসনের পাপকে যুক্ত করার পুণ্যবান সংগ্রামের আহ্বান। দুর্ভাগ্য ইন্দিরার যে শত শত বছরের জীর্ণ শোষিত ভারতের আপামর জনসাধারণকে সোনার দেউলের সিঁড়িতে উঠিয়ে দেবার মত আলাদীনের প্রদীপ তাঁর করায়ত্ত ছিল না।

জনতা দলের বিরোধী নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের একটা পরিষ্কার মর্মার্থ

ছিল। কিন্তু অতীত প্রেক্ষাপটে ইন্দিরা-পূজার আয়োজন যে সব সহকর্মীরা করেছিলেন তাঁরা পরাস্ত ইন্দিরার মন্দির ভগ্নগ্রহগ্রস্ত ভেবে নিজেদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে সহজ করার জন্য কিভাবে ইন্দিরার মূর্তি ভাঙতে মেতেছিলেন সেটা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা যাবে না।

এই সব বিশ্বস্ত সহকর্মীরা দেশে জরুরী অবস্থা জারী করার জন্য একদা ইন্দিরাকে বহুতর পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইতিহাসই কেবল মহৎকে ক্ষুদ্রমানের নেতাদের থেকে আলাদা করে দিতে পারে, সম্ভাব্য পরিণামগুলি অমূল্য বা অকিঞ্চিৎকর বলে চিহ্নিত করতে পারে।

সে যাই হোক, জরুরী অবস্থাকালীন দিনগুলিকে নিয়ে অনেক প্রচার ও অপপ্রচারের অনেক পুঁথি লেখা হয়ে গেছে। সে সব কিতাবে রয়েছে অনেক অন্ধকার দিনলিপি।

পরাস্ত ইন্দিরা ১৯৭৭-এর ২২ মার্চ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বি. ডি. জাত্তির হাতে পদত্যাগপত্র দাখিল করে বলেছিলেন, 'জনগণের একান্ত বিচারকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করতে হবে। আমার সহকর্মী এবং আমি তাঁদের এই বিচারকে নির্দ্বিধা ও দীন-হৃদয়ে মেনে নিলাম।'

নতুন সরকারকে গঠনমূলক প্রচেষ্টায় তাঁর সহযোগিতার আশ্বাসও তিনি দিয়েছিলেন।

তাঁর একাদশ বৎসরের প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ এক বৎসরকাল দেশে যে সব অঘটন ঘটেছিল প্রয়াত সে সব অন্ধকার দিনগুলির কথা মনে করে আমরা দুঃখ পাব। ইন্দিরার পুনর্বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত তাঁর জীবনকে জড়িয়ে দেশ ও জাতির উপর যে করুণ ও অবিশ্বাস্য ঘটনাসমূহ প্রকট হয়েছিল এই পুস্তক পুনর্মুদ্রণে তা সংযোজিত হলো, বিজয়া ইন্দিরা গান্ধীর বিরাট জীবনালেখ্য অল্প কথায় বলতে সচেষ্ট হয়েছে এই গ্রন্থ। অনবধানতা-বশতঃ কোনো অযৌক্তিক প্রশস্তি বা কারো নিন্দাবাদ এ লেখায় যদি উচ্চারিত হয়ে থাকে তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

ইন্দিরার জীবনালেখ্য পর্যালোচনায় এবং তাঁর পুনরাবর্তনে 'তুরন্ত তুপুর'-এর কবিতার সুর বেজে ওঠে। লোরকার অবিস্মরণীয় পঙক্তি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

'নিদাঘ বলেছিল আমরা তৃষ্ণার ছায়া চাই
চন্দ্র বলেছে উজ্জ্বল নক্ষত্রের জন্য আমি তৃষিত
স্ফটিক সরোবর সেই ঠোঁটের যাচ্ঞা করেছে ;
আমারও তৃষ্ণা সুরভির জন্য আর হর্ষোচ্ছ্বাসের জন্য
নতুন গান যেখানে চাঁদ আর পদ্ম নেই, নেই পরাস্ত প্রেম—
আগামী দিনের গান ভবিষ্যে শান্ত জলধারাকে করবে
আন্দোলিত এবং আশায় পরিপূর্ণ হবে তার ঢেউ।'

বিজিত ইন্দিরার জাতির সুবিপুল মহান নেত্রীত্বের মঞ্চে পুনর্বার উঠে আসতে যে দুটি বছর সময় লেগেছিল তার সিঁড়ি ভাঙার শ্রান্তি, ক্লান্তি ও ভ্রান্তির মনে হয়েছে শেষ নেই। রাজনীতির দাবার চালগুলিতে যতই শ্রীমতী গান্ধীকে কিস্তিতে পর্যুদস্ত করবার জন্যে জনতা সরকার নানা কমিশন-এর বোড়ের চালকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন, তাতে জনতা সরকারের জোট-বাঁধা রাজ্য-মন্ত্রীর দলগুলি তাঁদের হাতি ঘোড়ার হাতিয়ারগুলি খুইয়ে বসছিলেন। ফলতঃ জনতা সরকারের মৃত্যুর দিন তরান্বিত হচ্ছিল। জণগনের সেবা বা দেশগঠনে অগ্রগতির আগামী ভূমিকা একটি শপথবাক্য হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, দলীয় আগ্রাসন নেতৃত্বের পদাধিকারের চক্রান্ত, লোভ, অসূয়া, হিংসার কুৎসিত আচরণ সরব হয়ে উঠছিল এই জনতা দলের উপদলগুলির কোন্দলে। যতদিন তাঁরা সরকারে একত্রিত ছিলেন, এক রব ছিলেন সুদ্ধ শ্রীমতী গান্ধীর তথাকথিত অত্যয়কালের দুষ্কর্মের শাস্তি-সাধনে। শাহ কমিশন, মারুতি কমিশনে এবং বিশেষ আদালতে শ্রীমতী গান্ধীর বিচারের জন্যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হচ্ছিল, এক 'ডাইনি হত্যা'র জন্যে নানাবিধ আইনের ভাবনা, এমনকি তিহার জেলে কারাবাসে ইন্দিরাকে অবতরনিকার শেষ ধাপের অন্ধকারে ঠেলেও, ক্রমাগত তাঁকে সূর্যতোরণে উঠে আসতে কোনোক্রমেই পরাহত করা গেল না।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনের পরাজয়ের পর ইন্দিরা বলেছিলেন: তিনি এই পরাজয়ে অনুগৃহীত, একটা অসম্ভব দায়িত্বভার তাঁর কাঁধ থেকে নেমে গেল। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এবার তিনি একজন স্বাভাবিক মানুষের মত বাঁচতে পারবেন। কিন্তু বিধি এতেও বাম

হলো। ঈশ্বর সম্ভবতঃ ইন্দিরা গান্ধীকে দেশ পরিচালনের গুরুভার থেকে অব্যাহতি দেবেন না বলেই স্থিরীকৃত করে রেখেছিলেন। নচেৎ এই পরাজিত হতমান মহিলার উইলিংডন ক্রেসেণ্টের নতুন আবাসস্থলটির খবরাখবরে বিশ্বজোড়া কৌতূহল জেগে রইল কেন?

জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ইন্দিরার ১নং সাফদরজঙ্গের সেই ছোট বাড়ীটিতে চলে আসতে যত উদ্যোগী ছিলেন শ্রীমতী গান্ধীর সেই গৃহ ভেঙে নতুন বাড়ীতে চলে যাওয়া কিন্তু খুব অনায়াসসাধ্য কাজ ছিল না। দীর্ঘ একাদশ বৎসরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গৃহের অন্তরালে আলমারী, সোফা, চিত্রাবলী, কার্পেট এবং গৃহস্থালীর নানা টুকিটাকি ছাড়াও ছিল শ্রীমতী গান্ধীর ব্যাক্তিগত প্রয়োজনে লেখা ও রাখা নানা ঘটনাবলীর পাহাড়প্রমাণ নথিপত্র, ফটোগ্রাফ, সুভ্যেনীর আরও কত কিছু। পুরাতন শুধু তো আবর্জনাই নয়, পুরাতন অনেক কিছু নব-নির্মাণের প্রাণসূত্র। সেগুলিকে ঝেড়ে বেছে বাঁচিয়েই তো চলা। কিন্তু জ্বালিয়ে ফেলতে হলো এই পুরাতনের অনেক দলিল, জ্বালিয়ে ফেলতে হয়েছিল অনেক কিছু এই গৃহ পরিবর্তনের উদ্যোগে। রব উঠল সরকারী ফাইলও পুড়েছে। যথেষ্ট নিন্দার শিকার শ্রীমতী ইন্দিরা সম্ভবতঃ এই অপবাদ বিষয়ে বিশেষ বিচলিত হন নি। অনায়াসে তিনি নতুন বাড়ীতে উঠে এলেন। তাঁর নতুন গৃহ কেমন হলো তা আমরা ক্রমাগতই জানতে পেরেছি, সেই গৃহ যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সিঁড়ির শেষ ধাপ নেমে এসে একটু ফিরে দেখা, একটি স্থিরসঙ্কল্পের অটুট নির্মাণের ভিত্তিভূমিকে মেপে দেখার অনিবার্য অপেক্ষা। এই সময়কালে সংবাদপত্রে নাটকীয়ভাবে সেই খবর লেখা হয়েছিল—হ্যাঁ, শ্রীমতী গান্ধী এখন কি করছেন? এই পরাজিত বড় আঁধার—মুক্তা-মুকুট হারানো দিন-গুলিতে, তিনি কি বিমর্ষ চুপচাপ বসে আছেন? এক নম্বর সফদরজঙ্গ রোডের এতদিনের এই বাড়ী ছিল প্রধানমন্ত্রীর বাড়ী—পি. এম. হাউস। সেই বাড়ীতে এখন পুলিশের কড়াকড়ি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, নেই সে অটোমেটিক রাইফেলধারী ওয়াকিটকি নিয়ে দেয়াল

পাহারার পুলিশ। তবে এক নম্বর সফদরজঙ্গে এখনও প্রচুর ভীড়। এখনও সকাল থেকে অবিরাম রাজনীতিকদের আনাগোনা; এখনও বহু সাধারণ মানুষের দর্শন প্রার্থনা।

নির্বাচনের ফলাফল বের হওয়ার দিনটা তিনি বেশী কথাবার্তা বলছেন না, অনেকটা অন্তর্মুখী তাঁর ভাবনা। পরদিন সকালে স্নান সেরেই পরিবারের সকলের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। আজ সকালে শ্রীমতী গান্ধী চওড়া পাড়ের শাড়ী পরেছেন, উজ্জ্বলশ্রী, মুখে ক্লান্তির এতটুকু চিহ্ন নেই। আগে যেমন সকলের সঙ্গে বসতেন সেই দিনও তেমনি। সঞ্জয় জোড়হাতে সকলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। রাজীব গাড়ী চালিয়ে ছেলে রাহুলকে নিয়ে বেড়াতে বেরুচ্ছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যবে থেকে প্রধানমন্ত্রী, সেই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরে সরকারী শাসন আওতার বাইরে শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার এই সময়কাল দীর্ঘ তিরিশ বছর, সেই স্বাধীনতার প্রত্যুষকাল থেকেই নেহরু পরিবারকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপরিচালনের কথা—এমনি ঘটে গেল। সফদরজঙ্গের পথে একজন অন্ধও তাই বলে উঠল—দেশ কী হারাল তা জানে না কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর দেশপ্রেমকে যে কোনো প্রচণ্ড বিরোধও যে পরাহত করতে পারে না তা সততঃ স্পষ্ট হতে লাগল। ১৯৭৭-এর মার্চ চলে গেছে। শীতার্ত নিঃস্ব পাতা ঝরার দিন কেটে গিয়ে নবপত্রের উদগম, কুয়াশা কেটে আলোর সানাই, এ তো কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আমরা তাঁর শৈশবজীবনের কাহিনী থেকে এই সত্য বোধ করি, ইন্দিরা গান্ধী ছোটবেলা থেকেই শহীদ দীক্ষায় হয়ে উঠেছিলেন জোন অফ আর্কের মত, অথবা মা কমলা নেহরু যেমন আনন্দময়ী মার কাছে ভাগবত-চেতনা প্রার্থনা করেছিলেন তেমনি হয়তো ইন্দিরাও এই ভাগবত-চেতনায় নির্দেশ নিয়েছিলেন তাঁর অন্তর্বাসী আধারে যেখান থেকে তাঁর অমিত শক্তি নেমে এসেছে, প্রবল বিরোধী প্রতিরোধপরায়ণ কুচক্রী, দুর্মুখ ও নিন্দাপরায়ণ

রাজনৈতিকদলগুলিকে এবং জনতা সরকারের সমস্ত দলন প্রচেষ্টাকে পরাহত করায়।

২২শে মার্চ ১৯৭৭-এ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রী দেশে নির্বাচন সমাধা হল। উত্তর ভারতে অধিকাংশ নির্বাচনী ক্ষেত্রে জনতার প্রার্থীদের জয় সূচিত হয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধী রায়বেরিলীতে জনতাপ্রার্থী রাজনারায়ণের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। বিজয়ী রাজনারায়ণ যিনি বহু আয়াসে এই বিজয় সম্ভব করতে পেরেছিলেন তাঁর প্রতিভার সুখ্যাতির চেয়ে পরবর্তীকালে অনেক অপখ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি জাট কুলপতি চরণ সিং মহাশয়ের দাসানুদাস বা 'ভক্ত হনুমান' হয়ে জনতা সরকারের বিশল্যকরণী সন্ধানে যে সকল কাজকর্ম করেছিলেন সে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস। সম্ভবতঃ সে কারণে নতুন মন্ত্রিসভায় তাঁকে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারও দেওয়া হয়েছিল। স্বাস্থ্যদপ্তরের কাজকর্মে এসেই তিনি প্রধানমন্ত্রী দেশাই অভ্যাসিত ব্যবস্থাপনার উপদেশ দিলেন দেশের জনগণকে। কিন্তু জনসাধারণ এই উপদেশের উপহাসটুকু তাঁকেই ফিরিয়ে দিলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন চরণ সিং মহাশয়। তিনি শ্রীমতী গান্ধীর এবং তাঁর পরিবারের তথাকথিত অত্যয়কালের নানাবিধ দুষ্কর্মের বিচারের জন্যে ক্রমান্বয়ে নানা কমিশন বসাবার আদেশ দিচ্ছিলেন ইন্দিরাকে কঠোরতম শাস্তি দিতে তিহার জেলে জঘন্যতম কয়েদীদের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। জনতা সরকারের মন্ত্রিসভার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মন্ত্রীদের মধ্যে রক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হয়েছিলেন শ্রীজগজীবন রাম। বাবু জগজীবন রাম দীর্ঘকাল সুদক্ষ মন্ত্রিত্বের কৃতিত্ব নিয়ে কাজ করে এসেছেন। এই কৃতিত্ব ভারতবর্ষের হরিজনকুলের অসহায়তার এক অত্যুজ্জ্বল প্রতিবাদ। এই হরিজন নেতা প্রায়শঃ নেহরু এবং তাঁর কন্যা শ্রীমতী গান্ধীর প্রশ্রয়েই মন্ত্রিত্ব করেছেন। কিন্তু কংগ্রেস নির্বাচনে

বিপর্যস্ত হবে এমন একটা অঙ্ক তিনি অনায়াসেই মিলিয়েই ফেললেন। ভুলে গেলেন আয়কর ফাঁকি দেবার অভিযোগ যখন লোকসভায় প্রবল হয়ে উঠেছিল তখনও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা এই প্রবীণ নেতাকে তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেন নি। ভুলে গেলেন জরুরী অবস্থার সমস্ত দুষ্কর্মের দায়িত্বের বোঝা একলা ইন্দিরার নয়, তিনিও তাঁর নায়ক। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে 'কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসী' কংগ্রেসত্যাগী এক গোষ্ঠী নিয়ে বাবু জগজীবন রাম জনতা দলে জোট পাকালেন। হয়তো তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পদটিই প্রার্থনায় ছিল। কিন্তু চালে তিনি হেরে গেলেন মোরারজী দেশাইয়ের কাছে। সেই বিস্মৃত ভঙ্গ কংগ্রেস অর্গানিজেশনের নেতা মোরারজী তাঁর অনমনীয় অভিপ্রায়টি যা শ্রীমতী ইন্দিরার একাদশ বৎসর প্রধানমন্ত্রীত্বের অপরাহত দিনেও ভুলে যান নি, দুর্মর স্বপ্নের মত সে ভাবনাকে তিনি লালন করেছিলেন যে দেশে তাঁর চেয়ে প্রধানন্ত্রীর পদের জন্যে আর কেউ যোগ্য ব্যক্তি কেউ হতে পারেন না, তাই হয়েছিল। শ্রীমোরারজী দেশাই হয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী-উত্তর প্রধানমন্ত্রী। বলতে বাধা নেই মোরারজী তাঁর অতি বার্ধক্যেও জনতা সরকারের একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইন্দিরা-বধ যজ্ঞে ততখানি উৎসাহী ছিলেন না। অন্য পক্ষে পার্লামেণ্টে অত্যয়কাল ঘোষণার অনুমোদনসূচক প্রস্তাবের প্রবক্তা ছিলেন বাবু জগজীবন রাম। তিনি যে অনায়াসে শ্রীমতী গান্ধীর স্বৈরাচারী ভূমিকা থেকে নিজেকে মুক্ত করে জনতা দলের একজন মুখ্য দলপতি বলে স্বীকৃত হলেন তাতেই বোঝা গিয়েছিল জনতা সরকার রাজনীতির সুবিধাবাদের শিকার হয়েছে। সাহ কমিশনে তিনি ইন্দিরার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যে বলেছেন জরুরী অবস্থা জারির পরই মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্যে তাঁদের জানানো হয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধী আতঙ্ক রোগে ভুগছিলেন। তাই জরুরী অবস্থা জারী হয়েছিল! কেবলমাত্র বাবু জগজীবন রামই নন কংগ্রেসের অনেকানেক প্রবীন নেতাও শ্রীমতী গান্ধীর ছোঁয়া বাঁচাবার জন্যে প্রায় জনতা সরকারের মতই শ্রীমতী গান্ধীর প্রধান-

মন্ত্রীত্বের অত্যয়কালের সব দোষত্রুটির বোঝা ইন্দিরার ঘাড়েই চাপিয়ে দিতে চাইছিলেন। লোকসভায় কংগ্রেস বিরোধী দলের নেতা শ্রীওয়াই. বি. চ্যাবনকে এঁদের দলে গা ভাসাতে হল। সঞ্জয় গান্ধীর প্রতি শ্রীমতী গান্ধীর প্রশ্রয়, সঞ্জয় গান্ধীর অত্যয়কালে পরিবার পরিকল্পনার জন্মনিরোধক নিবীর্জকরণের নির্বিশেষ অভিযানে এবং দিল্লীনগরীর বস্তি ভাঙার অতিরিক্ত সরকারী ক্ষমতা হাতে নিয়ে এই ইন্দিরা তনয় যে কংগ্রেসের ভাবমূর্তিকে ধূলুণ্ঠিত করেছেন এবং বংশীলালের মত অনৈতিক মর্যাদার মানুষ যে শ্রীমতী গান্ধীর প্রশ্রয়ে কংগ্রেসের কলঙ্ক ডেকে এনেছেন সেই অপরাধে শ্রীমতী গান্ধীকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত হল।

১৯৭৮, ডিসেম্বরে কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী ইন্দিরা গান্ধীকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। আর পূর্বতন ইন্দিরা সরকারের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী চ্যাবন সেই সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন। বস্তুতঃ এই সব ঘটনা যে দল ভাঙার এক অস্বাস্থ্যকর সুবিধাবাদের আশ্রয় তাই প্রমাণিত হতে লাগল। কেন না এইসব ঘটনাকে ইন্দিরা তাঁর লড়াইয়ের এক একটি মহার্ঘ আয়ুধ হিসাবে বেছে নিচ্ছিলেন। এই সময়ে শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করলেন প্রকৃত কংগ্রেস এই দলত্যাগীদের অনুসরণ করছে না। কংগ্রেস কর্মীর অধিকাংশই তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, তাঁকেই নেত্রী বলে অনুমোদন করছেন এবং তিনিই হলেন প্রকৃত কংগ্রেসের প্রবক্তা এবং সেহেতু জাতীয় কংগ্রেস (ইন্দিরা) সংক্ষেপে কংগ্রেস (আই) বলেই দেশের সেবা করে যাবে।

ইন্দিরা যে সঞ্জয়কে অতিরিক্ত স্নেহাশ্রয়ের আশ্বাস দিয়েছিলেন তা তো সঞ্জয়ের সেই মারুতি কারখানায় ছোট গাড়ী নির্মাণ উদ্যোগ পর্বের শুরু থেকেই অভিযোগ ও অনুযোগে সরব হয়ে উঠেছিল। তারপর এল জরুরী অবস্থার অত্যয়কালের প্রারম্ভ কাল। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে সঞ্জয়ের ভাবমূর্তি যুব কংগ্রেসের পুরোধা নেতারূপে ব্যাখাত ও বিবৃত হতে লেগেছিল। সঞ্জয় গান্ধীর 'চার দফা' জাতীয়

যুব কার্যক্রমের পরিকল্পনায় ভারতের বিপুল জনকুলে সীমিত সন্তানের প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করার একটা জেদ উত্তর ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় তাঁদের ধর্মের উপর অন্যায় আঘাত বলেই বোধ করেছিলেন এবং বস্তি সংস্কারের কাজকর্মও বাস্তুহীন দরিদ্র মানুষদেরও কোনও সান্ত্বনা আনতে পারেনি।

এই সময়ে সঞ্জয় গান্ধী সংবাদপত্রে বিপুলভাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিলেন, সারা দেশে কংগ্রেসী সরকারের ছত্রছায়ায় প্রচার যন্ত্রগুলি সঞ্জয়কে নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মান্যগণ্য শিক্ষকরাও সঞ্জয়ের 'কম কথা ও বেশী কাজের' আবেদন মাথা হেঁট করে শুনেছিলেন। কংগ্রেসের বাঘা বাঘা নেতারাও সঞ্জয়ের সন্তুষ্টি বিধানে সচেষ্ট হতেন। এত বেশীই প্রচারিত মানুষ ছিলেন সঞ্জয়। তাঁর সৌভাগ্য যে তিনি ছিলেন ইন্দিরা তনয় এবং দুর্ভাগ্য এই যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাঁর মা। এই সম্পর্ক তাঁর বহুতর নিন্দা প্রাপ্তির কারণ হয়েছিল যখন ইন্দিরা গান্ধী ইমার্জেন্সী তুলে নিলেন, অবাধ নির্বাচনের জন্যে লোকসভা ভেঙে দিলেন। ইন্দিরা গান্ধীও এই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাননি যে তিনি সঞ্জয়কে প্রধানমন্ত্রিত্বের পারিবারিক উত্তরাধিকার উপহার দিতে চেয়েছিলেন, তাই সঞ্জয়কে এই রাজনৈতিক প্রশিক্ষণে নিয়ে এসেছেন।

সঞ্জয় গান্ধী নিন্দার পাহাড় মাথায় করে, দেশজোড়া প্রচণ্ড শত্রুতার ব্যূহ ভেদ করে অক্ষত ও অম্লান অস্তিত্বে তবুও বেঁচেবর্তে ছিলেন এই সেদিনও আমাদের মধ্যে। যখন ইন্দিরা গান্ধী এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে নির্বাচনে অবৈধতার দোষে দুষ্ট হয়েছিলেন, যখন প্রতিবাদী বিরোধী দলগুলি তাঁর পদত্যাগের দাবীতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন, শোনা যায় তখনই এই লাজুক অন্তর্বাসী মানুষটি মায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠিক এই সময়ে তিনি কংগ্রেসী প্রবীন নেতাদের হাত শক্ত করতে যুব সংগঠনে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় জনসাধারণের মধ্যে চলে এলেন। ইন্দিরা যখন

বিজিত, কংগ্রেসের অতি ঘনিষ্ঠ নেতারা যখন তাঁকে পুরাতন হৃতশ্রী বস্তুর মত পরিহার করতে উদ্যোগী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শাস্তিবিধানে যখন জনতা সরকারের অনেক বিধান জারী হচ্ছিল তখনই সঞ্জয় নির্ভীক মায়ের সন্তানরূপে সততই একজন অতি অনুগত সেবকরূপে দাঁড়িয়েছেন তাঁর মায়ের পাশে।

ইন্দিরা গান্ধীর দুর্ভাগ্য যে তাঁর যত অপযশ ও অপখ্যাতি এবং নির্বাচনে তাঁর হেরে যাওয়ার একটি মুখ্য হেতুই ছিল সঞ্জয় গান্ধীর এই বিপুল অপখ্যাতি বা যশের বিবৃতি যা ভারতীয় সংবাদপত্রে এই সময় অনেকখানি পাতা ভরিয়েছিল। এইসব দিনে সঞ্জয় গান্ধীর চরিত্র হননের কত না কাহিনী শোনা গেছে। অভিজাত পরিবারের কেউ যদি মন্দ হন তবে তাঁর চরিত্রের অনৈতিক কিছু ঘটনা যা নারীঘটিত হতে পারে, বা মদ্যপায়ীর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার আখ্যানবস্তু সঞ্জাতও হতে পারে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অর্ধশিক্ষিত মানুষকে এইসব কাহিনীতে স্তম্ভিত করে দিতে পারা যায়। এমনি কাহিনীও শোনা গেছে সঞ্জয় সম্পর্কে যে ব্যাক্তিটি মদ্যপ, পরনারীতে আসক্ত। অথচ যাঁরা কাছের মানুষ ছিলেন সঞ্জয়েব, তাঁরা বলেন তিনি দুধ ছাড়া জল ছাড়া, মদ তো দূরের কথা কোলাজাতীয় কিছু পান করেন নি জীবনে। ধূমপান কদাচ নয় এবং মেনকা গান্ধীকে বিবাহের আগে বা পরে অন্য কোনও মহিলার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল বলে কেউ জানান নি।

বলিষ্ঠ শরীর সুন্দর আকৃতির এই যুবকের চক্ষুতে শুদ্ধ দৃষ্টির আলোই ছড়াত। প্রায় সদাচারী সন্ন্যাসীর মত নির্লিপ্ত ছিল তাঁর মুখশ্রী।

সঞ্জয় গান্ধী কেবলমাত্র তাঁর মাকে সাহায্য করতেই জনজীবনে আসেন নি, শ্রীমতী গান্ধী স্পষ্টতঃ ৯ই ফেব্রুয়ারীর ১৯৭৭এ এক শ্রমিক নেতার প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেনঃ 'আমি সাধারণতঃ আমার পরিবারের কারও বিষয়ে কিছু বলিনি।' কংগ্রেস সভাপতি নিজে সঞ্জয়কে যুব কংগ্রেসের মধ্যে আরও বেশী প্রাণশক্তি দিতে

বলেছিলেন। সঞ্জয় তাই করেছে। সে এসেছে কংগ্রেসকে সাহায্য করতে। এর উপর ভিত্তি করেই ভারত ও বিদেশের পত্রিকাগুলি গল্প ফেঁদেছে যে সঞ্জয় প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে, কিন্তু শুধু লোকের কথাতেই তো সে নেতা হয়ে থেকে যেতে পারে না।

সঞ্জয় কিন্তু অতি নির্ভীক দুর্জয় যুবশক্তির প্রতীক হয়েই বেঁচেছিলেন। ঈশ্বরের অনির্দিষ্ট বিধানে হঠাৎ তাঁর বিমান দুর্ঘটনায় ২৩শে জুন, ১৯৮০ মৃত্যু হল।

যদিও ইন্দিরার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি অনেকাংশেই ভিত্তিহীন ছিল তবুও তাঁর কঠিন শাস্তিবিধানের জন্যে প্রতিহিংসার একটা প্রচ্ছন্ন আবহাওয়াই ছিল সরকারী মন্ত্রালয়ের নিগূঢ় ভাবনা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং অন্ততঃ এমন ভাবনার শিকার হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীকে তিহার জেলে বন্দী করে রাখবেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে দাগী জঘন্য অপরাধী কয়েদী নারী-কুলের সঙ্গে একত্রে শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবেন।

আমেরিকার সাপ্তাহিক 'নিউজ উইক' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে ১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বরে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, 'ভারতের নতুন দেশাই সরকার শীঘ্রই তাঁকে গ্রেফতার করবেন বলে তাঁর মনে হয়। সরকার আমাকে ভয় পায়, সরকার তদন্ত করছেন বলেই আমার উপর সর্বদা নজর রাখা হচ্ছে। আমার নামে চিঠিপত্র প্রায় আসে না বললেই চলে। আমি বিদেশে বক্তৃতা দিতে যাওয়ার জন্যে পাশপোর্ট পাবারও অধিকারী নই।'

ওই দেশের 'টাইম' সাপ্তাহিক পত্রের অন্য একটি সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন—'এই সরকারের কোন লক্ষ্যই নেই, পীড়ন-নীতিই চালিয়ে চলেছেন এই সরকার। জরুরী অবস্থার সময় এই পীড়নের বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযোগ করেছিলেন। সেই সময় ধরপাকড়, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ যা ঘটেছিল এখনও তাই ঘটছে। কেবল এখনকার এই সবের পিছনে আইনগত কোন সমর্থন নেই।'

শ্রীমতী গান্ধী ভেঙে পড়েন নি, ক্রমাগত তিনি শক্তি সঞ্চয় করছিলেন, দরিদ্র্য-লাঞ্ছিত জনগণের পাশে অবিরত তিনি ছুটে যাচ্ছিলেন।

১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বর। ইন্দিরা হরিদ্বারে এবং বাহাদুরাবাদে এসেছেন, সভা করছেন। উদাত্ত কণ্ঠে ভাষণ দিচ্ছেন, সৌম্য, দৃপ্ত তাঁর মুখশ্রী, সরকারী দপ্তরের হাড়ভাঙা খাটুনীর কোন কালিমা নেই তাঁর চোখের কোলে। তিনি বলছেন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগ্রামে নামতে হবে, সে সংগ্রাম যদি রক্তক্ষয়ী হয় তবে তাই হোক। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে প্রচুর রক্ত ঝরেছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যেও রক্তপাত ঘটতে পারে। হরিজনদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আপনাদের প্রতি সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।' এমনি জনসভায় শ্রীমতী গান্ধী হরিজনদের উপর যে-সব অত্যাচার চলছিল তার বিশদ বিবরণ দেন। সরকারী প্রকল্পগুলি কেমন বানচাল হয়ে যাচ্ছে, সেই সব সমস্যার কথা দেশবাসীকে জানান। জনতা সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলিই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। তিনি বলেন, এর জন্যে জনগণকে কঠোর সংগ্রামে নামতে হবে। তিনি জানান কংগ্রেসের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার জন্যে জনতা সরকার কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানানো দোষারোপে মামলা দায়ের করছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার সরকারও ভুল করেছিল, তবে ভুলভ্রান্তির মধ্যে দেশ তো বহুদূর সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছিল। দারিদ্র্য দূরীকরণও সফল হচ্ছিল।'

জরুরী অবস্থাকালে যে সব বাড়াবাড়ি হয়েছিল তা বিস্তারিত তদন্ত করার জন্যে ১৯৭৭-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর বিচারপতি শাহর কমিশনের শুনানী শুরু হয়েছিল। কমিশনের অধিবেশন দফায় দফায় চলেছে, কমিশনে কয়েক হাজার অভিযোগ পেশ করা হয়েছিল। শাহ কমিশনের শুনানীর প্রথম দিনেই ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভার তিন প্রাক্তনমন্ত্রী টি. এ. পাই, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও

গোখেল কমিশনের সামনে যে সাক্ষ্য পেশ করলেন তার সারমর্ম হলো শ্রীমতী গান্ধীর নির্দেশে তাঁরা কাজ করেছেন। আইন দপ্তরের মন্ত্রী গোখলে জানালেন বোম্বাই হাইকোরটের বিচারপতি ইউ. আর. ললিত এবং দিললি হাইকোরটের বিচারপতি আর. এন. আগর-ওয়ালকে পাকাপাকিভাবে যে নিযুক্ত করা হয়নি তা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই হয়েছিল।

টি. এ. পাইও বললেন শ্রীমতী গান্ধীর নির্দেশেই চারজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা শুরু করেছিলেন, মারুতি ব্যাপারে এঁরা সংসদে তোলা প্রশ্নের তথ্য সংগ্রহের কাজ করছিলেন তাই তাঁদের বিরুদ্ধে সি. বি. আই. তদন্ত।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে বিচারপতি শাহ প্রশ্ন করেন প্রজেক্ট অ্যাণ্ড ইকুইপমেণ্ট করপোরেশনের পি. এস. ভাটনগরকে সাসপেণ্ড করার ব্যাপারে তিনি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিনা। উত্তরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন তাঁর সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর মনোমতই হয়েছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, জগজীবনরামবাবুও শাহ কমিশনকে তাঁর সাক্ষ্যে এমনি জবাব দিয়েছিলেন; প্রধানমন্ত্রী পুলিশ গোয়েন্দাদের তথ্যের উপর নির্ভর করেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার প্রয়োজনই ছিল না। শ্রীমতী গান্ধী আতঙ্ক রোগে ভুগছিলেন।

এইসব সাক্ষ্য এই কথায়ই প্রমাণ করে যে, শ্রীমতী গান্ধী এমনি বিশ্বস্ত সহকর্মীদের উপর নির্ভর করেছিলেন যাঁরা তাঁদের দায়িত্ব বিষয়েও ওয়াকিবহাল ছিলেন না। এবং হাওয়া বুঝে তাঁরা নিজেদের মতামতের পাল তুলতেন বা নৌকা ভাসাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

শারদ প্রাতে সেদিনটা ছিল সোমবার, সাতাত্তর সালের ৩রা অক্টোবর। তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং প্রশাসনের কাজটা অনেকটা বুঝেসুঝে নিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী যে বলতেন জনতা সরকার তাঁকে ভয় করেন, এবং তাঁকে তাঁরা জেলে পাঠাবেনই

সেটা বড় বেশী বলা হয়ে গিয়েছিল কি? চরণ সিং যখন সি. বি. আই. এবং পুলিশ পাঠিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর উইলিংডন ক্রেসেন্টের বাড়ীতে তাঁকে গ্রেফতার করার জন্যে সেই ২রা অক্টোবরে তখন ইন্দিরার কথাকেই বড় করে ধরেছিলেন। ইন্দিরাকে যে সব অভিযোগে দোষী করা হয়েছিল তা কেমন অভিযোগ, কী সব অভিযোগ, প্রমাণ কিছু কি হয়েছিল তার? অভিযোগ ছিল এই যে শ্রীমতী গান্ধী দুটি মামলায় জড়িত। দুর্নীতি নিরোধ আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধি মোতাবেক তাঁকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। কিন্তু এই গ্রেফতারীর কোনও আইনগত প্রস্তুতি ছিল না।

ইন্দিরার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এই যে, কয়েকজন শিল্পপতি ৪০ লক্ষ টাকার জীপ, মাহীন্দ্র অ্যাণ্ড মাহীন্দ্র কোম্পানী থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কিনে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে সরবরাহ করেছিলেন। এই জীপগুলি প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে সরবরাহ করা হয়েছিল। কংগ্রেস এই জীপগুলির দাম দেন নি।

দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল বোম্বাই সমুদ্রে তৈল সন্ধানের কাজে ইন্দিরা সরকারের পেট্রোলিয়াম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সচিব একটি ফরাসী কোম্পানীকে ১৭.৪ মিলিয়ন ডলারের ঠিকা দিয়েছেন। অথচ এই কাজ করার জন্যে মাত্র ৪০ লক্ষ ডলারের ঠিকার আবেদন ছিল। বিপুল পরিমাণে বিদেশী মুদ্রার অপচয় হয়েছে তবুও এক অসঙ্গত কারণে।

বিপুল সংখ্যক পুলিশবাহিনী শ্রীমতী গান্ধীর বাসভবনে এসেছেন সেদিন, বাইরে রাস্তায় তাঁরা অনেক সংখ্যক প্রহরায় নিযুক্ত। নির্বাধ যেন হয় এই গ্রেফতার।

কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর একজন প্রবীণ অফিসার শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আপনাকে গ্রেফতার করা হল। আপনি অবশ্যই এক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নেবেন।

শ্রীমতী গান্ধীর বিপুল সংখ্যক সমর্থকরা সেখানে কেউ উপস্থিত হন নি। এই গ্রেফতারের খবরটা সাংবাদিকদের কাছেও পৌঁছুতে

বেশ সময় লেগেছিল। পরে অবশ্য সাংবাদিকরা খবর পেয়ে ছুটে গেছেন।

ইতিমধ্যে ইন্দিরাকে দেখা গেল, পুলিশ অফিসারকে প্রশ্ন করেছেন : 'কই আপনার গ্রেপ্তারী পরোয়ানার কাগজপত্তর দেখান' ?

পুলিশ অফিসারকে কিন্তু এই গ্রেপ্তারী আদেশের দলিল সংগ্রহ করতে মুস্কিলে পড়তে হলো। সময় কাটল কিছু, বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর নিত্যব্যবহার্য টুকিটাকি গুছিয়ে তাঁর একান্ত সচিব উষা ভগতের সঙ্গে আবার বৈঠকখানায় নেমে এলেন। এসে হাত দুটি বাড়িয়ে বললেন—'আমাকে হাত কড়া লাগান, লাগান, আমি প্রস্তুত'।

পুলিশ অফিসাররা খুবই বিচলিত হলেন। তাঁরা এমন অধম নন যে শ্রীমতী গান্ধীর হাতে শিকল বাঁধবেন। শ্রীমতী গান্ধীও নাছোড়। অতঃপর তিনি বুঝলেন বেচারী পুলিশ সরকারী নির্দেশেই কাজ করছেন। তাদের উপর এই কাজের বোঝাটা চাপান ঠিক হচ্ছে না। তিনি পুলিশ অফিসারদের গাড়ীতে উঠলেন। পুলিশের গাড়ীতে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারী কুমারী দেশপাণ্ডেকে যেতে দেওয়া হয়েছিল।

হরিয়ানার সীমানা থেকে কয়েক মাইল দূরে যখন গাড়ী এল তখন সঞ্জয়ের গাড়ী পুলিশের গাড়ীর আগে বেঁকে থেমে গেল। সঞ্জয় পরিবারের উকিল কিছু ব্যক্তির সঙ্গে পুলিশের কিছু বাদানুবাদ হতে গাড়ী ফিরে চলল দিল্লীতে। শ্রীমতী গান্ধীকে এই সময়ে শান্ত অনুদ্বিগ্ন দেখা গেছে। এই বাদানুবাদে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না। তিনি বুঝি শারদ আকাশের দিনান্তের সোনা মাখা আলো দেখছিলেন। হয়তো বা ভাবছিলেন তাঁর উইলিংডন ক্রেসেণ্টের গৃহে নাতি-নাতনীরা হয়তো কেঁদে কেটে ঘুমিয়ে পড়েছে !

সেই রাত কাটল তাঁর থানায়। পরের দিন তিশ-হাজারী কোর্টে তাঁকে হাজির করা হলো। ভীড়, ভীড়াক্রান্ত কাছারী বাড়ী। পুলিশের

কঠিন বেড়া ভেঙে এসেছেন ইন্দিরা সমর্থকেরা। হাতে কংগ্রেসের তিনরঙা পতাকা, ধ্বনি দিচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী দীর্ঘজীবি হোন, ইন্দিরা গান্ধী দেশনেত্রী। জনতা দলের সমর্থকও কম আসেন নি। তাঁরা চিৎকার করছেন। 'ইন্দিরা গান্ধী নিপাৎ যাক, নিপাৎ যাক!'

শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগগুলি যখন সরকারী উকিল নথিবদ্ধভাবে উপস্থিত করতে পারলেন না, এবং বললেন এই অভিযোগগুলি প্রমাণসাপেক্ষ করতে কিছু সময় লাগবে তখন তিশ-হাজারী কোর্টের বিচারক অভিযুক্ত ইন্দিরাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেবার আদেশ দিলেন। ফিরে এলেন ইন্দিরা নিজগৃহে। তিনি যে অহেতুক সরকারী নির্যাতনের লক্ষ্য হয়েছিলেন, তাঁকে অকস্মাৎ আটক করার এই ঘটনাটি জনতা সরকারের মূঢ়তাকেই জনসমক্ষে সুস্পষ্ট করে তুলেছিল।

শাহ কমিশনেও জরুরী অবস্থায় কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিতে ইন্দিরা অস্বীকার করেছিলেন। তাঁকে সমন পাঠানো হয়েছিল। তিনি অতঃপর শাহ কমিশনের এজলাশে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত হলেও সাক্ষ্য দিলেন না। তাঁর কৌঁসুলী ফ্রাঙ্ক এণ্টনি বললেন, যখন সমন জারী করা হয়েছে তার মানে এই দাঁড়ায় যে, শ্রীমতী গান্ধী কারও অভিযুক্ত। সুতরাং তিনি প্রথমে সাক্ষ্য দেবেন না। প্রথমে বিরোধী সাক্ষীদের জেরার ব্যাপার, তারপরে এবং মধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর সাক্ষ্য এবং বিবৃতি।

সরকারের কৌঁসুলী এ-কথার প্রতিবাদ করলেন, বলা হলো এই কমিশন ফৌজদারী কার্যবিধি ও সাক্ষ্য আইনের আওতায় আসে না। কমিশনের আইন মোতাবেক ইন্দিরাকে সাক্ষ্য ও জেরার জবাব দিতেই হবে। সরকারী কৌঁসুলী আরও বললেন, এখানে কোন অপরাধীর নাম করা হয়নি। তাঁর সারাজীবনে এমন কোন ফৌজদারী মামলার কথা তো তিনি শোনেন নি, যেখানে অপরাধীর নাম থাকে না।

ফ্রাঙ্ক এণ্টনি উত্তরে শাহকে জানালেন, ধর্মাবতার নাম না করলেও সমস্ত তদন্ত কমিশনইতো হচ্ছে ঐ মহিলাকে খতম করবার জন্যে।

শাহ কমিশনে ইন্দিরা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৭৯ ধারা অনুযায়ী আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল।

বিচারপতি শাহ শ্রীমতী গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কি কিছু বিবৃতিতে বলবেন। শ্রীমতী গান্ধী উত্তরে বলেছেন আইনগতভাবে তিনি কিছু বলতে বাধ্য নন। বিচারপতির অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি যে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়েছেন সেটাই তাঁর সরকারের ভিতরের কাজ-কর্মের কথা প্রকাশ্যে বলতে তাঁর পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শাহ কমিশনে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় ইন্দিরা এবং তাঁর অন্য এক মন্ত্রীকে ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারীর ২৬ তারিখে দিল্লীর ম্যাজিস্ট্রেট জৈনের আদালতে সোপর্দ করা হলে তাঁরা দুজনেই আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং দু'হাজার টাকার জামিন বনডে বিচার চলা কালীন ব্যক্তিগত হাজিরা থেকেও অব্যাহতি পেলেন। কিন্তু সঞ্জয় যখন 'কিসসা কুর্শীকা' মামলায় জড়িত হয়েছিলেন তখন তাঁর কিন্তু ছাড় হয়নি। এই কিসসার অভিযোগ হল সঞ্জয় 'কিসসা কুর্শীকা' নামক ফিল্মটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ভি. সি. শুক্লার সহযোগে মারুতি কারখানায় নিয়ে এসে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। মামলায় যাঁরা সরকারী পক্ষে এই অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত ছিলেন তাঁরা কার্যতঃ তাঁদের সাক্ষ্য বিবৃতি দিতে পরে অস্বীকার করছিলেন।

তখন শাহ কমিশনে এটাই ব্যক্ত হলো যে সঞ্জয় সাক্ষী ভাঙিয়ে নিচ্ছেন। ফলতঃ ১৯৭৮-এর মে মাসে সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করে তিহার জেলে একমাস বন্দী করে রাখা হলো।

জেলে তাঁকে তখন তাঁর শ্রেণীর বন্দীকে যে সুবিধাটুকু দেওয়া হত তাই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু লোকসভায় তুমুল কোলাহল হলো

কেন তাঁকে পাখা দেওয়া হল, কেন তাঁর ঘরে টেলিভিশন? বস্তুতঃ সঞ্জয়কে একজন পুলিশ অফিসারের গৃহেই রাখা হয়েছিল। তাই এই টেলিভিশন বস্তুটি সেখানে রাখা ছিল। প্রতিবাদ হওয়াতে এইসব উপকরণটুকুর সুবিধা সঞ্জয়ের ঘর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

সঞ্জয়কে তিহার জেলে আটক করে রাখলেও ইন্দিরাকে কোন-মতেই জেলে পাঠানো সম্ভব হচ্ছিল না।

ইতিমধ্যেই শ্রীমতী গান্ধী সমস্ত প্রতিরোধকে ব্যর্থ করে পুরোপুরি রাজনীতিতে সমর্থাসমর্থ নেত্রীর ভূমিকায় বহুদূর পরিভ্রমণ সমাধা করেছেন। দক্ষিণ ভারতে চিকমাগালুরে লোকসভা নির্বাচনে তিনি নিজের দলের প্রার্থী হিসেবে নিজেই নেমেছেন প্রচার কার্যে। বিরোধী প্রার্থী ছিলেন জনতা দলের বীরেন্দ্র পাতিল। ইন্দিরার বিরুদ্ধে প্রচার কাজে নেমেছিলেন জনতা দলের সমাজবাদী মন্ত্রী ফার্নাণ্ডেজ এবং জগজীবন রাম, এবং বহুগুণা। ফার্নাণ্ডেজ ছাড়া অন্য ছুই নেতা ইন্দিরার মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী ছিলেন। দেবরাজ আর্স, তখনও তিনি ইন্দিরার কাছের মানুষ, তিনি ছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এবং ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে তখনও তিনি বেরিয়ে আসেন নি। ইন্দিরার বিরুদ্ধে জনতা দলের বিরাট প্রচারযন্ত্র কাজ করছিল। জনতা সরকারের মন্ত্রীদের মন্ত্রণার অন্ত ছিল না, যেমন করে হোক ইন্দিরার পরাজয় ঘটাতেই হবে। অভিযোগ সরব হলো নির্বাচনের বিধি ভঙ্গ করেছেন ইন্দিরা, তিনি চিকমাগালুর বা ঐ নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী হলেন কেমন করে? কর্ণাটকে দোদাবল্লপুরে নির্বাচনসূচীতে তিনি নাম লিখিয়েছিলেন, অথচ নতুন দিল্লীর ঠিকানায়ও ঐ নির্বাচন এলাকায়ও তাঁর নাম ছিল। এটা বাতিল করেন নি তো শ্রীমতী গান্ধী!

জগজীবনবাবু নির্বাচন প্রচারে বললেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরাকে এই নির্বাচনে জিততে দিলে যাঁরা তাঁকে ভোট দেবেন তাঁরাই প্রতারিত হবেন। এই মহিলা মিথ্যা বাক্য কথনে এবং মিথ্যা স্তোকবাক্য উচ্চারণে কখনও কাতর হন না। তিনি তো বলে

এসেছেন ক্ষমতায় ফিরে আসতে তিনি আর নির্বাচনে নিজে প্রার্থী হবেন না। তবে কেন তিনি লোকসভায় সদস্য হতে চাইছেন?

এমনি চোখা চোখা যুক্তির বান ডাকল। অত্যয়কালে দক্ষিণ দেশের মানুষের উপর যে পুলিশী নির্যাতন হয়েছিল তার মূক স্মারক প্রদর্শনী হলো, মেয়েদের দেখা গেল ইন্দিরার সভায় হাজির হচ্ছেন মৌন মিছিলে। এবং অন্যান্য সদাসদ উপায়, যা আমাদের দেশের নির্বাচনকালে যে কোনও দলই কিছু না কিছু করে থাকেন এবং অন্য দলকে এই অবৈধ পন্থার পথিক বলে নির্বাচকদের অবিরত বলা হয়ে থাকে এখানেও তেমনি হলো। বলা হলো ইন্দিরাকে একটি ভোটও না। বিরোধীদের সমস্ত প্রচেষ্টা তবুও ব্যর্থ হয়ে গেল। ইন্দিরা বিপুল ভোটে বিজয়িনী হলেন লোকসভার সদস্যরূপে। দেখা গেল দেশের মানুষ ইন্দিরার নেতৃত্বকে ফিরে পেতে বহুতর আকাঙ্ক্ষা রেখেছেন।

এতো হলো অক্টোবরের ঘটনা। লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে ইন্দিরা আর একজন সাধারণ নাগরিকই মাত্র নন যিনি পরাভবের গ্লানিতে ভুগছিলেন, যিনি জনতা সরকারের দোষ-ক্রুটির কথা ক্রমান্বয়ে দেশবাসীর সমক্ষে তুলে ধরছিলেন। কি আর তার মূল্য, হতে পারেন তিনি ভারতরাষ্ট্রের একাদশ বৎসর কালের প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু দেশে তাঁর শাসনকালে যতখানি মন্দ হয়েছে তার জন্যে তাঁকে গাল মন্দ বলতেই বিরোধী দলগুলি প্রমাণ তথ্য খুঁজছিলেন এবং স্বার্থান্ধ পত্র-পত্রিকাগুলিও তারই প্রচারে ব্যস্ত ছিল। জনতা সরকার বলছিলেন ভাল কিছুই ইন্দিরা দেশের জন্যে করেন নি। এবং মন্দ যা কিছু হয়েছে তার জন্যে তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে।

ইন্দিরা এই সুবিপুল দেশের রাষ্ট্রশাসনের প্রধানা পরিচালিকা হিসাবে ভালও অনেক কিছু করেছেন নিশ্চয়ই। তিনি যখন লোকসভায় একজন সরকার বিরোধী দলের প্রবক্তা হলেন, তাঁর বক্তৃতায় জনতার প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণের কথা অতি রূঢ়ভাবেই বলতে

লাগলেন। এখন আর ময়দানের জনসভায় বা সাংবাদিকদের কাছেই শুধু বলা নয় যে দেশে বেকারী কমেনি। জনতা সরকার বলেছিলেন বেকারী কমবে, বলেছিলেন তাঁরা এর জন্যে উপায়ও করবেন। তা তাঁরা কিছু করেন নি। হরিজনদের উপরে অত্যাচার কিছুমাত্র বন্ধ হয়নি; সাম্প্রদায়িক অশান্তিও ক্রমাগত ধূমায়িত হচ্ছিল। জনতা সরকারের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদী মহিলা এখন লোকসভায় খুব উঁচু গলায় এ সব যখন বলবেন তা বিধিমত সরকারের নিন্দাবাদই হবে! তথ্যগতভাবে সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী কাজগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেই এলেন ইন্দিরা। পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছিল। খুব মুস্কিলে পড়লেন সরকারে আসীন নেতারা।

ইতিপূর্বেই ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে লোকসভায় অভিযোগ উঠেছিল যে প্রধানমন্ত্রীত্ব থাকা কালীন ইন্দিরা কর্মরত সরকারী অফিসারদের মারুতি সংক্রান্ত লোকসভার সদস্যের প্রশ্নের তথ্য সংগ্রহে বাধা দিয়েছিলেন এবং এই সরকারী অফিসারদের অপদস্থ করে তিনি লোকসভার মর্যাদাকে হেয় করেছেন। সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্যে লোকসভার মর্যাদা ভঙ্গ হয়েছিল কিনা তার জন্যে অধিকার রক্ষার কমিটিও বসেছিল। অধিকার ভঙ্গের অভিযোগে এক্ষণে তাঁরা রায় দিলেন ইন্দিরা লোকসভার অপমর্যাদা ঘটিয়েছিলেন, সুতরাং ১৯শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী দেশাই প্রস্তাব করলেন ইন্দিরাকে লোকসভার অধিবেশন চলা কালীন এক সপ্তাহের জন্যে বহিষ্কার করা হোক। তাঁকে এ কারণে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠাবারও শাস্তি বিধান করা হয়েছিল। লোকসভার সেদিনের অধিবেশন সাঙ্গ হলো। সে এক অভিনব দৃশ্য। ইন্দিরা তাঁর দল পরিবৃত হয়ে লোকসভায় অবস্থান করছেন। বলছেন এখান থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোক। সাংবাদিকদের তিনি তাঁর বক্তব্য বললেন।

জনতা দল সমস্ত প্রশাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েও তাঁর মত একজন দুর্বল প্রতিপক্ষকে এভাবে যে পর্যুদস্ত করতে সময় ক্ষেপণ করছেন

সেটা তাঁদের যোগ্যতার খুব বড় পরিচয় ছিল না। যাহোক লোকসভায় পুলিশ এল ইন্দিরাকে বন্দী করবার সমন হাতে। ইন্দিরা তিহার জেলে চলে গেলেন। তিনি বলতেন আমাকে যদি বন্দী করা হয় তা হলে তাঁর দলের ভালই হবে। দুঃখ করবার কোন হেতুই নেই। অর্থাৎ ওরা যত আঘাত করবে সেটা ওদের গায়েই ফিরে লাগবে।

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৭-এ প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই মাদ্রাজে রিপোর্টার্স গিলডে বলেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী যদি তাঁর বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করতেন তাহলে তিনি তাঁকে ক্ষমা করতেন, কিন্তু তিনি যদি সমাজ ও জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ করেন তবে তাঁকে ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বলেন তাঁকে ক্ষমা করার আমার কি অধিকার আছে? এরূপ মহানুভব উক্তি সত্ত্বেও দেশাই তাঁকে জেলে পাঠাতে ত্রুটি করলেন না।

অন্যান্য জনতা গোষ্ঠীর নেতাদের মধ্যে ইন্দিরাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে সর্বাপেক্ষা সোচ্চার ছিলেন রাজনারায়ণ। সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সাল। তিনি এই সময়ে বলেছিলেন—ইন্দিরা এখন বেশ বুঝতে পেরেছেন যে স্বকৃত পাপ বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে এবং তিনি গ্রেপ্তার হতে চলেছেন। তিনি গ্রেপ্তার হলে কংগ্রেসের পক্ষে তা শুভ হবে বলে শ্রীমতী গান্ধী যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বলেন—ইন্দিরার এটা মনে রাখা উচিত যে একমাত্র যোগ্য কোন কারণে গ্রেপ্তার হলেই ধৃত ব্যক্তির পক্ষে তা সম্মানজনক হয়, কিন্তু অর্থ আত্মসাত প্রভৃতি অপরাধে তা হতে পারে না। অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও ইন্দিরার বিরুদ্ধে বেশ সোচ্চার ছিল। অর্থ আত্মসাতের অপবাদ একমাত্র রাজনারায়ণের মত চরিত্রের ব্যক্তিই ইন্দিরার নামে রটাতে পারেন, কেন না পরবর্তী কালে যখন জনতা সরকার অন্তর্দ্বন্দ্বে ভেঙে টুকরো হয়ে যাচ্ছিল, যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী দেশাই কর্তৃক জনতা মন্ত্রিসভা থেকে চরণ সিং সহ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তখন তাঁর ক্ষমতায় আসার

অত্যল্পকালের কৃতকর্মের ফল বুমেরাং হয়ে তাঁকেই আঘাত করেছিল। তিনি পরে দেশাই শাসিত জনতা সরকারের পতন ঘটাতে কংগ্রেস (আই) নেত্রী ইন্দিরার সাহায্য প্রার্থনা করতে একটুও দ্বিধা করেন নি। সে সব অনেক কাহিনী, সে সব প্রসঙ্গ বিস্তৃত আলোচনায় কিছু লাভ নেই। আমরা দেখছি কেবলই সাতাত্তরের দেশের রাজনীতির সালতামামীতে ইন্দিরার বিচারের দাবীর নানাবিধ খবরের অন্ত ছিল না। পশ্চিমবাংলার বিধানসভায়ও ইন্দিরা গান্ধীর বিচার ত্বরান্বিত করার দাবী জানিয়ে একটি বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

যাহোক ১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বর গড়িয়ে ডিসেম্বর ১৯৭৮-ও শেষ হতে চলেছে। নানা কমিশন। আদালতে ইন্দিরার বিচার কিছুই প্রমাণ করছিল না। দিল্লীর যমুনায় কোন বানও ডাকল না, স্থির নিষ্কম্প স্রোতধারা একটুও বাঁকা পথ নেয়নি। পাহাড় প্রমাণ অভিযোগ ইন্দিরার বিরুদ্ধে। তথাপি শ্রীমতী গান্ধী অবিচল। ইন্দিরা ডিসেম্বর ২৬, ১৯৭৮-এর তিহার জেল থেকে মুক্তি পেলেন। এক সপ্তাহ কারাগার বাসের পর বেরিয়ে এলেন তিনি। কেমন লাগল এই কারাভোগ? চমৎকার, চমৎকার!

আত্মদর্শনের এমন সাতটি দিন, নিজের অন্তর্লোকে একান্ত পরিভ্রমণের সুযোগ দেশনেত্রী ইন্দিরা তাঁর এই ষষ্ঠীতম জীবনের আয়ুতে সেই বাল্যকাল থেকেই তো খুইয়ে বসেছেন। দেশের যখন গভীরতর অসুখ, দারিদ্র্যে, মানুষের লাঞ্ছনায়, অশিক্ষায়, বেকারীতে, প্রশাসনে দুর্নীতি ও অব্যবস্থায়, প্রাদেশিক, প্রান্তিক ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায়, তখন শ্রীমতী গান্ধী একাদশ বৎসরকাল এই সমস্যার গভীর থেকে একটুও মুখ ফেরাতে পারেন নি। এইতো ছিল প্রধানমন্ত্রিত্বের বেতন, চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি এমনি চাকুরী করেছেন যার শর্ত ছিল এই দীনদুঃখী দেশের শর্তহীন সেবা, সেবা বৈ অন্য কিছু না। নিজে তিনি প্রধানমন্ত্রীর মুকুট পরেছেন, কত সুখ এই হতভাগ্য প্রশাসনের দায়িত্বভার বইবার, এই কণ্টকমুকুটের

নিচে ব্যক্তিগত সুখস্বপ্ন কতখানি তা ইন্দিরা ছাড়া আর কেই-বা জানবে। অথচ যখন তিনি এই শাসনদপ্তর থেকে অপসারিত হলেন তখন সারা দেশে তাঁর চরিত্র হননের কত আকাশ কুসুম গল্প লেখা হচ্ছিল। জনতা সরকারের বিজয়ে প্রসাদিত হলেন, স্ফীত হলেন, ফলে কোন কোন সাংবাদিক ইন্দিরার ঘরের কথার অন্তরঙ্গ জ্ঞানে, লিখলেন ইন্দিরা সরকারের নানা অপকর্মের কর্মকাণ্ড ফেনিয়ে, ইন্দিরার চরিত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত তমিস্রা তা কেটে ছিঁড়ে পাতার পর পাতা মহাভারত লিখে ফেললেন। কেচ্ছা পাঠের একটা বড় বাজার আমাদের দেশের বইপড়া মানুষদের মধ্যে বেশ গজিয়ে উঠেছিল। সেখান থেকে এইসব কেচ্ছাকাহিনীর আয় মন্দ হলো না। আয়কর থেকে এই আয় কত রেহাই পেল তার খোঁজখবর দিয়ে পাঠকরা কৌতূহলী হন নি, ইন্দিরা কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশা চরিত্রের মানুষ তাই ভেবে নিন্দা কাহিনীর পাঠকেরা বিস্মিত ও আতঙ্কিত হলেন।

ইতিমধ্যে মোরারজীর প্রধানমন্ত্রিত্বের ৮৪৩ দিন কেটে গেল। ১৯৭৭ সালের ২৪শে মার্চ মোরারজী প্রধানমন্ত্রী হন এবং ৮৪৩ দিন পরে ১৬ই জুন ১৯৭৯ সালে তাঁকে প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্বভার ত্যাগ করতে হলো।

চরণ সিং এর আগেই জনতা দল ভেঙে নতুন দল গঠন করছিলেন। মোরারজীর বয়েস হয়েছিল। তিনি বলতেন তাঁর কোন শত্রু নেই। কিন্তু তিনি যে অজাতশত্রু ছিলেন না তা জনতা দলের জন্মলগ্ন কাল থেকেই জানা গিয়েছিল। জনতা দলের একজন নেতা এবং জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক রামধন মোরারজীকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছিলেন। ২৯শে এপ্রিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং দলের কার্যনির্বাহক কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। ৫ই জুন রাজনারায়ণ দলের নতুন কার্যনির্বাহক কমিটির দাবী করেন। ইতিপূর্বেই ২৯শে জুন প্রধানমন্ত্রী দেশাই, চরণ সিং এবং রাজনারায়ণকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে বলেন। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই

যে তাঁদের কার্যক্রম বক্তব্য এবং আচরণ দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী; তাতে যৌথ দায়িত্ব ভঙ্গ হয়েছে। ৩০শে জুন চরণ সিং, রাজনারায়ণ অন্য চারজন মন্ত্রী, মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ২০শে আগষ্ট দলের সাধারণ সম্পাদক মধু লিমায়ে জনতা পার্টির সঙ্গে আর. এস. এস-এর সম্পর্কের প্রশ্ন তোলেন। দল যে ভেঙে যাচ্ছিল, শ্রীমতী গান্ধীর ভবিষ্যৎবাণীকেই তা স্পষ্ট করেছিল। তিনি বলতেন জনতা পার্টি খিচুড়ীমত একটা, পাঁচটি ভিন্নমতাবলম্বী রাজনৈতিক দল নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই দল তাই ভাঙছিল। রাজনারায়ণ দল থেকে বহিষ্কৃত হলে লোকসভায় একটি বিরোধী দল গড়ে তোলেন। চরণ সিং এই দলের নেতৃত্ব দেন।

দেখা গেল—দেশাই অজাতশত্রু ছিলেন না। তাঁর পুত্র কান্তি-ভাইকে নিয়ে তাঁকে কঠোর সমালোচনা শুনতে হয়েছে।—আমার বয়েস ৮১, আমার পুত্র আমাকে সাহায্য করে তাতে কি দোষ? সাংবাদিকদের ১৯৭৭-এর জুলাই মাসে তিনি বলেছেন, 'আপনারা কি ভাবেন আমার ছেলের সঙ্গে সঞ্জয়ের তুলনা হতে পারে? দেশাই বরিষ্ঠ নেতা বলে এবং সদাচারী ভাবনায় বেশ গর্বিত ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ পিতার মত বড় একপেশে একলা হয়ে পড়ছিলেন তিনি।

এইসব ঘটনাপ্রবাহ দেশাইয়ের মন্ত্রিসভার পতন ঘটাল। জনতা দলের একতা ছিল না, ছিল না রাজনৈতিক সততা। সরকারী কার্যক্রম ও জনতার ঘোষিত নীতিকে একটুও শিকড় পেতে দেয় নি। দেশে বেকারী, দারিদ্র্য বেড়েছিল বৈ কমছিল না। নিত্য ব্যবহার্য জিনিস-পত্রের দুর্মূল্য হচ্ছিল। কেরোসিন, ডিজেল সহজলভ্য হচ্ছিল না।

২৮শে জুলাই চরণ সিং তাঁর দল জনতা (সেকুলার) এবং স্বর্ণ সিং-এর নেতৃত্বে জোটবাঁধা কংগ্রেস দলকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকাল ছিল খুবই স্বল্প। এই জোটেও অনেক অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল; লোকসভায় এঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও ছিল না। চরণ সিং-এর সরকার অনাস্থা প্রস্তাবে লোকসভায় পরাজিত হলেন।

২০শে আগষ্ট চরণ সিং সরকারের পতন হলে, চরণ সিং রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভেঙে দিয়ে অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনের পরামর্শ দিলেন।

১৯৮০তে দেশে নির্বাচন হবে বলে ঘোষিত হলো। অতঃপর নির্বাচনের দিন এগিয়ে এল। কংগ্রেসের দুটি দল, একটি শ্রীমতী গান্ধী অন্যটি এককালীন ইন্দিরার কাছের মানুষ দেবরাজ আরস পরিচালনা করছিলেন।

রাজধানীতে শীত। শীত, তবুও মিছিলে দেওয়ালে এই নির্বাচনের উত্তাপ জেগে উঠছিল। দুই কংগ্রেস দুই শিবিরে, অর্গানিজেশন কংগ্রেসের অনেকেই এসেছেন আরস কংগ্রেসে, এবং আরসের কাছের মানুষ যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই এসেছেন ইন্দিরা শিবিরে।

বাবু জগজীবনরাম জনতা দলের হাল ধরেছেন। লোক দলের চরণ সিং, উত্তর ভারতের অন্য এক নেতা ছাড়া কম্যুনিষ্ট দলগুলি, আকালী, অন্য প্রান্তীয় সব ক'টি দল ইন্দিরার প্রবল প্রতিপক্ষ।

ইন্দিরা তাঁর পুরনো নির্বাচনকেন্দ্র রাইবেরিলীতে নির্বাচন প্রার্থী। গোয়ালিয়রের রাজমাতা তাঁর প্রতিপক্ষ। এই রাজমাতা অত্যয়কালে তিহার জেলে বন্দী হয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধীকে নির্বাচনে হারাবার জন্যে তিনি আপ্রাণ প্রচেষ্টা করলেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীকে হারানো গেল না।

প্রবল প্রচার যেমনটি হয়ে থাকে নির্বাচনে তাই হচ্ছিল, দেশ-জোড়া গবেষণা শ্রীমতী গান্ধী এবং তাঁর দল কি জিতবেন, জিতলেও কি লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন? কেউ বললেন তাঁর দল লোকসভায় মোটেই বেশী আসন পাবেন বলে অনুমান করা যাচ্ছে না। কিন্তু সমস্ত জল্পনা কল্পনা ও অনুমানকে ব্যর্থ করে শ্রীমতী গান্ধী এই নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করলেন। ৩রা জানুয়ারী ১৯৮০। ১৮টি রাজ্য ও ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে লোকসভার ভোট গৃহীত হলো। ৯ই জানুয়ারী জানা গেল ইন্দিরা কংগ্রেস লোকসভায় দুই তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছে।

বিস্মিত হলেন ইন্দিরা সমালোচকেরা তাঁর এই বিজয়লাভের কৃতিত্বে, ইন্দিরা বিরোধীরা স্তম্ভিত হলেন।

১৪ই জানুয়ারী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর দলের ২২জন মন্ত্রিসহ প্রধানমন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণ করেন।

তেত্রিশ মাস পরে দিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ কোণের লাল বাড়ীর প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরঘরে ফিরে এলেন ইন্দিরা।

'বনের দিকে আর আমরা যাব না, লরেল গাছ ওরা কেটে ফেলেছে।' একটি ফরাসী কবিতার পঙক্তি স্মরণে আসছে। ১৯৮০ সালের নির্বাচনে দেশের মানুষ এমনি বোধে জনতার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ইন্দিরার এই বিজয় যেমন সম্ভব হলো, যে দুর্গম পথ হেঁটে ইন্দিরা দেশ শাসনের নেতৃত্বকে নিজের হাতে ফিরিয়ে আনলেন তা যেমন তাঁর প্রতি দেশের অগণিত মানুষের ভালবাসা, বিশ্বাস, নির্ভরতার এক উজ্জ্বল উচ্চারণ অন্যপক্ষে ইন্দিরার দেশপ্রেম ও নির্ভীকতা আত্মবিশ্বাসের অত্যুজ্জ্বল কাহিনী। এই বিজয় যাত্রার পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না তা আমরা দেখেছি। অনেক বেনোজল উজিয়ে এসেছেন তিনি। যথেষ্ট কাঁটা ছিল তাঁর পথে, বহু কর্দমও। কত কাদা মাখামাখি হয়ে তাঁর তথাকথিত দুষ্কর্মের ইতিহাস লেখা হয়েছিল স্বদেশে। জনতা সরকার তাকে যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংলণ্ড পরিভ্রমণের ছাড়পত্র দিলেন, লণ্ডনেও যেমন তাঁর গুণগ্রাহী ভারতীয় জনতা তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন, বিরোধী দুর্মুখ দেশবাসীও 'ইন্দিরা ফিরে যাও' বলে ধ্বনি দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার যাতে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহারটুকুও না করেন তার জন্যে একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টাও হয়েছিল। তবুও ইন্দিরা সে দেশে জনতাদলের ভূমিকার কথা বিবৃত করেছেন, তিনি বলেছেন তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত তাঁর কংগ্রেসের বিরোধী ভূমিকার কথা। স্বদেশে বিদেশে পরাজিত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার নাম দূর দূরান্তরে তখনও ছড়িয়ে আছে।

দেশনায়ক জয়প্রকাশ যিনি জনতা দলের পিতৃপ্রতিম ছিলেন বা বৃদ্ধ নেতা জে. বি. কৃপালনী যাঁরা ইন্দিরার স্বৈরাচারী ভূমিকার

কথাই অবিরত বলে এসেছিলেন এবং 'ইন্দিরা হটাও' আন্দোলনে প্রধান পুরোহিত ছিলেন, ইন্দিরা তাঁদের ব্যক্তি হিসাবে কিছুমাত্র অসম্মান করেন নি। জয়প্রকাশকে যেমন কারাবন্দী করেছিলেন, তাঁর অস্বাস্থ্যের জন্য তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন, সুচিকিৎসার জন্যে সরাসরি মুক্তিও দিয়েছেন। তাঁর যখন মৃত্যু হলো গুজব সরব হলো ইন্দিরা তাঁকে জেলে পাঠিয়ে স্বাস্থ্য ভেঙে দিয়েছেন। জয়প্রকাশ বৃদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর অসুস্থতা বার্ধক্যের কারণেই হয়েছিল একথা তাঁর চিকিৎসকেরা জানতেন এবং ইন্দিরাও। তাই জয়প্রকাশের মৃত্যু হলে ইন্দিরাও গিয়েছিলেন পাটনায় তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা জানাতে। ইন্দিরার শত্রু ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে কিছু থেকেই থাকবেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ঘটনাও এদেশে বিরল নয়। ইন্দিরার মৃত্যু ঘটাবার কিছু বিক্ষিপ্ত চেষ্টা হয়েছে। ইন্দিরা এমন চেষ্টার কথা জনান্তিকে বলেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর দেশপ্রেমকে জীবনের থেকেও বড় বলে বোধ করেছেন। তাঁর রক্তে আছে তাঁর পিতার অদম্য দেশপ্রিয়তা এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যে নেহরুর আমৃত্যু সংগ্রামী সাধনা। রুগ্না মায়ের কোল ছাড়া ইন্দিরা ছিলেন আশৈশব একলা। বাড়ীতে কাছের মানুষ পিতামহ মতিলাল, পিতা জহরলাল, পিসি বিজয়লক্ষ্মী, এঁরা কেউ কিছুমাত্র গৃহস্থ মানুষ ছিলেন না। দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের এঁরা সবাই বিশিষ্ট নেতা ও নেত্রী। এলাহাবাদের আনন্দভবনে অতর্কিতে ইংরেজের পুলিশ উপস্থিত হতেন। বাবা যখন কারাগারে কেই-বা তাঁর শিক্ষার, বা গড়ে ওঠার বয়সের কথা বেশী করে ভাবতে পারতেন। কারাগার থেকে বাবা তাঁকে চিঠি লিখে পৃথিবীর ইতিহাস, সভ্যতা, সমাজ বিষয়ে যে পাঠ রচনা করে পাঠাতেন, তাই ছিল ইন্দিরার লেখা-পড়ার বনেদ। স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মমত লেখাপড়া তাঁর বেশী হয়নি। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে কিছুকাল পাঠ করেছেন, নৃত্যকলায় মণিপুরী নাচে কিছুটা তালিম নিয়েছেন তিনি। জেনেভার আন্তর্জাতিক কলেজে, ইংলণ্ডের সোমারভিল কলেজে কিছুকাল

বিদ্যাচর্চা করেছেন। কিন্তু কোন ডিগ্রি নেই তাঁর, যে ডিগ্রির জোরে তিনি তাঁর জ্ঞানগম্যতার, যোগ্যতার দাবী করতে পারতেন। বহুনা শ্রুতেন তিনি নন, কিন্তু তিনি কর্মসিদ্ধা, নিপুণা, দূরদর্শিনী বলে বিখ্যাত। ছোটবেলায় তিনি জোয়ান অব আর্কের আলেখ্য দেখতেন এবং এমন কিছু জীবনাদর্শের কথা তাঁর মনে গেঁথে যায়। কিশোরী বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করতে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে 'বানর সেনা' দল গড়েছেন, এমনি করে স্বাধীনতা সংগ্রামে হাতে খড়ি। এবং ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় তিনি ইংরেজের জেলে বন্দী হন।

দেখতে তিনি সুন্দর দর্শনা, নেহরু কন্যার রবীন্দ্রনাথ তাই নাম দিয়েছিলেন প্রিয়দর্শিনী। মহিলা বলেই নয়, ভারতে অন্যান্য নেতাদের সারিতে তাঁর চেহারার এই সুস্মিত সৌন্দর্যও দৃপ্ত সতেজ ভঙ্গী অন্য কারও মুখে দেখা যায়নি। পিতা নেহরু যিনি ভারতের স্বাধীনতার অনন্য প্রাণপুরুষ ছিলেন তাঁকেও যেমন দৃঢ়চিত্ত রূপবান পুরুষ বলে আমরা জানতাম, ইন্দিরাও তেমনি পিতার প্রতিচ্ছবি। ইন্দিরা নিজেকে বেদান্তবাদী বলেছেন, বেদান্তের সারতত্ত্ব না জেনেও। বেদান্তীরা পিতাকে পূজা করেন, ইন্দিরাও পিতাকে পূজার বেদীতেই প্রণম্য ভেবে এসেছেন। ইন্দিরার আগ্রহ ছিল গৃহসজ্জার প্রয়োগ-বিদ্যায়, নৃতত্ত্বে, নৃত্যশিল্পে এমনি কথা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এসব চর্চা অনুশীলন বা গবেষণার তিনি সময় পান নি। নিজের ভাগ্যকে ক্রমাগত তিনি দেশের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন। পিতা নেহরু যখন প্রধানমন্ত্রী তখন ইন্দিরা ছিলেন পিতার একান্ত তত্ত্বাবধায়ক, দেশ-বিদেশে তিনি পিতার সফর-সঙ্গিনী হয়েছেন। সারা বিশ্বে রাজনীতিক নেতাদের সঙ্গে তিনি এমনি করেই পরিচিত হয়েছেন, গুণী-জ্ঞানীজনের সান্নিধ্যও তাঁর জীবনে অহরহ ঘটেছে। ফিরোজ গান্ধীও রাজনীতিক ছিলেন, স্বামীর ঘরে গৃহবধূ হবারও অনেক অবসর ছিল না তাঁর জীবনে। রাজনীতিতে তিনি স্বেচ্ছায় আসেন নি, ঘটনা প্রবাহই তাঁকে রাজনীতিতে নিমজ্জিত করেছে।

নেহরু ছিলেন জাতিগঠনে সমাজবাদের তত্ত্বে বিশ্বাসী, গান্ধীজির সমাজদর্শনের তাত্ত্বিক প্রবক্তা তিনি পুরোপুরি হতে পারেন নি, ভারী শিল্প রূপায়ণে তিনি দেশকে আধুনিক শিল্প-সভ্যতায় প্রাগসর দেশগুলির সারিতে তুলে আনতে চেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর সমাজবাদের রূপায়ণে সংরক্ষণশীল একটি মনোভাবও ছিল। ইন্দিরা গান্ধী এই সমাজবাদের রূপায়ণে কয়েক ধাপ এগিয়ে এসেছেন। দেশের লগ্নী ব্যবসায়ের বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলির তিনি জাতীয়করণ করেছেন। সমাজে কম'জোর বর্গের নিগৃহীত মানুষের কল্যাণ-চিন্তায় সমাজ-বাদের রূপায়ণে এটা অনেক ধাপ এগিয়ে যাওয়া, পিতা নেহরুও তো এ কাজটি করে যেতে পারেন নি।

যৌবনের ধর্ম স্বপ্ন দেখা, ইন্দিরার স্বপ্নও দেশকে সমৃদ্ধ করার, বিশ্বদরবারে এই হতশ্রী দেশকে সম্মানিত করার, দেশের নিগৃহীত দরিদ্র মানুষের পুনরুজ্জীবন। তিনি ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসের সভানেত্রী হলেন, ১৯৬৪ সালে শাস্ত্রী-সরকারের তথ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ইন্দিরা।

১৯৬৬ সালে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু হলে—দেশে প্রধানমন্ত্রীত্ব পদের জন্যে ইন্দিরা গান্ধীর বিকল্প অন্য কেউ নেতা সমর্থ হলেন না যোগ্যতায়।

বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা অনেকেই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের ভাবমূর্তির না কংগ্রেসে না দেশে সুখ্যাতি ছিল। প্রধানমন্ত্রিত্বের পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মোরারজী দেশাই ইন্দিরার কাছে হেরে গেলেন। ইন্দিরার পক্ষে ভোট পড়েছিল ৩৫৫ এবং মোরারজীর পক্ষে ১৮৯। ফলতঃ ১৯শে জানুয়ারী ১৯৬৬-তে ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন ইন্দিরা গান্ধী। বিরাট দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হলো। সুবিশাল দেশ ভারতবর্ষ। পর্বতপ্রমাণ তার নানা সমস্যা। এমনই দেশ বা ভারতভাগ্যের রথচক্রের পরিচালনার কাজ তিনি একাদিক্রমে ১১ বছর চালিয়ে এসেছেন।

ইন্দিরার আগে দু'জন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাঁরা হলেন ইন্দিরার পিতা নেহরু এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রী। এঁরা ছিলেন ভারতভাগ্যের

বৃদ্ধ প্রহরী এবং অত্যয়কাল পরবর্তী সময়ে আরও দুজন বৃদ্ধ প্রহরী এদেশে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা হলেন মোরারজী দেশাই এবং চরণ সিং।

নেহরুর ব্যক্তিত্ব বিশ্বজনবিদিত, লালবাহাদুরের প্রধানমন্ত্রিত্বের কাল মোরারজী এবং চরণ সিং-এর মত স্বল্পকালেই সীমিত। এবং বিশ্ব রাজনীতিতে নেহরু বা লালবাহাদুরের মত দেশাই বা চরণ সিং তাঁদের ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখতে পারেন নি।

কিন্তু ইন্দিরার বলন-চলনের একটা স্বকীয়তা বিশ্ব রাজনীতিতে অহরহ উচ্চারিত হয়েছে।

বাংলাদেশের যুদ্ধ ও জন্মকালে য়ুরোপে সফররত ইন্দিরাকে সাংবাদিকরা ভুলতে পারবেন না। সেই সময়ে পশ্চিমী দেশে পাকিস্তানের প্রচার এবং ঐ দেশের প্রতি পক্ষপাতই ছিল অনেকে সোচ্চার।

পশ্চিম জার্মানীর রাজধানীর বন সহরে পশ্চিমী সাংবাদিকদের একটি সম্মেলনে ইন্দিরাকে পাকিস্তানের গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপের নানা অভিযোগ মাখানো প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি রুষ্টা হয়েছিলেন। বিবৃত করলেন তিনি—কি নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে-ছিল পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্যাতন, শুধু পূর্ববাংলার পাকিস্তানেই নয় তাঁর নিজের দেশেও অসংখ্য শরণার্থীদের মর্মন্তুদ প্রাণধারনে। তাঁর চোখের আলোয় এই সব হা-ঘরে মানুষদের দুঃখের তিমির জ্বল জ্বল করে উঠল, গলার পর্দা আবেগে থরথর করছিল, অনুকম্পা এবং ক্রোধে, তিনি বললেন—ভুলে যাবেন না আমি আপনাদের দেশে কিছু ভিক্ষার পাত্র নিয়ে আসিনি। বহুশত বাঘা বাঘা পশ্চিমী সাংবাদিক নীরবে শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্য শুনে গেলেন। এ তো গেল একটি সাংবাদিক সম্মেলনের কথা, এমনি ইন্দিরা অসংখ্য সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, নানা সমস্যার আলোচনা করেছেন জবাব দিয়েছেন।

সবাই জানেন ইন্দিরার চরিত্রে এক অপরিসীম ধৈর্য লক্ষনীয়,

কখনো তিনি রুষ্ট হলেও অধৈর্য হন না। এই ধৈর্য এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও মেধা তাঁর ১৯৮০ সালে পুনর্বার প্রধানমন্ত্রী হবার মূল কাহিনী। রাজনৈতিক বিরুদ্ধতা বিপর্যয়, অপবাদ, অসম্মানে যখন তিনি জর্জর তখনও তিনি সৌমনস্য অব্যাকৃত রেখেছিলেন। পুত্র সঞ্জয়ের মৃত্যুতে যখন হৃদয়ে দুঃখের শেল বইছেন তখনও তাঁর স্নিগ্ধ হাসিতে মুখশ্রী সুস্মিত, রসবোধে, দায়িত্ব পালনে অব্যাহত উৎসাহী। তিনি কোনো অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু দেশের জনসাধারণ বিশ্বাস করেছে ঈশ্বর ইন্দিরার কোনো বিকল্প নেতাকে ভারত-ভাগ্যের রথ পরিচালনায় অদ্যাবধি যোগ্যতর করে তোলেন নি। এবং বিজয়িনী ইন্দিরাও দেবমন্দিরে তাঁর অন্তরাত্মার একটি মন্ত্রকেই ধ্বনিত হতে শুনেছেন—'নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে'।

ঘটনাপঞ্জী

নভেম্বর ১৯, ১৯১৭ : এলাহাবাদে জন্ম।

১৯২২ : শিক্ষা সাবরমতীতে গান্ধী-আশ্রমে।

১৯২৩ : এলাহাবাদের সেন্ট সিসিলিয়া স্কুলে।

মার্চ, ১৯২৬ : মায়ের চিকিৎসার জন্য পিতার সঙ্গে ইউরোপ যাত্রা।

১৯২৭ : ডিসেম্বরে দেশে ফিরে সেণ্ট মেরী কনভেন্টে ভর্তি।

১৯২৮ : মহাত্মার 'চরকা-সঙ্গে'র শিশু বিভাগে যোগদান।

১৯৩০ : 'বানর-সেনা' গঠন।

এপ্রিল ২৩, ১৯৩১ : ছুটিতে মা-বাবার সঙ্গে সিংহল যাত্রা এবং দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ।

মে, ১৯৩১ : পুণার 'পিপলস্ ওন স্কুল'-এ ভর্তি।

এপ্রিল, ১৯৩৪ : ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

জুলাই, ১৯৩৪ : 'বিশ্বভারতী'তে (শান্তিনিকেতন) ভর্তি।

এপ্রিল ১৩, ১৯৩৫ : মায়ের সঙ্গে ইউরোপ যাত্রা।

ফেব্রুয়ারী ২৮, ১৯৩৬ : লসেন-এ কমলা নেহরুর মৃত্যু।

মে, ১৯৩৭ : পিতার সঙ্গে মালয়েশিয়া, বর্মা ও সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, চেকোস্লাভাকিয়া ও হাঙ্গেরী পরিভ্রমণ।

১৯৩৮ : জাতীয় কংগ্রেসের সভ্য।

ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ : ব্রিস্টল-এর ব্যাডমিন্টন স্কুলে ভর্তি। অক্সফোর্ডেও ভর্তি হন, আর হয়েছিলেন 'চায়না কমিটি'র সভ্য।

১৯৪১ : ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল হয়ে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন এবং ইংল্যাণ্ড থেকে আফ্রিকা হয়ে স্বদেশে ফেরেন।

মার্চ ২৬, ১৯৪২ : ফিরোজ গান্ধীর সঙ্গে বিবাহ।

আগস্ট ৮, ১৯৪২ : বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান।

সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৪২ : এলাহাবাদে কারাবরণ।

মে ১৩, ১৯৪৩ : বন্দীদশা থেকে মুক্তি।

আগস্ট ২০, ১৯৪৪ : রাজীবের জন্ম।

ডিসেম্বর ১৪, ১৯৪৬	সঞ্জয়ের জন্ম।
মে, ১৯৪৭	বাবার কাছে থাকার জন্য দিল্লী যাত্রা। আগস্টে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ।
আগস্ট ১৪, ১৯৪৭	ভারত বিভাগ, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম।
জানুয়ারী, ২৯, ১৯৪৮	গান্ধীজীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার।
এপ্রিল, ১৯৫৩ :	বান্দুং সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশে ইন্দোনেশিয়া যাত্রা। ঐ বছরে আমেরিকায় 'মাদার্স' এ্যাওয়ার্ড লাভ।
সেপ্টেম্বর ২০, ১৯৫৪	'তিনমূর্তি' ভবনে শিশুমঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। অক্টোবরে চীন, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া পরিভ্রমণ।
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫	কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ।
সেপ্টেম্বর ১৯, ১৯৫৫	কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটীর সভ্য।
সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৫৬	এলাহাবাদ নগর-কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত।
ফেব্রুয়ারী ২৩, ১৯৫৮	পিতার স্থলে কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ডের সভ্য।
ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৫৯	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ।
সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৬০	ফিরোজ গান্ধীর মৃত্যু।
নভেম্বর ১১, ১৯৬০	আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হাওল্যাণ্ড স্মৃতি পুরস্কার' লাভ।
নভেম্বর ১৮, ১৯৬০	প্যারিস্থিত ইউনেস্কোর কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত।
আগস্ট, ১৯৬১	কেনিয়া, উগাণ্ডা, তানজানিয়া ও রোডেশিয়া পরিভ্রমণ।
জানুয়ারী ১৯, ১৯৬৩	কেন্দ্রীয় নাগরিক কমিটীর সভাপতি নির্বাচিত।
ডিসেম্বর ৮-৩০, ১৯৬৩	তানজানিয়া, রোডেশিয়া, জাম্বিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র পরিভ্রমণ।
মে ২৭, ১৯৬৪	জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু।
জুলাই ২, ১৯৬৪	লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রিসভায় তথ্য ও বেতার দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ।
আগস্ট ২০, ১৯৬৪	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভায় নির্বাচিত।

অক্টোবর ৮-২৯, ১৯৬৭	মস্কো, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র সফর।
নভেম্বর ৬-৮, ১৯৬৭	সোভিয়েত বিপ্লবের অর্ধশতবার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন যাত্রা।
ফেব্রুয়ারী ১০, ১৯৬৮	রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব উ থানের সঙ্গে দিল্লীতে সাক্ষাৎকার।
মে ৩, ১৯৬৮	সিকিম ও ভুটান সফর।
জুন ১, ১৯৬৮ :	সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ।
আগস্ট ১৯, ১৯৬৮ :	শ্রীমধু লিমায়ে কর্তৃক শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে আনিত অনাস্থা প্রস্তাব ১৫৩-৫৭ ভোটে অগ্রাহ্য।
সেপ্টেম্বর ২৩-২৯, ১৯৬৮ :	ব্রাজিল ও আর্জেনটিনা পরিভ্রমণ।
অক্টোবর ২-১৭, ১৯৬৮	চিলি, ভেনেজুয়েলা সফর শেষে ১৬ তারিখে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।
নভেম্বর ৬, ১৯৬৮	মস্কো সফর।
নভেম্বর ২৮, ১৯৬৮	দিল্লীতে সিংহলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা।
জানুয়ারী ৫, ১৯৬৯	কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের জন্য লণ্ডন যাত্রা।
মার্চ ৩০, ১৯৬৯	ব্রহ্মদেশ সফর।
জুন ২১-২৬, ১৯৬৯	মরিসাস্ ভ্রমণ।
জুলাই, ১৯৬৯	ইন্দোনেশিয়া সফর।
জুলাই ১৯, ১৯৬৯ :	ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ। শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের পদত্যাগ।
জানুয়ারী ২২, ১৯৭০	জেনারেল নে উইন-শ্রীমতী গান্ধী যুগ্ম বিবৃতি।
ফেব্রুয়ারী ১৪, ১৯৭০	দিল্লীতে পশ্চিম জার্মানীর পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে বৈঠক।
ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯৭০	লাওসের রাজা ও রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
ফেব্রুয়ারী ২৮, ১৯৭০	অর্থমন্ত্রী হিসাবে লোকসভায় প্রথম বাজেট পেশ।
মার্চ ১৭, ১৯৭০	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদীয় দলনেত্রী নির্বাচিত এবং পরদিন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন।

মে ১, ১৯৭০ : লোকসভায় অর্থবিল পেশ।

মে ১৮, ১৯৭০ : চতুর্থ যোজনার চূড়ান্ত দলিল সংসদে উপস্থাপন।

জুন ২৬, ১৯৭০ : মন্ত্রিসভায় রদবদল, স্বরাষ্ট্র দপ্তর গ্রহণ।

জুলাই ৯, ১৯৭০ : বর্মার বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান জেনারেল নে উইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

জুলাই ১৯, ১৯৭০ : দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের নেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

জুলাই ২৮, ১৯৭০ : আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, সি. পি. এম. ও এস. এস. পি. দল কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন।

সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৭০ : লুসাকায় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান।

সেপ্টেম্বর ২০, ১৯৭০ : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রজত-জয়ন্তী উৎসবে যোগদান।

নভেম্বর ১, ১৯৭০ : 'আনন্দ-ভবন' জওহরলাল নেহরু স্মৃতি ভাণ্ডারের অছিদের হস্তে অর্পণ।

ফেব্রুয়ারী ৬, ১৯৭১ : লোকসভা বাতিল হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকার বৈধতা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টে আপীল।

মার্চ ১৭, ১৯৭১ : পুনরায় কংগ্রেস পার্লিয়ামেণ্টারী দলের নেত্রী নির্বাচিত এবং পরদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ।

মার্চ ৩১, ১৯৭১ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহানুভূতি জ্ঞাপন। লোকসভার উপনির্বাচনে বিপুল জয়লাভ।

জুন ১৭, ১৯৭১ : পূর্ব বাংলার সমস্যা ভারতেরই সমস্যা—শ্রীমতী গান্ধীর ঘোষণা।

আগস্ট ৯, ১৯৭১ : সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক 'শান্তি-চুক্তি' সম্পাদিত।

আগস্ট ১৫, ১৯৭১ : শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার সম্পর্কে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে তারবার্তা প্রেরণ।

নভেম্বর ৯, ১৯৭১ : বাংলাদেশের প্রতি সুবিবেচনা ও সহানুভূতি

প্রদর্শনের জন্য মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নিক্‌সন প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ।

নভেম্বর ২৭, ১৯৭১ : বাংলাদেশের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান।

নভেম্বর ৩১, ১৯৭১ : বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যসভায় ভাষণ।

ডিসেম্বর ৩, ১৯৭১ : দেশের পশ্চিম সীমান্তে পাক-বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ।

ডিসেম্বর ৪, ১৯৭১ : ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা। বাংলা-দেশে ভারতীয় বাহিনীর প্রবেশ। ভারত-পাক সঙ্ঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী অধিবেশন।

ডিসেম্বর ৫, ১৯৭১ : নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত মার্কিন প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো প্রয়োগ।

ডিসেম্বর ৬, ১৯৭১ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি দান। পাকিস্তান কর্তৃক ভারতের সঙ্গে কূটনীতি-সম্পর্কচ্ছেদ।

ডিসেম্বর ১৩, ১৯৭১ : টংকিঙ উপসাগর থেকে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের বঙ্গোপসাগর অভিমুখে যাত্রা।

ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭১ : অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরতি মেনে নিয়ে পাক এলাকা থেকে ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে নেবার মার্কিন প্রস্তাবে সোভিয়েত ভেটো প্রয়োগ।

ডিসেম্বর ১৫, ১৯৭১ : ভারতীয় পদাতিক ও মিত্রবাহিনীর ঢাকা প্রবেশ। লেঃ জেনারেল নিয়াজীর যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব। ভারত অভিমুখে সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজ ও মিসাইল ফ্রিগেট-এর যাত্রা।

ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১ : বাংলাদেশস্থ সমগ্র বাহিনী সহ বিনাসর্তে নিয়াজীর আত্মসমর্পণ। ঢাকায় লেঃ জনারেল জগজিৎ সিং অরোরা ও নিয়াজী কর্তৃক আত্মসমর্পণ দলিল

সাক্ষর। পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারত কর্তৃক এক তরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা।

ডিসেম্বর ১৭, ১৯৭১ : পশ্চিম রণাঙ্গনে চৌদ্দদিনব্যাপী যুদ্ধের অবসান।

জানুয়ারী ৮, ১৯৭২ : পাক-কারাগার থেকে শেখ মুজিবুরের মুক্তিলাভ।

জানুয়ারী ১০, ১৯৭২ : দিল্লীতে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে মুজিবুরের সাক্ষাৎ।

ফেব্রুয়ারী ৭, ১৯৭২ : কলকাতায় শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রীমতী গান্ধীর সাদর অভ্যর্থনা।

মার্চ ৩, ১৯৭২ : যুদ্ধবন্দী-প্রশ্নে ভারত-পাক আলোচনা।

মার্চ ১২, ১৯৭২ : নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ভারতীয় জওয়ানদের বাংলা-দেশ থেকে প্রত্যাবর্তন।

মার্চ ১৭, ১৯৭২ : শ্রীমতী গান্ধীর বাংলাদেশ সফর।

মার্চ ১৮,-১৯৭২ : ঢাকায় ভারত-বাংলাদেশ পঁচিশ বৎসরের মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত।

জুন ২৮, ১৯৭২ : সিমলা শীর্ষ সম্মেলন শুরু।

জুলাই ২, ১৯৭২ : সিমলা-চুক্তি স্বাক্ষর। যুদ্ধে অধিকৃত এলাকা পাকিস্তানকে প্রত্যর্পণ।

আগস্ট ১৪-১৫, ১৯৭২ : স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে মধ্যরাত্রির অধিবেশনে সংসদে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ভাষণ।

ডিসেম্বর ২০, ১৯৭২ ভারত-পাকবাহিনীর নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন।

জানুয়ারী ৩০, ১৯৭৩ : দিল্লীতে গান্ধী-সমাধি মন্দিরে গান্ধীজীর জীবনী ও কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করে ভূগর্ভে 'টাইম-ক্যাপসুল' স্থাপন। ৪৪৬টি কয়লাখনি জাতীয়করণ।

ফেব্রুয়ারী ৫, ১৯৭৩ সম্মানসূচক FAO মেডেল লাভ।

এপ্রিল ২৪, ১৯৬৩ সুপ্রীম কোর্টের রায়—মৌলিক অধিকারসহ সংবিধান সংশোধনের অধিকার সংসদের আছে।

এপ্রিল ৯, ১৯৭৪ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য দিল্লীতে চুক্তি স্বাক্ষর।

এপ্রিল ৩০, ১৯৭৪ : তিরানব্বুই হাজার পাক-যুদ্ধবন্দীকে স্বদেশে ফিরিয়ে দেবার কাজ শেষ।

ডিসেম্বর ২, ১৯৭৪ : ভারত-পর্তুগাল কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন।

জানুয়ারী ২, ১৯৭৫ : যোজনা সহ বিজ্ঞান ও কারীগরি দপ্তরের ভার গ্রহণ।

জানুয়ারী ৩, ১৯৭৫ : সমস্তিপুরের জনসভায় বোমার আঘাতে রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রের মৃত্যু।

মার্চ ৬, ১৯৭৫ : শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সংসদ অভিযান।

মার্চ ২৯, ১৯৭৫ : সিহানুক সরকারের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা।

এপ্রিল ২৬, ১৯৭৫ : ভারতের অন্যতম রাজ্য হিসাবে সিকিমের যোগদান।

এপ্রিল ২৮, ১৯৭৫ : কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের পথে জামায়কায় উপস্থিতি।

জুন ৪, ১৯৭৫ : গোয়া, দমন, দিউ সহ দাদরা ও নগরহাভেলির উপর ভারতের সার্বভৌমত্ব স্বীকার, লিসবনে ভারত-পর্তুগালের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

জুন ১২, ১৯৭৫ : রায়বেরেলি কেন্দ্র থেকে ১৯৭১-এ লোকসভায় শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষণা।

জুন ২৪, ১৯৭৫ : সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রীআয়ার কর্তৃক প্রধান-মন্ত্রীকে সংসদে যোগদানের অধিকার দান, তবে তাঁর ভোটাধিকার থাকবে না।

জুন ২৫, ১৯৭৫ : লোকসঙ্ঘর্ষ দল কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ২৯ তারিখে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের কথা ঘোষণা।

জুন ২৬, ১৯৭৫ : দেশের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য আপৎকালীন নিষেধাজ্ঞা (স্টেট অব এমারজেন্সি) জারী এবং জাতির উদ্দেশে শ্রীমতী গান্ধীর বেতারভাষণ।

জুলাই ১, ১৯৭৫ : অর্থনৈতিক নীতি পুনর্বিন্যাসে বিশ দফা কার্যসূচী ঘোষণা।

৪, ১৯৭৫ : আর. এস. এস., আনন্দমার্গ জামাইত-ই-ইসলামী-ই-হিন্দ ও নকশাল সহ ছাব্বিশটি উগ্রপন্থী প্রতিষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী।

জুলাই ২২, ১৯৭৫ : রাজ্যসভায় ১৩৬-৩৩, এবং পরদিন লোকসভায় ৩৩৬-২১ ভোটে জরুরী ব্যবস্থা অনুমোদিত।

জুলাই ২৪, ১৯৭৫ : জরুরী অবস্থা জারির বিরুদ্ধে যাতে আদালতে কোনো আবেদন পেশ না করা যায় সেজন্য সংবিধানের ৩৮তম সংশোধন বিলে সংসদের অনুমোদন লাভ।

আগস্ট ১০, ১৯৭৫ : ৩৯তম সংশোধনে রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতিদান।

অক্টোবর ১০, ১৯৭৫ : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন।

অক্টোবর ২৮, ১৯৭৫ : কমনওয়েলথ পার্লামেণ্টারী সম্মেলনের উদ্‌বোধন।

নভেম্বর ১, ১৯৭৫ : বিহার মন্ত্রিসভা নিয়ে শ্রীজয়প্রকাশ-নারায়ণের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা।

নভেম্বর ৪, ১৯৭৫ : শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বিহার আন্দোলন এবং পুলিশের লাঠিতে তিনি আহত।

নভেম্বর ৭, ১৯৭৫ : ১২ জুনে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক রায়বেরেলির যে নির্বাচন অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছিলো সুপ্রীম কোর্টের কনস্টিটিউশন্স বেঞ্চ তা অগ্রাহ্য করেন।

ডিসেম্বর ৮, ১৯৭৫ : কাউন্সিল আইন বাতিল দ্বারা সংবাদপত্রে আপত্তিকর বিষয় প্রকাশ নিষেধ করে অর্ডিন্যান্স জারি।

ডিসেম্বর ১৯, ১৯৭৫ : প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনায় 'ভারত আত্মা' শীর্ষক চার খণ্ড স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ।

ডিসেম্বর ২৮, ১৯৭৫ : চণ্ডিগড়ের নিকট কংগ্রেসের ৭৫তম অধিবেশনে লোকসভার পরবর্তী নির্বাচন এক বৎসর পিছিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত।

এপ্রিল, ১৯৭৬ : শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দর-নায়কের সঙ্গে বৈঠক।

অক্টোবর ২৪, ১৯৭৬ : সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা লোকসভার আছে বলে শ্রীমতী গান্ধীর ঘোষণা।

অক্টোবর ৩০, ১৯৭৬ : বর্তমান লোকসভার আয়ু ১৯৭৮-এর মার্চ পর্যন্ত বর্ধিত করার সরকারী সিদ্ধান্ত।

নভেম্বর ২৮, ১৯৭৬ : সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষায় শ্রীমতী গান্ধীর সাত দফা নীতির কথা ঘোষণা।

জানুয়ারী ১৯, ১৯৭৭ : রাষ্ট্রপতি ফকিরুদ্দিন আলি আহ্‌মেদ কর্তৃক লোকসভা বাতিলের নির্দেশ।

ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৭৭ : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের পদত্যাগ এবং 'গণতন্ত্রী কংগ্রেস' নামক নতুন দল গঠন।

ফেব্রুয়ারী ৯, ১৯৭৭ : শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর পাঁচ দফা কর্মসূচীর সমর্থনে শ্রীমতী গান্ধীর বিবৃতি।

ফেব্রুয়ারী ২৩, ১৯৭৭ : নিজের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ অস্বীকার করে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের খোলা চিঠি।

ফেব্রুয়ারী ২৮, ১৯৭৭ : আচার্য কৃপালনী কর্তৃক 'জরুরী অবস্থা' তুলে নেবার আবেদন।

মার্চ ১৬, ১৯৭৭ : ভারতের ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দিন।

মার্চ ১৭, ১৯৭৭ : পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে নতুন করে নির্বাচনের নির্দেশ জারী।

মার্চ ২১, ১৯৭৭ : রায়বেরিলি কেন্দ্রে জনতা পার্টির প্রার্থী শ্রীরাজনারায়ণের নিকট প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পরাজিত।

মার্চ ২২, ১৯৭৭ : অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রীজাত্তির নিকট শ্রীমতী গান্ধীর পদত্যাগপত্র পেশ।

মার্চ ২৪, ১৯৭৭ : প্রথম অ-কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীরূপে শ্রীদেশাইয়ের শপথ গ্রহণ।

জুলাই ১৫, ১৯৭৭ : পনেরো হাজার ডলার ব্যয়ে শ্রীমতী গান্ধীর মর্মর মূর্তি নির্মাণে কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি।

আগস্ট ২৫, ১৯৭৭ : দেশে সামরিক শাসন চালু করতে সামরিকবাহিনীর তিন প্রধানের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী সাক্ষাৎ করেন বলে সি. পি. এম. নেতার অভিযোগ।

জানুয়ারী ২, ১৯৭৮ : দ্বিধাবিভক্ত জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীরূপে শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচিত।

জানুয়ারী ১৭, ১৯৭৮ : শাহ্‌ কমিশন কর্তৃক অন্তবর্তী রিপোর্ট প্রকাশ।

মার্চ ১৩, ১৯৭৮ : সরকারের নিকট শাহ্ কমিশনের অন্তর্বর্তীরিপোর্ট পেশ।

এপ্রিল ১২, ১৯৭৮ : প্রধান বিরোধী দল হিসাবে লোকসভায় ইন্দিরা-কংগ্রেসের স্বীকৃতিলাভ।

নভেম্বর ৮, ১৯৭৮ : চিকমাগালু লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে শ্রীমতী গান্ধীর জয়লাভ।

নভেম্বর ২১, ১৯৭৮ : অধিকারভঙ্গ ও সভা অবমাননার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর সদস্যপদ বাতিল এবং শাস্তিস্বরূপ তিহার জেলে তাঁর কারাবাস।

ডিসেম্বর ১৯, ১৯৭৮ : সপ্তাহকালব্যাপী লোকসভার অধিবেশন চলা পর্যন্ত অধিকাররক্ষা কমিটি কর্তৃক শ্রীমতী গান্ধীকে কারারুদ্ধ রাখার নির্দেশ।

ডিসেম্বর ২৬, ১৯৭৮ : সপ্তাহকাল কারাবাসের পর শ্রীমতী গান্ধীর মুক্তি।

ফব্রুয়ারী ১২, ১৯৭৯ : 'কিস্সা কুর্শিকা' চিত্র নষ্ট করার দায়ে সঞ্জয় গান্ধী ও প্রাক্তন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ভি. সি. শুক্লার কারাদণ্ড।

জুন ১৩, ১৯৭৯ : বিশেষ আদালতে শ্রীমতী গান্ধী ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে 'জীপ কেলেঙ্কারী' মামলা রুজু।

মে ৬, ১৯৭৯ : ১৪৪ ধারা অমান্য করে লক্ষ্ণৌতে সঞ্জয় গান্ধীর গ্রেপ্তারবরণ।

মে ৮, ১৯৭৯ : 'বিশেষ আদালত' বিল রাজ্যসভায় গৃহীত।

জুলাই ১৮, ১৯৭৯ : নতুন সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কংগ্রেস সংসদীয় নেতা শ্রীচ্যবনকে আহ্বান।

জুলাই ২৮, ১৯৭৯ : প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রীচরণ সিং-এর শপথ গ্রহণ।

আগস্ট ২০, ১৯৭৯ : চরণ সিং মন্ত্রিসভাকে সমর্থন না করার জন্য ইন্দিরা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত। ফলে চরণ সিং মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। লোকসভা ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান।

আগস্ট ২২, ১৯৭৯ : লোকসভা বাতিল করে রাষ্ট্রপতির আদেশ জারী।

ডিসেম্বর ২০, ১৯৭৯ : শাহ্ কমিশনে সাক্ষ্য না দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী ও

	শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় কোন অপরাধ করেন নি—দিল্লী হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীচাওলার রায়।
জানুয়ারী ৩, ১৯৮০ :	লোকসভার সপ্তম নির্বাচন শুরু।
জানুয়ারী ৭, '১৯৮০ :	রায়বেরিলি ও মেদক—উভয় কেন্দ্রে শ্রীমতী গান্ধীর বিপুল ভোটে জয়লাভ এবং প্রায় প্রতিটি রাজ্যে ইন্দিরা-কংগ্রেসের জয়জয়কার। শ্রীসঞ্জয় গান্ধীও তাঁর কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়ী।
জানুয়ারী ৯, ১৯৮০ :	লোকসভায় ইন্দিরা-কংগ্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ।
জানুয়ারী ১৪, ১৯৮০ :	তেত্রিশ মাস পরে পুনরায় দেশের প্রধানমন্ত্রীরূপে শ্রীমতী গান্ধীর শপথ গ্রহণ।
জানুয়ারী ২৭, ১৯৮০ :	ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট ও চীনা বিদেশমন্ত্রির সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর বৈঠক।
ফেব্রুয়ারী ৫, ১৯৮০ :	পাক-প্রেসিডেণ্টের কাছে শ্রীমতী গান্ধীর পত্র।
ফেব্রুয়ারী ১১, ১৯৮০ :	আফগানিস্থান সমস্যা নিয়ে সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রির সঙ্গে দিল্লীতে শ্রীমতী গান্ধীর আলোচনা।
ফেব্রুয়ারী ১৭, ১৯৮০ :	বিহার, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, ওড়িশা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ু রাজ্যে বিধানসভা বাতিল এবং নতুন নির্বাচনের নির্দেশ।
মার্চ ১২, ১৯৮০ :	বিশ দফা কর্মসূচীর উপর প্রধানমন্ত্রীর নতুন করে গুরুত্ব আরোপ।
এপ্রিল ১১, ১৯৮০ :	'কিস্‌সা কুর্শিকা' মামলার দণ্ডাদেশ থেকে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক শ্রীসঞ্জয় গান্ধী ও শ্রীশুক্লাকে মুক্তিদান।
এপ্রিল ১৫, ১৯৮০ :	নতুন করে ছ'টি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার আদেশ জারী।
মে ৯, ১৯৮০ :	বেলগ্রেডে চীনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর আলোচনা।
জুন ১, ১৯৮০ :	তামিলনাড়ু ছাড়া বাকি আটটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনে ইন্দিরা-কংগ্রেসের জয়লাভ।
জুন ২৩, ১৯৮০ :	দিল্লীতে বিমান দুর্ঘটনায় সঙ্গী ক্যাপ্টেন সাকসেনা সহ সঞ্জয় গান্ধীর শোচনীয় মৃত্যু।

নির্ঘণ্ট

অটল, মদন, ডাঃ ৮৬
অরোরা, জগজিৎ সিং ১৮
অলড্রিন, এডুইস ই. জুনিয়র ৬০
'অসহযোগ আন্দোলন' ৬১-৩, ৯১
'আওয়ামী লীগ' ২১৪
আর্ক, জোয়ান অব ১৫০, ২৮১
আগরওয়ালা, আর. এন. ২৬৫
আজাদ, মৌলানা আবুল কালাম ৬২-৩, ১১৮
'আর্ট অব প্লেন টক্, দি' ২০০
আত্মচরিত ৬৭-৮, ৭০
আনন্দবাজার পত্রিকা ৯০
'আনন্দ ভবন ৪২, ৪৪, ৪৮, ৬২-৩. ৭৫, ৭৭, ১১০-১১
আনসারী, ডঃ ৬৩, ৬৯
আর্নল্ড, ম্যাথু ১০
আর্মষ্ট্রং, নীল অ্যালডেন ৬০
আলী, অরুণা আসফ ৫২
আলী, মুন্সী মোবারক ৪৪-৬
আলী, মৌলানা মহম্মদ ৬২
আলী, রাও ফরমান ১৭
আলী, শওকত ৬২
আহমেদ, ফকরুদ্দিন আলী ৫৬-৮
আর্স, দেবরাজ ২৭০
আয়োনেসকো, ইউজিন ১৮৮
'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ১৭৫-৬
'ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড' ৯২
ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ৯৭
ইণ্ডিয়া লীগ ৯১-২
'ইন্দিরা ডকট্রিন' ১৩
ইন্দিরা তরঙ্গ ১৮১
'উই নেহরুজ্' ১১৯
উইলকিনসন, এলেন ৯৩
উইলসন, মিঃ হ্যারল্ড ১৯৫
উ থান ১৫
একজিকিউটিভ কাউন্সিল ১০৮
'এ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটারস্' ৯৩
এণ্টনী, ফ্রাঙ্ক ২২৫, ২৬৮-৯
এলিজাবেথ, রাণী (দ্বিতীয়) ১৮৯
এ্যাটউড, উইলিয়াম ৪১
এ্যাটলি, ক্লেমেণ্ট ১০১
ওবেইদুল্লা, মৌলবী ৬৬
ওয়াইল্ড, অস্কার ১১৩
ওয়াভেল, লর্ড ১১৮-৯
'ওয়ার হিরোইন' ২১১
কর, সুরেন্দ্রনাথ ৮২
করুণানিধি, মুথুভেল ২২৫
কলম্বো সম্মেলন ১৪৫-৬
কলিনস, মাইকেল ৬০
কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি ২৫৯

কংগ্রেস ২৬-৯, ৩৫-৭, ৪০, ৪২, ৪৭, ৫১-৬০ ৬২-৪, ৬৮-৭২, ৯৭-৯, ১০৭-৯, ১১২, ১১৮-২৩
কংগ্রেস (সংগঠন) ৯, ৫৯ ; ভাঙ্গন ৬০-৬১ ; নাগপুর অধিবেশন ১৩৮ ; ভুবনেশ্বর অধিবেশন ১৫৪ ; কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচন ২৬-৩৬ ; হাইকম্যাণ্ডের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর বিরোধ ৫০-৫৯
কাউল, বি. এম. ১৪৫
কামরাজ নাদার ২৬, ২৮-৩০, ৩৬, ১৫৩-৪, ১৬৫, ১৭৫
'কামরাজ প্রথা' ২৮-৯
কামা, মাদাম ৬৬
কাশ্মীর ১৫৬-৭, ১৯৫-৬
ক্যাবিনেট মিশন ১২০-২১
ক্যাম্পবেল, জোসেফ ১৮৮
ক্যামারনস, মিস ৬৫
কিদোয়াই, রফি আমেদ ১২৭-৮
কিগিংগার, প্রফেসর হেনরী, ১২
ক্রিপস, স্ট্যাফোর্ড ৯৩, ১০৭-৮
কুইট ইণ্ডিয়া ১০৯
ক্রুশ্চেভ, নিকিতা ১৩০, ১৫৮
কুমারমঙ্গলম, মোহন ৯২
কুমারী দেশপাণ্ডে ২৬৭
কেনন, জর্জ ১৮৮
কেনেডি, এডওয়ার্ড ১২
কেনেডি, জ্যাকেলিন ১৪৮
কেনেডি, জোসেফ ১২৮
কোসিজিন, আলেকসি ১৫৬, ১৫৮-৯
কৃপালনী, কৃষ্ণ ৮৫
কৃপালনী, জে. বি. ১৪২
কৃষ্ণমাচারী, টি. টি. ১৩১
কৃষ্ণমুর্তি, জে. ১৮৮
কৃষ্ণমেনন, ভি. কে. ১৩২-৩, ১৪৪
খান, আয়ুব ৬১, ১৫৬-৯
খাঁ, ইয়াহিয়া ৫, ১০, ১৬, ১৯, ২০৯, ২১১, ২১৪
খান, কাদের ১৭
গডসে, নাথুরাম ১২৫
'গানবোট ডিপ্লোমেসী' ১৩, ১৫
গান্ধী, আভা ১২৪
গান্ধী, ইন্দিরা :
আদালতে সোপর্দ ২৬৯ ; উপ-নির্বাচনে জয়লাভ ২৭১ ; ইকনমিক পলিসি ৫২, ১৬৫-৬, ১৭০ ; ওড়িশার ঘটনা ১৭০-৭২ ; কংগ্রেস সভাপতিত্ব ১৩৭-৪২ ; কেরল পরিস্থিতি ১৩৯-৪০ ; কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসঙ্কট ১৬১-২ ; খোলা চিঠি ১৭৮ ; গরিবী হটাও ১৬৮, ১৭৭, ১৭৯, ২০১ ; গ্রেপ্তারবরণ ২৭৩ ; ঘরোয়া জীবন ১৮৫-৯১ ; চিঠিপত্র ১৪-৫, ১৮০-১৮৫ ; জন্ম ৪২ ; জরুরী অবস্থা জারী ২৬৯ ; নির্বাচনী অভিযান ১৪০-৪১, ১৭০, ১৭২, ১৭৭-৯ ; প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন ২৬-৩৫ ; প্রধানমন্ত্রীর শপথ ১৬০ ; পিতার ৩২, ৬৪-৫, ৭৪-৫, ১০০,

১০১, ১৫০-১, ১৬০-৬১, ১৭৪-৬ ; বানর সেনা ৭২-৫ বাংলাদেশ সফর ১৮৪-৫, ২০৩-৪ ; ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ৫১-২, ৫৪, ২০১ ; বিদেশ ভ্রমণ ২২, ৩৮, ১৫৮ ; বিবাহ ১০৪-১০৬ ; বৈদেশিক নীতি ২৩, ১৫৮, ১৬৯ ; ভারত রত্ন ২৪, ২০১ ; ভাষণ ১-৪, ৭-৮, ৯-১০, ২০৩-৪ ; জেল থেকে মুক্তিলাভ ২৭৪ ; মুদ্রা মুল্য হ্রাস ১৬৩-৪ ; লোকসভা নির্বাচনে সাফল্য ২৭৭ ; শান্তিনিকেতন ৭৯-৮৫, ১৮৯ ; শিশুকাল ৪৬-৯, ৬৩-৭ ; শিক্ষা ৬৫-৬, ৭৭-৯, ৮২-৬, ৯১-৮ ; শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২০, ২০৮ ; স্বামীর মৃত্যু ১৩৩-৪ সিণ্ডিকেট গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধ ৫১-৬০, ১৭৬-৭ ; স্টেটসম্যানশিপ ২৪, ৬০ ; স্মৃতিচারণ ৭২-৫, ১০৯-১৬ ; বিশ দফা কর্মসূচী ২৩০-৩২ ; পাঁচদফা কর্মসূচী ২৩৬ ; জনতা দলের কাছে নির্বাচনে পরাজয় ২৫৮ ; কংগ্রেস (আই) গঠন ২৬০ ;

গান্ধী, ফিরোজ ৮৭-৯, ৯৬, ১০২-৫, ১১০, ১২৭-৩৬, ১৭২-৮৮

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ, ৩১, ৬১-৩, ৭০, ৭১, ১০৮-৯, ১১৯, ১২৩-৫, ১৫০, ১৮৮

গান্ধী, রাজীব ১১৭, ১২৫, ১২৮, ১৫৩

গান্ধী, শান্তা ৯৫-৬

গান্ধী, সঞ্জয় ১১৭, ১২৮, ১৫৩, ১৯৯ ২৫৭, ২৬০-৬৩, ২৬৭, ২৭৬-৭

গিরি, ভি. ভি. ২০, ২৪, ৫৩, ৫৫, ১৭৬

গুপ্ত, ভূপেশ ৯২, ১০৩

গোখেল কমিশন ২৬৫

গোল্ডামিয়ার, মিসেস ৩৭

'গ্রামার অব পলিটিকস', দ্র ৯৫

ঘোষ, অতুল্য ৩০-৩১, ৫১-২

চক্রবর্তী, নিখিল ৯২

চক্রবর্তী, রেণু ৯২

চন্দ্রশেখর, ৫২-৩

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ ২৬৪-৫

চট্টোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র ১৬২

চট্টোপাধ্যায়, বীরেন ৬৬

চাগলা, এম. সি. ১৩১

চার্চিল, উইনস্টন ১০৭, ১২০

চীন ৯, ১১, ২২, ১৪২-৫

চীন-ভারত বিরোধ, ১৪২, ১৯৩

চ্যাবন, যশোবন্তরাও ৫, ১৪, ২৯, ২৬, ২৮, ১৬৪-৫, ২৬০

চৌ এন-লাই, ১২৮, ১৪৪

চৌধুরী, জয়ন্তনাথ ১৪৫, ১৫৭

চৌধুরী, ত্রিদিব ১২৬

চৌধুরী, শচীন ১৬৩

জনতা পার্টি ২৫৮

জনসন, লিণ্ডন ৩৭, ১৫৮, ১৮৯

জনসন, রেভারেণ্ড ৯৩

জনসংঘ ৯, ৩১, ১৬৬-৭, ১৭২, ১৭৪

জালিয়ানওয়ালাবাগ ৬৩
'জিঞ্জার গ্রুপ' ১৩৯
জিন্না, মহম্মদ আলী ১১০, ১১৮-১২৪, ২১১
জেনেভা কনভেনশন ১৭
জৈন ২৬৯
টমসন, এডওয়ার্ড ৯৩, ১৯৬
টলার, আর্নস্ট ৬৬, ৯১-৩
টলার ক্রিষ্টিন, মিসেস ৯২-৩
টাইম পত্রিকা ২৬৩
টিটো, প্রেসিডেণ্ট, ১২৮, ২২৯
টোপে, তাঁতিয়া ৪৫
ট্রুম্যান, প্রেসিডেণ্ট ১২৬
ঠাকুর, রবীন্দ্রাথ ৮০, ৯০-৯১, ১৩৪, ২০৫, ২০৮, ২১৫
'চিত্রাঙ্গদা' ২০২
ডাঙ্গে, এস. এ. ৩০
ডালমিয়া, রামকৃষ্ণ ১৩০
ডিকেন্স, চার্লস ৬৬
'ডিরেক্ট অ্যাকশন' ১২১
'ডিয়ার টু বিহোল্ড' ৩৯, ১২৫
ডেবর, ইউ. এন. ১৩৭
'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' ৬৯, ১০৮
তারা সিং, মাস্টার ১৬৭
তাশখন্দ চুক্তি ১৫৯
দাণ্ডেকর ৫৬
দেশ ৮১, ৮৫
দেশাই, কান্তিভাই ২৭৬
দেশাই, মোরারজী ২৬, ২৯-৩০, ৩৩-৩৫, ৫১-২, ১৫৪, ২২৭, ২৪৬, ২৫৮-৯, ২৭৩, ২৭৫-৬
ধারিয়া, মোহন, ৫২, ২২৫
নগুচি ১৮৮
নন্দ, গুলজারীলাল ২৮, ৩৬, ১৫৩, ১৬৫
নাইডু, পদ্মজা ৪০, ১২৫
নাইডু, সরোজিনী ৩৯, ৬৩, ১৩৭
নাম্বুদ্রিপাদ, ই. এম. এস. ১৩৯
নারায়ণ, জয়প্রকাশ ৫৮, ২২৫-৭, ২৭৬, ২৭৯
নাসের, গামাল আবদেল ১২৮
ন্যারিয়েলওয়ালা, পি. এল. ১৯৮-৯
ন্যাশনাল হেরাল্ড ১২৭, ১২৯
নায়ার, ডাঃ সুশীলা ৪০
নিকসন, রিচার্ড ১২, ১৪, ২০৭
নিকসনকে শ্রীমতী গান্ধীর চিঠি ১৪-৫
নিজলিঙ্গাপ্পা ৫১-৩, ৫৫-৬০
নির্বাচন : ১৯৬৭ (চতুর্থ সাধারণ) ১৬৯-৭৪ ; ১৯৭১ (লোকসভার উপ-) ১৭৬-৭ ; ১৯৭২ (অন্ত-বর্তীকালীন) ১৭৭
নিরাপত্তা পরিষদ ১১
নিয়াজী, এ. এ. কে. ১৭-৮
নেহরু, কমলা ৪২-৪, ৮৫-৯০, ২৫৭
নেহরু, জওহরলাল, ৯, ২০, ২৪, ২৬-৭ ৩০-৩২, ৪৩-৬, ৬৪-৮, ৯৮, ১০০-১০৫, ১১৯, ১২৫, ১২৯, ১৩৬, ১৪০, ১৪৪-৫, ১৪৭-৫৫ ১৬২, ১৭০, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬, ১৯০-৯১, ১৯৬-৭, ২০১, ২০২, ২০৪, ২৫৭-৮ ; আত্মচরিত ৬৮ ;

নৈনী সেন্ট্রাল জেল ৫২, ১৭৬; পত্রগুচ্ছ ৮১ ; বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ ৬৭, ১০২; ভারত আবিষ্কার ৪০; স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প বাক্য ৭০-৭১; স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী ২৮-৯
নেহরু, মতিলাল ৩৪, ৪২-৬, ৬৯, ৭৪-৫ ১৩৭, ২১০; মতিলালের চিঠি ৭৪-৫
নেহরু, স্বরূপরাণী ৩৪, ৪৩-৪, ৪৬, ৯৯
নৌ বিদ্রোহ ১২১
পঞ্চশীল ১৪২-৩
পণ্ডিত, বিজয়লক্ষ্মী ৪০, ১০৩, ১১৬-৭
পণ্ডিত, লেখা ১১৬-৭
পন্থ, গোবিন্দবল্লভ ১৫৪, ১৬৩, ১৮৮
পাই টি এ ২৬৪-৫
পাক-ভারত যুদ্ধ ৪-৫, ৭, ১৪, ১৬-৯, ১৫৭-৮, ১৯৫-৭
পাকিস্তান ১, ৩, ৬-১০, ১২, ১৫, ১৯ ১২২, ১৫৮-৬১, ১৯৮-২০০, ২১২
পাতিল, এস. কে. ২৮
পাতিল, বীরেন্দ্র ২৭০
পার্লামেণ্ট ভবন ২৭-৮, ১২৪-৫
পিপলস ওন স্কুল ৭৮, ৮০, ৯৫
পিং-পং কূটনীতি ১২
পো, এডগার এলেন ৭৭
প্যাটেল, সর্দার বল্লভভাই ১২৩-৪, ১২৯
ফতে সিং, সন্ত ১৬৯
ফার্নাণ্ডেজ, জর্জ ২৭০
ফ্রস্ট, রবার্ট ৩৩
ফ্রাঙ্কো, জেনারেল ৯৩
ফিশার, লুই ১৮৮
ফ্রিডান, বেটি ৩৯
বন্দরনায়েক, শ্রীমতী সিরিমাভো ৩৫, ৩৭, ১৪৫-৬
বরকতউল্লা, মৌলবী ৬৬
বসু, নন্দলাল ৮৪
বসু, সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) ৬০, ৯৯, ১২০
বহুগুণা, হেমবতীনন্দন ২৭০
বড়ুয়া, হেম ১৯৭-৮
বাজপেয়ী, অটলবিহারী ৫৬
বাংলাদেশ ২-৩, ৮-১৪, ১৬-২৪, ২০৬-২১৬; আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ২১৪; আলোচনা বৈঠক ২০৯; ঢাকায় শ্রীমতী গান্ধী ২০৬-৭; ফজলুল হক (শের-এ-বঙ্গাল) ২১৪; ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি ২০৭; ভাষা আন্দোলন ২১৩-৫; মিত্র-বাহিনী ১৭-৮; ভারতীয় জওয়ান-দের বাংলাদেশ ত্যাগ ২০৯; মুক্তি-সংগ্রাম ৮, ১৬-৭, ২১০-১৫; মুজিব নগর ২১৫; মুজিবুর-ইন্দিরা সাক্ষাৎ ২০, ২০৬-৯; স্বাধীনতা ১৯; স্বীকৃতি ১০
বংশীলাল ২৬০
ব্যানার্জী, মুকুল ২০৪
বিভান, এনুরিন ৯৪
বুলগানিন ১২৮

বেসাণ্ট, অ্যানি ১৩৯
ব্রেজনেভ, লিওনিদ ১৫৮
বোয়া, টম ১৮৮
বৌঠান, প্রতিমা ঠাকুর ৮২
ভকিল, জাহাঙ্গীর ৭৮
ভগত, উষা ২৬৭, ২৭০
ভার্গেস বি. জি. ২০১
ভাটনগর, পি. এস. ২৬৫
ভাণ্ডারী, ডঃ পি. সি. ৯৭
ভাবা, ডঃ হোমি. জে. ১৬১
ভাবে, আচার্য বিনোবা ৯৯
ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী ২৩
ভাষা আন্দোলন ১৪২-৩, ১৬৮, ২০০, ২১৩
ভুট্টো, জুলফিকার আলী ১৯, ৻৬০, ২০৭, ২১৩, ২২০
মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ ৬৮, ৭০
মরিসন, হার্বার্ট ৯৩
মহেন্দ্রপ্রতাপ, রাজা ৬৬
মাউণ্টব্যাটেন, লর্ড লুই ২৭, ১২৩, ১২৭
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১-৪, ৩৮, ১২৮, ১৬৪-৫, ১৮৪, ১৮৯, ২১০
মাধোক, বলরাজ ৫৬
মানেকশ, জেনারেল ১৭
মালব্য, কে. ডি. ৫৩
মালিক, এ. এম. ১৭
মাসানী, মিনু ৫৬, ৯২
মিশ্র, দ্বারকাপ্রসাদ ৩১
মুখার্জী, ধনগোপাল ৬৬-৭
মুজিবুর রহমাম, বঙ্গবন্ধু ১০, ২০-২১, ১৭৯, ২০৬-১১, ২১৩-৫
মুজিবুর রহমান, বেগম ২১-২
মুন্দ্রা, হরিদাস ১৩৩
মুসলীম লীগ ১১৯-২৪
মেনন, কে. পি. এস. ১৮৮
মোসাদ্দেক, ডঃ ১৪
মোহন, আনন্দ ১৯৭-৮
রঙ্গ, এন. জি. ৫৭
রবসন, পল ৯৩
রাজনারায়ণ ২৫৮
রাজাগোপালাচারী, সি. ১৭২
রাধাকৃষ্ণন, ডঃ সর্বপল্লী ৫৩, ১৬০, ১৮৮
রাম, জগজীবন ৫, ২৭, ৩১, ২৪১, ২৫৮-৯, ২৬৫, ২৭০
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৫৩-৭
রায়, অজিতনাথ ২২৮
রায়, সিদ্ধার্থশঙ্কর ৬, ২০৯
র‍্যাটক্লিফ রোয়েদাদ ১২৪
রুজভেল্ট, এলিনর ১০৯, ১২৮
রুদ্ধ কারার দিনগুলি (প্রিজন ডেজ) ১১৭-৮
রুশ-ভারত চুক্তি ১৩, ২৩, ২০৭
রেড্ডী, ব্রহ্মানন্দ ২৬০
রেড্ডী, সঞ্জীব ৩১, ৫১, ৫৩-৫, ১৪১-২
রোমাঁ রোলাঁ ৬৬, ১০২
লণ্ডন ইকনমিস্ট ২৩
লবণ সত্যাগ্রহ ৭১
লরেন্স, পেথিক ১১৪
লামা, দালাই ৪৪
'লাল গোলাপের প্রত্যাবর্তন' ১৭০

লাল বাহাদুর (শাস্ত্রী) ৯, ২৬, ২৮, ৩৭, ১১০, ১৫০, ১৫৫-৬, ১৬০-৬৩, ১৭০, ১৯১, ১৯৭-৯, ২০৪, ২৪২ ; 'জয় জওয়ান জয় কিষাণ' ১৬২
ললিত, ইউ. আর. ২৬৫
ল্যাসকী, হ্যারল্ড ৯৪-৬
লী, জেনী ৯৩
'লুক' (Look) ৪২
লেডিজ হোম জার্নাল ৩৯, ১৩৬
লেনিন, ভি. ই. ১৫২
লেবার পার্টি ৯২
লিমায়ে, মধু ২৭৬
লোথিয়ান, লর্ড ৯৫
শঙ্করাচার্য, জগৎগুরু (পুরী) ১৬৭-৮
শ', জর্জ বার্ণার্ড ৬৭
শাহ ২৬৯
শাহ কমিশন ২৬৪, ২৬৯
শাহানশাহ (ইরান) ১৮৬
শান্তিনিকেতন ৭৯-৮৫, ১৮৯
'শিশু দিবস' ২০১
শুক্লা, ভি. সি. ২৬৯
শেকসপীয়র, উইলিয়াম ৬৭
সত্যাগ্রহ ৬২
সপ্তম-নৌবহর ১৩
সবুজ বিপ্লব ১৪০, ১৬৫
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (রাষ্ট্রসংঘ) ১১, ১৯৯
সৎপথী, নন্দিনী ৪০
স্বতন্ত্র দল ৯, ৩১, ১৭২, ১৭৬
সাইমন কমিশন ৬৯
সাত্র, জাঁ পল ১৮৮
সাদিক, গোলাম মহম্মদ ১৯৮
সারদাপ্রসাদ, মিঃ ১৯৫
স্বরাজ্য পার্টি ৬২-৩
স্মাটস, জেনারেল ৬২
স্ট্র্যাচি, জন ৯৩
সিণ্ডিকেট গোষ্ঠী ৫১-৬০
সি. পি. আই. ৯, ৫৬, ৫৯, ১৭২
সি. পি. এম. ৯, ৫৬, ৫৯, ১৭২
সিমলা কনফারেন্স ১১৮-৯, ২১৩, ২১৬-২০
সিং, চরণ ২৫৮, ২৬৩, ২৬৫-৬, ২৭৬-৭
সিং, ডঃ রামসুভগ ৫৯
সিং, সর্দার স্বরণ ১৬০, ২৭৬
সিংহ, অশোকা ৮২-৬
সিংহ, সত্যনারায়ণ ৩৫
সিংহ, তারকেশ্বরী ৫৮
সীতারামিয়া, ডঃ পট্টভি ৯৯
সুকর্ণ ১২৮
সুখাদিয়া, মোহনলাল ২৮
সুবান্দ্রিয়, ১৪৪
সুব্রাহ্মণিয়াম ৫৮
সুরাবর্দী, হোসেন শহীদ ১২২
সেনগুপ্তা, নেলী ১৩৭
'সেনটো', 'সিয়াটো' ১৩, ১৬, ১৬০
সোভিয়েত রাশিয়া ১১-৩, ২৩
সোরেনসেন, রেজিন্যাল্ড ৯৩
হাক্সলে, এলডুস ১৮৮

হাতি সিং, কৃষ্ণা ৪০, ৬৪, ৮৮, ১০৪, ১২০, ১২৬-৮, ১৪৮-৯, ১৭৩
হাতি সিং, রাজা ১০৩-৪, ১১০
হিটলার ২৩, ৯৮, ১০৩
হেনজেন, ওয়েলস ১৫০
হোসেন, ডঃ জাকির ৫৩, ১৮৮

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী : চলপতি রাও

উই নেহরুজ্ : কৃষ্ণা নেহরু হাতি সিং (এ্যালডেন হ্যাচ সহ)

আফটার নেহরু, হু? : ওয়েলস হেনজেন

ডিয়ার টু বিহোল্ড : কৃষ্ণা নেহরু হাতি সিং

কোন খেদ নাই (অনূদিত) : কৃষ্ণা হাতি সিং

রুদ্ধ কারার দিনগুলি (অনূদিত) : বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

আত্মচরিত (অনুঃ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার) : জওহরলাল নেহরু

লেটারস্ ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার : জওহরলাল নেহরু

বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ (গ্লিম্প্সেস অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি) : জওহরলাল নেহরু

ভারত আবিষ্কার : জওহরলাল নেহরু

পত্রগুচ্ছ (এ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটারস্) : জওহরলাল নেহরু

ইন্দিরা গান্ধী : এ পারসোন্যাল এ্যাণ্ড
পলিটিক্যাল বাইওগ্রাফি : আনন্দ মোহন

ইন্দিরা গান্ধী (রিটার্ন অব রেড রোজ) : খাজা আহম্মদ আব্বাস

ইন্দিরা গান্ধী : থ্রি ইয়ারস অ্যাজ প্রাইম মিনিস্টার : ডি. এন. কলহন

ক্যান ইন্দিরা অ্যাকসেপ্ট দিস্ চ্যালেঞ্জ? : বিজয়ানন্দ ভারতী

ইন্দিরা স্পিক্স : ধীরেন ভৌমিক

সিলেক্ট স্পিচেস অব ইন্দিরা গান্ধী : পাবলিকেশন ডিভিশন,
গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লী

উইট অ্যাণ্ড উইজডম অব ইন্দিরা গান্ধী : এন. বি. সেন (সংকলিত)

ইন্দিরা গান্ধী : ট্রেভর ড্রাইবার্গ

চকোলেট কেক : নয়নতারা সেগল

ডাইনামিক ইন্দিরা : সুধাকর সামন্ত

ইন্দিরা এ স্টাডি : নরেশচন্দ্র চন্দর

ফার্স্ট লেডি অফ ইণ্ডিয়া : হ্যারিয়েট উইল্কোজেন

ইন্দিরা গান্ধী : এ্যান ইলাস্ট্রেটেড বাইওগ্রাফি : এম. কে. আলেকজাণ্ডার
দি নেহরুজ্ অব ইণ্ডিয়া : থ্রি জেনারেশনস্ অব
লিডারশিপ : বিয়েট্রিস পিট্‌নে ল্যাম্ব
সাক্‌শেসন ইন ইণ্ডিয়া : এ স্টাডি : মাইকেল ব্রিচার
ইন্দিরা অভিনন্দন গ্রন্থ (১ম ও ২য় খণ্ড) : এশিয়া পাবলিকেশনস্ লিঃ
ডেমোক্রেসি রীডিমড্ : ভি. কে. নরসিমহন
দিল্লী—আণ্ডার এমার্জেন্সী : জন দয়াল ও অজয় বোস
ডিক্লাইন এ্যাণ্ড ফল অব ইন্দিরা গান্ধী : ডি. আর.
মানকেকার ও কমলা মানকেকার
দি জাজ্‌মেন্ট : কুলদীপ নায়ার
টু ফ্ল্যাইসেস অব ইন্দিরা গান্ধী : উমা বাসুদেব
ইন্দিরা গান্ধী এ্যাণ্ড হার পাওয়ার গেম : জনার্দন ঠাকুর
ইন্দিরা গান্ধী—এ বাইওগ্রাফি : জারীর মাসানি
ইন্দিরা গান্ধী রিটারন্স : খুশবন্ত সিং

●

আমাদের প্রকাশনার পূর্ণ তালিকা

জীবনী/স্মৃতিকথা

কালীপদ সরকার
ইতিহাস-পুরুষ নেতাজী ২০·০০

সন্তোষকুমার অধিকারী
বিদ্যাসাগর ৬·০০

মহাদেবী বর্মা / মলিনা রায়
ছায়াময় অতীত ৪·০০

বিমানেশ চট্টোপাধ্যায়
কালো চশমার আড়ালে : রাজাজীর সঙ্গে হাজার দিন ৬·৭৫

প্রবন্ধ

মেজো, হেস/দীপক চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট নিকসন ৩·৫০

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
বাঙালী ৭·৫০
রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য ১০·০০

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক ৬·০০

চিত্তরঞ্জন মাইতি
বাংলা কাব্য-প্রবাহ ১০·০০

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্যের কথা ৬·০০

শচীন্দ্র মজুমদার
বিবাহ-সাধনা ৩·৫০

অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা

ডঃ অশোক মিত্র
[অর্থমন্ত্রী : পশ্চিমবঙ্গ সরকার]
সমাজসংস্থা আশানিরাশা ১২·০০

চরিত্র চিত্রণ

বাণভট্ট / প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
হর্ষচরিত ২২·০০

দণ্ডী / প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
দশকুমার চরিত ১৬·০০

নির্মলরঞ্জন মিত্র
সেরা মানুষ দাদাঠাকুর ১৮·০০

সমালোচনা

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়
শরৎ-সাহিত্যের স্বরূপ ১৮·০০

রম্য-রচনা

প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়
[প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি : কলকাতা হাইকোর্ট]
রাস্তা ৮·০০

বিচিত্রা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
নারী রহস্যময়ী ৫·০০

কবিতা সঞ্চয়ন

এজরা পাউণ্ডের
নির্বাচিত কবিতা
অনুবাদ : সুশীলকুমার দাশগুপ্ত
মুখবন্ধ : কে. সি. লাহিড়ী
[মূল রচনাসহ] ৩০·০০

সন্দীপকুমার ঠাকুর, শ্রীমতী
এইকো ঠাকুর ও সুশান্তকুমার বসু
অনূদিত জাপানী কবিতাগুচ্ছ :
কোটি পাতার ছন্দ ১৫·০০

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
অনূদিত জাপানী কবিতাগুচ্ছ :
একটি ধানের শীষের উপরে ২·৫০

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
অঙ্গুষ্ঠ ২·০০

ধর্মতত্ত্ব

কালীপদ সরকার
মুখবন্ধ : শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
কৃষ্ণকথা চিরন্তনী ১২·০০

ডঃ সুকুমার বসু
সুহৃদগোপাল দত্ত
মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ ১২·০০
সৎ চিৎ আনন্দময় :
শ্রীঅরবিন্দ ভাষ্য ৫·০০

ভক্তিগীতি

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়
মায়ের গান ৩·০০

নাটক

বের্টোল্ট ব্রেশট্ / অজিত
গঙ্গোপাধ্যায়
মাল বাজারের মা-মালতী ১৫·০০

গোপীনাথ নন্দী
উমাবনম্ :
[একত্রে চারখানি নাটিকা] ১০·০০

কাব্য-নাটিকা

চিত্তরঞ্জন মাইতি
বসন্ত বিলাপ ৪·

উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসী বিহঙ্গিনী ৫·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
অন্য এক নাম ৪·০০
ঠিকানা সঠিক ৫·০০

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ
আজও তারা ডাকে ৩·৫০
এখানে মৃত্যুর হাওয়া ৪·০০
এখানে মৃত্যুর হাওয়া
(পেপারব্যাক) ১·৫০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
একই বৃন্ত ৬·০০

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তর মেলেনি ৩·৫০

রমাদাস হালদার
ছন্দপতন ৪·০০